ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ

শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজীর

জীবন-চরিত

তদীয় শিষ্য

মহন্ত মহারাজ সন্তদাস বাবাজী ব্রজবিদেহী

ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ

শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজীর জীবন-চরিত

তদীয় শিষ্য

মহন্ত মহারাজ সন্তদাস বাবাজী ব্রজবিদেহী

প্রণীত

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড

পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

চতুর্থ সংস্করণ

১৯৭৪

মূল্য ১।০ টাকা

প্রকাশক—

শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্. এস্ সি.

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী

কালিকা প্রেস

২১, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের নিবেদন

এই গ্রন্থ কেবল আমার গুরুভ্রাতা সকলের এবং আমার বিশেষরূপে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ধর্ম্মবন্ধুদিগের হস্তে পাঠের নিমিত্ত অর্পণ করিব বলিয়া প্রথমে আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কারণ সাধারণ পাঠক এই গ্রন্থের বিবৃত ঘটনাবলীর সত্যতা বিষয়ে সম্যক্ আস্থা স্থাপন করিতে পারিবেন কিনা তদ্বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু এই গ্রন্থের হস্তলিপি পাঠ করিয়া আমার অনেক বিজ্ঞ বন্ধু এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এক্ষণকার কালের অবস্থানুসারে এই গ্রন্থপাঠে সর্ব্বসাধারণেরই উপকার হইবার সম্ভাবনা। তাঁহাদের অনুরোধ অনুসারে আমি এই গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যদি ইহা পাঠে আর্য্যঋষিদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে কিঞ্চিৎ পিপাসা জনসমাজে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলেই এই গ্রন্থ প্রকাশ সার্থক হইয়াছে বিবেচনা করিব।

শ্রীধামবৃন্দাবন, শ্রীনিম্বার্কাশ্রম
১৪ই পৌষ, ১৩২০ সন

শ্রীতারাকিশোর শর্ম্মা চৌধুরী

দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

গ্রন্থকারের অভিপ্রায় অনুসারে প্রথম সংস্করণে "নিবেদন" শীর্ষ দিয়া যে প্রস্তাব লিখা হইয়াছিল তন্মধ্য হইতে কেবল একটি মাত্র প্যারাগ্রাফ্ (Paragraph) এই দ্বিতীয় সংস্করণে রাখিয়া অপরাংশ উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর প্রকাশক সংবাদপত্রাদিতে ইহার কোনপ্রকার বিজ্ঞাপন দেন নাই এবং ঐ গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ কোন পুস্তকালয়েও রাখেন নাই। পরন্তু এই গ্রন্থ পাঠের নিমিত্ত সাধারণ পাঠকের এত আগ্রহ হয় যে অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের সমস্ত পুস্তক বিক্রয় হইয়া যায়, বহুলোক এই পুস্তক পাইবার জন্য গ্রন্থকার ও প্রকাশকের নিকট প্রার্থী হইলেও গ্রন্থাভাবে তাঁহাদের ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। সুতরাং আমি গ্রন্থকারের অনুমতি গ্রহণ করিয়া এই গ্রন্থ পুনরায় মুদ্রিত করিলাম। যে মহাত্মার চরিত্র এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবাবধূত ছিলেন, পরন্তু নিম্বার্ক সম্প্রদায় নামে কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে আছে তাহা বঙ্গদেশের অতি অল্প লোকেই অবগত আছেন। এই নিমিত্ত উক্ত সম্প্রদায় ও তাঁহাদের উপাসনা বিষয়ে কিঞ্চিৎ বর্ণনা এই গ্রন্থে থাকা আবশ্যক বলিয়া গ্রন্থকারের নিকট অনেকে জ্ঞাপন করায় এই দ্বিতীয় সংস্করণে ছাপাইবার নিমিত্ত গ্রন্থকার একটি নূতন অধ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা এই গ্রন্থের শেষভাগে "পরিশিষ্ট" নামে সংযোজিত করা হইয়াছে।

গ্রন্থকার এক্ষণে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগী হইয়া শ্রীসন্তদাস নামে বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত হইয়াছেন, অতএব তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের নাম শ্রীতারাকিশোর চৌধুরী উঠাইয়া দিয়া তৎস্থলে শ্রীসন্তদাস নাম লিখা হইল। ইনি অধুনা ব্রজবিদেহী মহন্ত পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। অনেকের একান্ত ইচ্ছা জানিয়া এ সংস্করণে মহন্তজীর একখানি চিত্র দেওয়া হইল।

পরিশেষে এইমাত্র বক্তব্য যে, প্রকাশক এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পাইয়া নিজেকে ধন্য ও পুণ্যবান মনে করিতেছে।

কলিকাতা
২৭শে পৌষ, ১৩২৮ সন

শ্রীআশুতোষ দেব

ওঁ হরিঃ

শ্রী১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী

ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজের

শ্রীশ্রীশ্রীচরণকমলে ভক্তি ও প্রীতিপূর্ব্বক

প্রণত শিষ্য

শ্রীতারাকিশোর শর্ম্মা চৌধুরী

কর্ত্তৃক

এই গ্রন্থ অর্পিত হইল

ওঁ তৎ সৎ

(বাঙ্গালা ১৩২২ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনধামে তারাকিশোর বাবুর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। তদুপলক্ষে গোঁসাইএর ভক্ত শিষ্য সুকণ্ঠ শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন মহোদয় এই গানটি রচনা করিয়া অন্যান্য গুরুভ্রাতৃগণের সহিত উক্ত মন্দিরে গান করেন)।

শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন মহাশয়ের রচিত গান

সুর ঝিঁঝিট—একতালা

জয় জয় শ্রীরামদাস স্বামী জী মহন্ত মহারাজ,
জয়তু দেব ব্রজবিদেহী জয় জয় তৈঁহারি।
নির্ব্বিকার শান্ত দান্ত ব্রজমণ্ডল এক মহন্ত,
মুগ্ধ ভ্রান্ত মানববৃন্দ বন্ধ মোচনকারী॥
দুর্লভ ব্রজরজ লাগি, আশৈশব সরব ত্যাগী
কাঠ কঠিন কোপীনধারী একনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী॥
শ্রী-অঙ্গে ব্রহ্মতেজ বিরাজ, ভাস্কর কোটি পায় লাজ
পাবক জনু মূর্ত্তিমন্ত কল্মষ তমহারী॥
বজ্রাদপি কঠোর রীতি, কুসুম কোমল মধুর প্রীতি,
গম্ভীর গূঢ় পূতচরিত সুরনর চিতহারী॥
করুণ নয়নে অমিয় উছল, নিছনি সজল শতদল দল,
বরিষে সতত সুমঙ্গল শত, শত সন্তাপ নিবারি॥
অপরূপ রূপ-মহিমা বৈভব, অপরূপ লীলা মাধুর্য্য তব
প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ দেব! প্রণমি চরণে তোঁহারি॥

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ

প্রথম অধ্যায়

বাল্য

শ্রীশ্রীযুক্ত গুরুজী মহারাজ কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার জীবনের বৃত্তান্ত সময় সময় যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

অমৃতসহর হইতে আনুমানিক বিশ ক্রোশ দূরে লোনা চামারি গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমার পিতা গুরু ব্যবসায়ী অতি সম্মানিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমি তাঁহার তৃতীয় পুত্র ছিলাম। আমার মাতা তাঁহার সন্তানদিগের মধ্যে আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। ("উনকা বড়া ভারি মোহ থা হামারি উপর" "সবসে জিয়াদা মোহ থা")। আমার পিতার ৩।৪টি মহিষ ছিল, তিনি দশ সের দুগ্ধ প্রত্যহ পান করিতেন এবং আমরাও প্রত্যেকে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতাম। আমার মাতা অতিশয় ভাল মানুষ লোক ছিলেন এবং অতিথি-সৎকার অতি প্রেমের সহিত করিতেন।

আমাদের গ্রামে আমার পিতার বাড়ীর অতি নিকটে এক পরমহংস বাস করিতেন; তাঁহার নিকটে আমি সর্ব্বদাই যাইতাম, তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন।

তাঁহাকে দর্শন করিতে প্রত্যহ গ্রামের লোক সকল যাইত এবং সকল শ্রেণীর লোক—ধনী, দরিদ্র, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক এবং পুরুষ লোক—সকলেই তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিত। আমি ইহা প্রত্যহ দেখিতাম এবং মনে করিতাম যে, এই পরমহংস বাবাজী সংসারে সকলের অপেক্ষা বড় এবং তাঁহাকে আমি মনে মনে বড় শ্রদ্ধা করিতাম। আমার যখন চারি বৎসর বয়ঃ-ক্রম, তখন একদিন আমি পরমহংসজীর নিকটে একাকী বসিয়া আছি এবং স্নেহের সহিত তিনি আমার সহিত নানা কথা কহিতেছেন, এমন সময় আমি তাঁহাকে বলিলাম "বাবাজী মহারাজ, এই পৃথিবীতে (দুনিয়ামে) আপনি সকলের চেয়ে বড়, সকলে আসিয়া আপনার পায়ে মাথা অবনত করে ; আমি জিজ্ঞাসা করি আপনি কিরূপে কি করিয়া এইরূপ বড় হইলেন ; আমাকে বলুন, আমিও তদ্রূপ করিব।" পরমহংসজী হাসিয়া বলিলেন "বাবা, আমি সর্ব্বদা রাম নাম করি, রাম নামই আমাকে এমন বড় করিয়াছে, তুমি যদি সর্ব্বদা মনে মনে এই রাম নাম কর, তবে তুমিও এইরূপ বড় হইতে পারিবে।" আমি বলিলাম "মহারাজ, রাম নাম করিলেই এমন বড় হয়! তবে আমি রাম নাম করিব।" আমি সেই অবধি সর্ব্বদা মনে মনে রাম নাম জপিতে লাগিলাম ; এবং পরমহংসজীর নিকট গেলে সময় সময়

তিনিও আমাকে রাম নাম করিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

আমার পিতার ৩।৪টি মহিষ ছিল। আমার বয়স ৫।৬ বৎসর হইলে আমি দিনের বেলায় অনেক সময় বাড়ীর নিকটে ঐ সকল মহিষ চরাইতাম। আমার সাত বৎসর বয়সে একদিন দুই প্রহরের পর আমি আমার পিতার মহিষ চরাইতেছি, এমন সময়ে একজন সাধু হঠাৎ আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন; আমি তাঁহার শরীরের প্রভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম; তিনি হাসিতে হাসিতে আমার নিকট আসিয়া বলিলেন "বাচ্চা, হামকো কুছ্ খিলাওগে?" আমি বলিলাম "হাঁ খাওয়াইব, তুমি এখানে বসিয়া আমার মহিষ দেখ, দেখিও আমার মহিষ যেন কোথাও চলিয়া না যায়, আমি ঘরে যাইয়া ঘর হইতে তোমার জন্য খাবার লইয়া আসিব।" সাধু বলিলেন "আচ্ছা তাহাই হইবে, আমি তোমার মহিষ দেখিতেছি, তুমি আমার জন্য খাওয়ার লইয়া আইস।" তখন আমি ঘরে যাইয়া দেখিলাম যে আহারান্তে আমার পিতামাতা সকলে শয়ন করিয়া আছেন। আমি তখন তাঁহাদিগকে না জাগাইয়া নিজে একাকী ভাণ্ডার ঘরে প্রবেশ করিলাম এবং নিজের ইচ্ছামত অনেক করিয়া ঘৃত, চিনি ও ময়দা ভাণ্ডার হইতে লইয়া সাধুর নিকট উপস্থিত হইলাম।

সাধু দেখিয়া খুব প্রসন্ন হইলেন এবং ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিয়া অতি প্রসন্ন বদনে আমাকে বর দিলেন "বাচ্চা, তুম্ যোগীরাজ হোগে।" আমি বলিলাম "আমার পিতামাতা আছেন, ঘর দরজা আছে, আমার মহিষ আছে, আমি রোজ পাঁচ সের দুগ্ধ খাই, আমি কেমন ক'রে যোগীরাজ হইব ?" সাধু বলিলেন "বাচ্চা, হামারা বচনসে তুম্ জরুর যোগীরাজ হো যাওগে।" এই কথা বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। আমি তৎক্ষণাৎ বোধ করিলাম, আমার সংসার ছুটিয়া গেল, আমার পিতামাতা, গৃহ, মহিষ প্রভৃতি সকলের প্রতি আসক্তি ছিন্ন হইয়া গেল। আমি জানিলাম, গৃহস্থাশ্রম আমার জন্য নহে; কিন্তু কাহাকেও প্রকাশ করিয়া কিছু বলিলাম না।

ইহার অল্প দিবস পরে আমার উপনয়ন হইল। উপনয়নের পর শাস্ত্রাধ্যয়নের নিমিত্ত ভিন্ন গ্রামে কোন বিখ্যাত পণ্ডিত গুরুর নিকটে আমার পিতা আমাকে প্রেরণ করিলেন। সেই পণ্ডিত গুরুর পুত্র ছিল এবং অনেক ছাত্র ছিল; আমি কিছুদিন তাঁহার নিকট থাকিতে থাকিতে তিনি আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিলেন, এমন কি অবশেষে আমার প্রতি তিনি এত স্নেহ দেখাইতে লাগিলেন যে অপর ছাত্রেরা অনেকেই তন্নিমিত্ত ঈর্ষা-পরবশ হইল। আমি দুই একবার দেখিলেই

আমার নিয়মিত দৈনিক পাঠ অভ্যস্ত হইয়া যাইত; তৎপরে অপর বালকদের সহিত পড়ায় অথবা খেলায় যোগ না দিয়া আমি মালা হাতে করিয়া বসিতাম, এবং আমার বালককালে পরমহংসজী যে রাম নাম করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই রাম নাম ঐ মালায় জপ করিতাম। পণ্ডিতজীর পুত্র ও অপর বালকেরা এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া আমার গুরুজীর নিকট আমার বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করিল "আপনি ইহাকে অতিশয় ভালবাসেন ও ভাল বলেন, কিন্তু আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখুন, এ কখন পুস্তক হাতে করে না, কেবল সমস্ত দিন মালা টপকায়।" পণ্ডিত গুরুজী তখনই আমাকে ডাকাইলেন এবং তেজের সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন হে, তুমি লেখাপড়া কিছু কর না, এবং কেবল মালা টপকাও, ইহা কি সত্য? সকল ছেলেরা তোমার সম্বন্ধে এই কথা বলিতেছে।" আমি জোড়হাত করিয়া বলিলাম "মহারাজ, আমি পাঠ অভ্যাস করিয়াছি, আমি পড়ি নাই এ কথা সত্য নহে।" তখন পণ্ডিত গুরুজী আমার পুস্তক আনাইয়া আমার পাঠ জিজ্ঞাসা করিলেন; আমি ঠিক ঠিক উত্তর করিলাম; তাহা দেখিয়া তিনি খুব প্রসন্ন হইলেন এবং অন্য বালকদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "তোমরা মিথ্যাবাদী; সে তাহার পাঠ অভ্যাস করিয়াছে,

পাঠ অভ্যাস করিয়া মালা জপ করিলে তাহাতে দোষ কি?”

সেই অবধি পণ্ডিত গুরুজী আমাকে আরও অধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন। আমি তখন আরও উৎসাহিত হইয়া অল্প সময়েই নিজের দৈনিক পাঠ শিক্ষা করিয়া লইতাম; এবং তৎপরে পূর্ণ মনে মালা লইয়া রাম নাম জপ করিতাম। এইরূপে ৮।৯ বৎসর গুরু-গৃহে আমার কাটিয়া গেল। আমি ব্যাকরণ শাস্ত্র (সারস্বত), জ্যোতিষ শাস্ত্র (হোরাচক্র প্রভৃতি) এবং কিছু স্মৃতি শাস্ত্র, বিষ্ণুর সহস্রনাম প্রভৃতি পাঠ করিলাম। অবশেষে আমার পণ্ডিত গুরুজী আমাকে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতা পাঠ করিতে দিলেন। গীতা পাঠ আরম্ভ করিয়া আমি বোধ করিতে লাগিলাম, যেন আমার প্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। গীতা আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর হইল। আমি পূর্ণ মনে নিত্য ইহা অভ্যাস করিতে লাগিলাম। অতঃপর গীতা অধ্যয়ন যখন আমার সমাপ্ত হইল, তখন আমার পণ্ডিত গুরুজী আমাকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুমতি করিলেন। আমার গুরু-গৃহ-বাস সমাপন হইয়াছে জানিয়া, আমি গুরুজী ও অপরাপর সকলকে যথাবিহিতরূপে অভিবাদন করিয়া আমার অধীত গ্রন্থসকল একত্রে বাঁধিয়া পৃষ্ঠের উপরে লইলাম, কিন্তু শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা আমার এতই প্রিয় ছিল যে ঐ গীতা

গ্রন্থ আমার বক্ষের উপরে রাখিয়া তাহা বস্ত্র দ্বারা শরীরের সহিত বন্ধন করিয়া গুরু-গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পিতৃ-ভবনে উপস্থিত হইলাম।

ইতি প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

সন্ন্যাস

পাঠ সমাপনান্তে আমি পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আমার পিতা আমাকে বিবাহ করাইবার নিমিত্ত উদ্‌যোগ করিলেন। আমি বলিলাম, আমি বিবাহ করিব না; আপনার অপর সকল পুত্র, যাঁহারা অবিবাহিত আছেন তাঁহাদের বিবাহ করান। তদনুসারে পিতা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সকলের বিবাহ করাইলেন। আমি প্রথমে গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করিলাম। আমাদের গ্রামের অন্ত-ভাগে একদিকে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল, ঐ বৃক্ষটি আমার পিতার বাটীর নিকটেই ছিল। আমি গায়ত্রী মন্ত্রের শাপ, শাপ-উদ্ধার ও কবচ প্রভৃতি যথাবিধি শিক্ষা পূর্ব্বক ঐ বট গাছতলায় বসিয়া যথা-বিধানে ঐ গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। সওয়া লক্ষ জপ পূর্ণ হইলে ঐ মন্ত্র সিদ্ধ হয় জানিয়া আমি ঐ পরিমাণ জপ

করিব স্থির করিয়া একান্তমনে ক্রমশঃ জপ করিতে লাগিলাম। যখন আমার এক লক্ষ জপ শেষ হইল, আর পঁচিশ হাজার জপ অবশিষ্ট আছে, তখন হঠাৎ আকাশবাণী আবির্ভূত হইল। সেই বাণী আমাকে এইরূপ আদেশ করিলেন যে "বৎস, তুমি অবশিষ্ট পঁচিশ হাজার জপ জ্বালামুখীতে গিয়া সম্পূর্ণ কর, তদ্রূপ করিলেই আমি সিদ্ধ হইব।"

এই আকাশবাণী শ্রবণান্তর আমি খুব উৎসাহিত হইলাম এবং সত্বর হইয়া জ্বালামুখীর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার সমবয়স্ক একটি ভ্রাতুষ্পুত্র আমার বড় অনুগত ছিল, সেও আমার সঙ্গে চলিল। জ্বালামুখী আমার পিত্রালয় হইতে ৩০।৪০ ক্রোশ ব্যবধান। রাস্তায় যাইতে যাইতে কোন এক স্থানে গিয়া দেখিলাম যে অতিশয় তেজঃপুঞ্জ কলেবর বৃহৎ জটাধারী একজন সাধু তথায় উপবেশন করিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি অতি বেগে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম ও তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া নিকটে দণ্ডায়মান হইলাম। তাঁহার দর্শনেই তাঁহার প্রতি আমি এত অনুরাগযুক্ত হইলাম যে জ্বালামুখী যাইতে আমার ইচ্ছা তিরোহিত হইয়া গেল। আমি সেই সাধু-প্রবরকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিয়া বলিলাম, "মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আপনাতে আমি

আত্মসমর্পণ করিলাম, আপনি আমাকে চেলা করুন।” সাধু প্রসন্ন হইলেন, এবং প্রসন্ন বদনে আমাকে বলিলেন, “তোমাকে চেলা করিব, তুমি এখানে থাক।” সেই দিবসই আমি মুণ্ডিত হইলাম এবং “বৈরাগ-আশ্রম” গ্রহণ করিলাম। গুরু আমাকে কৃপা করিলেন। আমি তাঁহার কৃপা লাভ করিলে আমার সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম। আমার সর্ব্ববিধ নিরানন্দ ঘুচিয়া গেল এবং আমি আনন্দে ভাসিতে লাগিলাম।

আমার সঙ্গে যে আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র আসিয়াছিল, সে অবাক্ হইয়া গেল; আমাকে বৈরাগ-আশ্রম গ্রহণ করিতে সে অনেক প্রকার নিষেধ করিয়াছিল, আমি তৎপ্রতি কর্ণপাত না করাতে সে তথা হইতে গৃহে ফিরিয়া গেল এবং আমার পিতামাতাকে সমস্ত সংবাদ বলিল। তাহাতে আমার পিতা এবং অপর কোন কোন কুটুম্ব আমার সেই ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে করিয়া আমি যে স্থানে গুরুসন্নিধানে ছিলাম, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ঘরে ফিরিয়া যাইবার নিমিত্ত আমাকে নানা প্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন; তাহাতে আমি বিচলিত না হওয়ায় আমাকে তাঁহারা অতিশয় তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং আমার গুরুদেবকেও এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে তাঁহার অল্পবয়স্ক

পুত্রকে প্রলোভন দেখাইয়া বাহির করিয়া লইয়াছেন বলিয়া রাজ-সরকারে যাইয়া আমার পিতা অভিযোগ করিবেন। তখন আমি উত্তর করিলাম যে "আমি এক্ষণে নিতান্ত অল্পবয়স্ক বালক নহি; আমি গিয়া বলিব যে আমি স্বেচ্ছাক্রমে মুণ্ডিত হইয়াছি এবং "বৈরাগ-আশ্রম" গ্রহণ করিয়াছি, এবং গুরুদেব আমাকে কোন প্রকারে প্রলুব্ধ করেন নাই।" তাহাতে আমার পিতা নিরস্ত হইয়া অতিশয় শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে আমার গুরুদেবের চরণে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন যে "আপনি একবার আমার পুত্রটিকে ছাড়িয়া দিন, ইহার মাতা ইহার বিরহে অতিশয় আকুল হইয়াছেন, তাঁহাকে একবার দর্শন দিয়া পরে সে আপনার নিকট আসিবে।" আমার গুরুদেব তাহাতে কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে বলিলেন "আচ্ছা বাচ্চা, সাধুকো একবখত জনম-স্থানকো বি দর্শন করনা চাহিয়ে, সবই ঠোর এক হ্যায়, ইস্‌মে কুছ্ দোষ নহি, তুম্ ইন্‌কা সঙ্গমে যাও, আপনা জনম-স্থানকো চেতাও।" আমি তাঁহার অনুজ্ঞা পাইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ পূর্ব্বক পিতার সমভিব্যাহারে পুনরায় জন্মস্থানে প্রত্যাগত হইলাম।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায়

জন্মস্থানে গমন

পিতার সমভিব্যাহারে জন্মস্থানে আসিয়া আমি বলিলাম, আমি সাধু হইয়াছি, কাহারও গৃহে বাস করা আমার ধর্ম্ম নহে, সুতরাং আমি গ্রামের বাহিরে একটি বৃক্ষতলে সাধুদিগের পদ্ধতি অনুসারে আসন স্থাপন করিব। আমার মাতার আমার প্রতি অতিশয় মোহ ছিল, সুতরাং তিনি অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম "আমি সাধু হইয়াছি, তাহা মঙ্গলেরই বিষয়। তোমার এমন করিয়া ক্রন্দন করা উচিত নহে। তুমি যদি এত কাঁদ, তবে আর আমি এখানে থাকিব না।" এইরূপ বলাতে আমার বৃক্ষতলে অবস্থান করিতে অগত্যা তিনি সম্মত হইলেন। আমি যে বটবৃক্ষ-তলায় গায়ত্রী মন্ত্র পূর্ব্বে সাধন করিয়াছিলাম বলিয়াছি, সেই বৃক্ষতলায়ই আমি আমার আসন স্থাপন করিলাম। গ্রামের সকল লোক আমাকে দেখিতে সেই স্থানে একত্রিত হইলেন। তাঁহারা এইরূপ প্রস্তাব করিলেন যে, এক এক বাড়ীতে এক এক দিন আমি মধ্যাহ্নে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতে যাইব। তাহাতে আমি বলিলাম যে আমি অপর সকল বাড়ীতে যাইয়া ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিব, কিন্তু আমার মায়ের বাড়ীতে যাইতে আমি

ইচ্ছা করি না, কারণ সেখানে গেলেই তিনি অতিশয় কান্নাকাটি করিবেন। তাহাতে আমার মা গদগদস্বরে আমাকে বলিলেন যে "আমরা কান্নাকাটি করিব না, তথাপি তুমি আমাদিগের বাড়ীতে আসিয়া ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিবে।" তিনি এইরূপ অঙ্গীকার করাতে অবশেষে আমি তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলাম। তদনুসারে আমি প্রথম দিবস গ্রামের অন্য এক বাটীতে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলাম। রাত্রে সেই বটবৃক্ষতলে আমি আপন আসনে সংযতচিত্তে অবস্থিত আছি, এমন সময় হঠাৎ আকাশ-মণ্ডল ভেদ করিয়া গায়ত্রী দেবী আবির্ভূত হইলেন। আবির্ভূত হইয়া বলিলেন "বৎস! আমি তোমার সিদ্ধ হইয়াছি, আর অধিক জপ তোমাকে করিতে হইবে না, আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।" আমি তাঁহাকে যথাবিহিত রূপে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলাম "মাতঃ! আমি এক্ষণে সাধু হইয়াছি, আমার সংসার পরিত্যাগ হইয়াছে, কোন বাসনা নাই, এক্ষণে কোন বর প্রার্থনা করিবার আমার প্রয়োজন নাই, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন থাক, এই আমার বর।" তখন দেবী এবমস্তু বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

অতঃপর পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে এক এক দিন এক এক বাড়ীতে যাইয়া মধ্যাহ্নে আমি ভিক্ষান্ন ভোজন করিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার মাতার গৃহে যে দিবস উপস্থিত

হইলাম, সেই দিবস্ তিনি আমার অগ্রে ভিক্ষান্ন রাখিয়াই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি বলিলাম "মাতঃ! এই জন্যই ত পূর্ব্বে তোমার বাড়ীতে আসিয়া ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিব না বলিয়াছিলাম। তুমি এইরূপ রোদন করিলে আমি কি প্রকারে আহার করিতে পারি?" পরে তিনি কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন, আমি ভিক্ষান্ন ভোজন করিলাম সত্য, কিন্তু তাঁহার অশ্রুধারা থামিল না। পরে ভোজন সমাপন করিয়া আমি বলিলাম যে, "তুমি এইরূপ করিলে আমি আর তোমার বাড়ীতে কিরূপে আসিতে পারি? আমি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে আমার এবং তোমার উভয়েরই কল্যাণ হইবে।" তখন মাতা উত্তর করিলেন, "আচ্ছা বৎস! তোমার কল্যাণ হউক, আমি আর রোদন করিব না, তথাপি তুমি পালা অনুসারে আসিয়া আমার বাড়ীতে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিবে।" তৎপরে আমি পুনরায় সেই বট-বৃক্ষতলে আমার আসনে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলাম এবং এইরূপে সেখানে থাকিয়া ভজন করিতাম এবং মধ্যাহ্নে গ্রামের কোন বাড়ীতে পালাক্রমে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে যাইতাম। এইরূপে কয়েক দিবস আমার তথায় গত হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর এক দিবস আমার পূর্ব্বাশ্রম সম্পর্কে একটি যুবতী ও অতি রূপবতী ভ্রাতৃবধূ আসিয়া আমার আসনের

নিকট বসিলেন এবং আমার সহিত নানা কথাবার্ত্তায় অনেক কাল কাটাইয়া পরে গৃহে চলিয়া গেলেন। তৎপর দিবস হইতে তিনি প্রত্যহ এইরূপ সন্ধ্যার পরে একাকী আমার নিকট আসিয়া হাস্য আমোদ প্রমোদ ও কথোপ-কথন করিতে লাগিলেন। তিনি দুই তিন দিন এইরূপ আসিলে তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল ; তাহাতে আমি তাঁহাকে বলিলাম "আমি সাধু হইয়াছি, তুমি যুবতী স্ত্রীলোক, নির্জ্জনে রাত্রিকালে আমার নিকটে একাকী তোমার আসা উচিত নহে। তুমি যদি কোন ধর্ম্মপ্রসঙ্গ শুনিতে ইচ্ছা কর, তবে দিনের বেলায় আমার নিকটে আসিতে পার, সন্ধ্যার পর আর কদাপি আমার নিকট আসিবে না।" তাহাতে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ইহাতে দোষ কি ?" আমি বলিলাম "না, তুমি কদাপি আসিবে না, দোষ আছে, ইহা সাধু-দিগের নিয়ম নহে। আমার কাছে আসিতে ইচ্ছা হইলে তুমি দিনের বেলায়ই আসিবে, সন্ধ্যার পর কদাপি আসিবে না।" তিনি একটু হাসিয়া সেই দিবস বিদায় হইয়া গেলেন। কিন্তু পরদিবস পুনরায় সন্ধ্যার পর রাত্রিতে তিনি আমার আসনের নিকট আসিতেছেন দেখিয়া আমি অতিশয় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলাম "তোমাকে বারণ করিয়াছি,তথাপি তুমি রাত্রিতে একাকী আমার নিকটে আসিতেছ কেন ?" তিনি হাসিয়া বলিলেন

"তাহাতে দোষ কি?" আমি তখন ক্রুদ্ধ হইয়া এক ঢিল লইয়া তাঁহার উপরে নিক্ষেপ করিলাম। তাহাতে তিনি বিমর্ষভাবে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তৎপরে আমি মনে করিলাম আমি এইস্থানে অনেক দিন রহিয়াছি, একক এখানে আর অধিক দিন অবস্থান করিলে আমার বিপদ্ ঘটিতে পারে, অতএব এইস্থান এক্ষণে পরিত্যাগ করা আবশ্যক। অতএব আমি সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শীঘ্র জন্মস্থান পরিত্যাগ করিলাম। জন্মস্থানের এই আমার শেষ দর্শন। জন্মস্থানে আর আমি কখন প্রত্যাবর্ত্তন করি নাই। এইরূপে সেবার আমি স্ত্রীলোকের আকর্ষণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলাম। আর একবার আমি এইরূপ স্ত্রীলোকের আকর্ষণে পড়িয়াছিলাম। একদা এক অতি রূপ-যৌবনসম্পন্না রাণীর সহিত আমার ঘটনা-ক্রমে মিলন হয়। তিনি আমাকে অতি ভক্তিসহকারে সেবা করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার সেবা ও ভক্তিতে আমি ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি অলক্ষিতভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। পরে একদিন তিনি নির্জ্জনে আমার নিকট আসিয়া সম্পূর্ণভাবে আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিলেন, "আমি পতিহীনা, শিশু-কালে বিধবা হইয়াছি, আপনার প্রতি আমার মন অতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছে; অতএব আপনি আমার সহিত এখন হইতে নিয়ত বাস করুন এবং আমার এই রাজ্য

সমস্ত ভোগ করুন।” আমার মন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার এই প্রস্তাব শুনিয়া মনে মনে আমি প্রথমে একটু প্রসন্নই হইলাম ; কিন্তু পরক্ষণেই আমার বৈরাগ্যাশ্রমের কথা আমার স্মরণ হইল ; তখন আমার মনকে ধিক্কার দিয়া প্রকাশ্যে বলিলাম “আমি সাধু হইয়াছি, আমি কিরূপে আমার আশ্রমের অবজ্ঞা করিয়া আপনার সহিত ভোগ-বিলাস করিতে পারি ? অতএব আপনি আমার প্রতি মোহ পরিত্যাগ করুন ; আমি স্থানান্তরে যাই।” এই বলিয়া আর বিলম্ব না করিয়া আমি সেই স্থান পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু ঐ রাণীর প্রতি আমার মন অলক্ষিত-ভাবে পূর্ব্বে আকৃষ্ট হইয়াছিল ; রাস্তায় যাইতে যাইতে তাঁহার হাবভাব, ভঙ্গী প্রভৃতি আমার স্মরণ হইয়া আমাকে এক একবার উদ্বেগ দিতে লাগিল ; আমি কিছুদূর যাইয়া যাইয়া পুনরায় বসিয়া পড়িতে এবং ফিরিয়া তাঁহার নিকট যাইব কিনা এইরূপ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। অবশেষে ভগবৎকৃপায় আমার মোহ ভাঙ্গিয়া গেল, আমি পুনরায় আত্মস্থ হইয়া সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলাম। এই গল্পটি বলিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন “বাবা ! স্ত্রীলোকের আকর্ষণী শক্তি অতিক্রম করা পুরুষের, বিশেষতঃ যুবা পুরুষের পক্ষে যে অতি দুঃসাধ্য, তাহা আমি এইরূপে অবগত হইয়া-

ছিলাম ; ভগবৎকৃপা ভিন্ন জীব ইহা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না।”

আর এক প্রকার বিপদে আমি বাল-বৈরাগ্যের অবস্থায় একবার পতিত হইয়াছিলাম ; তাহা হইতেও ভগবৎকৃপায় রক্ষা পাই। ভারতের উত্তরখণ্ডে গঙ্গোত্রীর পাহাড়ের নিকটে একদিন আমি পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, সম্মুখে একটি বৃহৎ উচ্চ প্রস্তরময় পাহাড় ; ঐ পাহাড়ের নিম্নভাগে ভূমি-সংলগ্ন একটি স্থানে একটি আল্‌গা প্রস্তরখণ্ড লাগিয়া রহিয়াছে বলিয়া আমার বোধ হইল ; আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঐ প্রস্তরখণ্ডকে ঠেলিয়া সরাইতে চেষ্টা করিলাম, তখন প্রস্তরখানা খসিয়া পড়িল ; আমি দেখিলাম ঐ স্থানে একটি গুহার মুখ দেখা যাইতেছে। আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম অতি বৃহৎকায় বহু প্রাচীন সুপক্ক জটাজূটধারী এক পুরুষ তথায় যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার ভ্রূযুগল পরদার মতন হইয়া নীচের দিকে এমন বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় একেবারে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমি তাঁহাকে দেখিয়াই আস্তে আস্তে গুফা হইতে বাহিরে আসিলাম। তিনিও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহির্গত হইয়া আস্তে আস্তে ঐ

চক্ষুর্দ্বয়ের আবরণ-স্বরূপ যে চর্ম্ম ঝুলিতেছিল, তাহা হস্তের দ্বারা উত্তোলন করিলেন। তখন তন্মধ্য হইতে তাঁহার বৃহৎ চক্ষুর্দ্বয় যেন অগ্নিবর্ষণ করিতে করিতে আমার নেত্রগোচর হইল। আমি তদ্দর্শনে অতিশয় ভীত হইয়া মনে করিলাম যে ইনি এক্ষণেই আমাকে ভস্মীভূত করিবেন, কারণ আমি তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছি। তখন সেই বৃহৎকায় পুরুষ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?" আমি সভয়ে উত্তর করিলাম "মহাশয়, আমি আপনার চেলা।" তিনি বলিলেন "চেলা কিরূপ? আমি যাহা বলিব তাহা তুমি করিতে পারিবে?" আমি বলিলাম "আপনার কৃপায় করিব।" যে স্থানে আমাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, সেই স্থানটি ঐ প্রস্তরময় পাহাড়ের এক প্রান্তভাগ। তাহার অতি নিকটেই বৃহৎ খাদ, সেই খাদ অন্যূন ৫০ হাত গভীর। সেই খাদের নিম্নভাগে নক্ষত্রবেগে একটি পার্ব্বতীয় ঝরণার ন্যায় গঙ্গানদী প্রবাহিত হইতেছে। আমি উক্ত প্রকার উত্তর করিলে, সেই বৃহৎকায় অতি প্রাচীন পুরুষ অতি নিম্নে প্রবাহিত সেই গঙ্গাস্রোত অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে বলিলেন "তুমি যদি চেলা হও, তবে ঐ স্থানে লাফিয়ে পড়" ("তুম্ চেলা হো তো উসমে কুদ্ পড়")। আমি ভাবিলাম, যদি না পড়ি, তবেও ইনি

আমাকে ভস্মীভূত করিবেন, পড়িলেও সম্ভবতঃ মৃত্যুই ঘটিবে। যাহা হউক, ইঁহার আদেশই প্রতিপালন করিব। এই ভাবিয়া সেই স্থান হইতেই অধোদিকে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক গঙ্গাজলে প্রবিষ্ট হইলাম, কিন্তু গঙ্গার বেগে আমি অতি শীঘ্রই জলের উপরে উত্থিত হইলাম। ঐ সঙ্কীর্ণ গঙ্গাস্রোতের উভয় পার্শ্বে বৃহৎ উচ্চ পাহাড় ছিল, সুতরাং তাহাতে অল্প আলোকই লক্ষিত হইত। আমি সেই অন্ধকারময় স্থান দিয়া অতিবেগে গঙ্গার স্রোতে অসহায় ভাবে বাহিত হইতে লাগিলাম। তখন সেই পুরুষ পাহাড়ের উপরে দাঁড়াইয়াই স্বীয় যোগবলে হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক দূরে জলমধ্যে স্থিত আমার কেশধারণ করিয়া একেবারে আমাকে জল হইতে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলেন। আমি এই অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলাম। তিনি আমাকে তখন স্নেহভরে উঠাইয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি চেলা হইবার যোগ্য বট, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি এক্ষণে এস্থান হইতে প্রস্থান কর, ইহা ঋষিদের তপস্যার ভূমি, তুমি এস্থানে থাকিও না।" আমি তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

বাবা, "উত্তরাখণ্ডে" পর্ব্বতাঞ্চলে অনেকস্থানে লুক্কায়িতভাবে এইরূপ প্রাচীন ঋষি সকল আছেন,

তাঁহাদের কোন প্রকার অবজ্ঞা করিলে অনেক সময় বিপন্ন হইতে হয়।

ইতি তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

চতুর্থ অধ্যায়

গুরুসন্নিধানে বাস

আমি কিছুদিন পরে আমার পূজ্যপাদ গুরুদেবের সহিত পুনরায় মিলিত হইলাম। তিনি অতি দীর্ঘকায় দীর্ঘ জটামণ্ডিত শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীমন্ নাগাজীর দ্বারার (শাখার) আচার্য্য ছিলেন। তাঁহার নাম শ্রী (১০৮) স্বামী দেবদাসজী। অযোধ্যা প্রদেশের সমীপবর্ত্তী কোন স্থান তাঁহার জন্মস্থান ছিল। তিনি যোগীশ্বর সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তাঁহাকে দর্শন করিলেই স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি সকলের শির অবনত হইত। তিনি ছয় মাস কাল একাসনে থাকিয়া সমাধিস্থ থাকিতেন।* যখন সমাধিস্থ না থাকিতেন, তখনও তাঁহার নিদ্রা ছিল না; সেই সময় তিনি গাঁজা ও চরসের ধূম মাত্র সময় সময়

* যখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার গুরুদেবের ৬ মাস কাল সমাধিস্থ হইয়া থাকার কথা বলিতেছিলেন, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম

পান করিতেন ; আর দিনে একবার ধূনী হইতে কিছু বিভূতি লইয়া আমাকে তাহা কাপড়ে ছানিয়া দিতে বলিতেন ; ঐ কাপড়ে ছানা বিভূতি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ওজন করিয়া এক কাষ্ঠের কমণ্ডলুস্থ জলে নিক্ষেপ করিতে বলিতেন, পরে ঐ বিভূতি ঐ জলে গুলিয়া সেই জল পান করিতেন ; কিছুক্ষণ পরে ঐ বিভূতিগোলা জল উদ্গার করিয়া এক পাত্রে নিক্ষেপ করিতেন, এবং আমাকে বলিতেন, ইহা তৌল করিয়া দেখ, তুমি যতটুকু আমাকে খাওয়াইয়াছিলে, ঠিক ততটুকু বাহির হইয়াছে কি না। আমি তৌল করিয়া দেখিতাম, ঠিক ততটুকুই বাহির হইয়াছে। সাধারণতঃ এই মাত্রই তাঁহার

"বাবাজী মহারাজ এই সমাধিতো ভঙ্গ হয়, সুতরাং স্থায়ী নহে। কিন্তু এমন কি অবস্থা নাই যাহা হইতে আর কখনও চ্যুতি হয় না ? ইহার যখন ভঙ্গ আছে, তখন ইহাও কি এক প্রকার জড়সমাধি নহে ?" এই কথোপকথনের সময় গিরিধারী দাস নামে একটি সাধু তথায় উপস্থিত ছিলেন, আমার এই প্রশ্ন শুনিয়া তিনি বলিলেন :—"আরে ৬ মাস সমাধিতে থাকা কি সহজ কথা ? তাহা কি অপর কেহ পারে, ইহা কি প্রকারে জড় সমাধি হইবে ? তিনি অবশ্য পরমাত্মস্বরূপ হইয়া থাকিবেন।" তখন বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "আরে এ জড় সমাধি নেই তো কেয়া ? জড়্কা মাফিক তো রয়তাই হ্যায়। পরমাত্মস্বরূপ হোনা তো আউর হ্যায় ; ওয়ে এক বকত হোনেসে কবহি ছোড়তা নহি। উস্‌কা ফের সমাধ ফমাধ কুচ্চ নেই, সদা এক অখণ্ড রয়তা।"

আহারের ব্যাপার ছিল। আমি তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়াই জানিতাম। তাঁহার আহার ছিল না বলিয়াছি, কিন্তু দুই একদিন তাহার ব্যতিক্রমও দর্শন করিয়াছিলাম। একদিনের ঘটনাটি এই ঃ—একদিন তিনি আমাকে বলিলেন "বাবা, হামরা কোঠা গরমিসে ভর গিয়া, তুম্ হামকো কুচ্চ দুধ পিয়াও তো গরমি মিট যায়।" আমি তখনই বস্তিতে গেলাম, এবং এক বৃহৎ চপ্‌টা (ডেগ) ভরিয়া বস্তি হইতে আধমণ দুধ লইয়া ঐ চপ্‌টা (ডেগ) তাঁহার সাক্ষাতে ধরিলাম, এবং করযোড়ে বলিলাম, "মহারাজ দুধ আনিয়াছি, আপনার যেমন ইচ্ছা হয় পান করুন।" তখন তিনি প্রসন্ন হইয়া দুধের চপ্‌টা হাতে করিয়া তুলিলেন, এবং দেখিতে দেখিতে সমস্ত দুধ একেবারে পান করিয়া ফেলিলেন। আধমণ দুধ একেবারে পান করিলেন দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। কিন্তু তিনি ঐ দুধ সমস্ত পান করিয়া বলিলেন ঃ—"বাবা, হামারা কোঠা কি গরমি কুচ্চ মিটা হ্যায়, বাকী আওরবি বহুৎ রহ গিয়া, হামকো আউর কুচ্চ দুধ পিলাও।" তখন আমি অবাক হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলাম এবং সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া করযোড়ে নিবেদন করিলাম "মহারাজ, তুম্ পরমাত্মা, তুমারি কোঠাকি গরমি দুসরা কোন্ মিটানে শেকতা ? হামারি ক্যায়সা সামর্থ্য হোগা তুমারি গরমি মিটানেকি ? তুম

আধমণ দুধ একসঙ্গে পিলিয়া, ইস্‌সে বি তোমারি গরমি মিটা নেই কহতে হো, আউর হ্যাম ক্যায়সা করেঙ্গে ?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "নেই নেই বাচ্চা, আউর কুচ্ছ দুধ লেআও, তুম্ যো লে আওগে উন্‌সে হামারি কোঠাকি গরমি মিট যায়গা।" তখন আমি পুনরায় বস্তিতে গিয়া আরও ৫।৭ সের দুধ সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। তিনি সেই সমস্ত দুধও পান করিলেন এবং পান করিয়া বলিলেন "অব্‌তো হামারি কোঠাকি গরমি মিট গিয়া, হাম প্রসন্ন হোয়া।" সেই দুধ কিন্তু উদ্গীরণ করিয়া আর ফেলিলেন না।

কোন এক সময় এক সহরের কিঞ্চিৎ দূরে একটি জঙ্গলের ভিতরে তিনি আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা তিন চারিজন চেলা তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। অপর চেলা সকলেই আমা অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ঐ জঙ্গলে ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকলেরও অভাব ছিল না। একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর, গুরুদেব আমাদের চেলা সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই জঙ্গলের অনতিদূরে যে সহর আছে, তোমরা একজন এক্ষণে সেই সহরে যাইয়া দুই টাকার গাঁজা খরিদ করিয়া লইয়া আইস।" রাত্রি অন্ধকারময় ছিল, এবং জঙ্গলে নানাবিধ হিংস্রজন্তু ছিল; সেই সময়ে অপর কোন চেলা যাইতে প্রস্তুত হইলেন না। তখন আমি বলিলাম, "মহারাজ, যদি আপনার মহকু

হয়, তবে আমি যাইতে প্রস্তুত আছি।” তিনি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, “আচ্ছা তুমিই যাও, সহরে গেলেই তুমি দুইটি টাকা পাইবে, ঐ দুই টাকার গাঁজা খরিদ করিয়া আনিবে।” আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে গুরুদেবের কার্য্য করিতে আমার কোন ভয় বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না। সুতরাং আমি তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া অকুতোভয়ে জঙ্গল পথ অতিক্রম করিয়া সহরে প্রবিষ্ট হইলাম; সহরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, দোকান সকল বন্ধ, সমস্ত নিস্তব্ধ। আমি রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, অনতিদূরে একটি গৃহে আলোক দৃষ্ট হইতেছে। আমি আস্তে আস্তে সেই গৃহের দরজার সাক্ষাতে উপস্থিত হইলে আমাকে দেখিবামাত্র একটি লোক অতি প্রসন্নবদনে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমাকে দণ্ডবৎপূর্ব্বক বলিল, “মহারাজ, আমাকে অদ্য বড় কৃপা করিয়াছেন, আমি কোন সাধুকে দুইটি টাকা ভেট দিব বলিয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন সাধুকে দেখিতে পাই কি না এই উদ্দেশ্যে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম; আমার বহু ভাগ্য যে আপনি এই সময়ে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, আমার সঙ্কল্পিত এই দুইটি টাকা আপনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন।” আমি তখন ঐ দুইটি টাকা গ্রহণ করিয়া মনে মনে শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিয়া তাঁহার মহিমা বুঝিয়া দণ্ডবৎ করিলাম,

এবং পরে গাঁজা-বিক্রেতার দোকানে গিয়া তাহাকে জাগরিত করিয়া তাহার নিকট হইতে দুই টাকার গাঁজা খরিদ করিয়া লইলাম। গাঁজা খাওয়া তখন আমার নিজেরও যথেষ্ট অভ্যস্ত হইয়াছিল। সুতরাং ঐ গাঁজা হইতে এক চিলম গাঁজা লইয়া আমি তাহা সাজিয়া পান করিলাম, এবং পরে অবশিষ্ট গাঁজা লইয়া আমার গুরুজীর নিকট আসিয়া তাহা তাঁহার সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিলাম। গুরুদেব বলিলেন, "বৎস, এইরূপ করিয়াই কি গুরুর কার্য্য করিতে হয়? অগ্রভাগ নিজে খাইয়া অবশিষ্ট দ্রব্য কি গুরুকে দিতে হয়? ইহাই কি তোমার শিক্ষা হইয়াছে?" আমি তাঁহার এই কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। বুঝিলাম, গুরুদেব যথার্থই অন্তর্য্যামী ও সর্ব্বজ্ঞ, কোন দূরত্বই তাঁহার দৃষ্টির আবরণ জন্মাইতে পারে না। তখন আমি হাত যোড় করিয়া ভীতভাবে বলিলাম, "প্রভো! আমার অপরাধ হইয়াছে, আমি বালক অবোধ, আপনার মহিমা অবগত হইতে পারি নাই, আমার অপরাধ কৃপা করিয়া ক্ষমা করুন, আমি কখনই আর এরূপ কার্য্য করিব না।" তখন গুরুদেব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি বালক, তোমার অপরাধ এইবার ক্ষমা করিলাম, আর কখনও এইরূপ করিও না; জানিবে, গুরু হইতে কোন কার্য্য এবং কোন

চিন্তা গোপন করা যায় না।” আমি সেই অবধি আপন কর্ণ আপন হস্তে ধারণ করিয়া মনে মনে বলিলাম, গুরু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান, আমি কখনও তাঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিব না; এবং এইরূপ গুরু আমি লাভ করিয়াছি মনে করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে ইঁহার চরণ পরিত্যাগ করিয়া আমি কুত্রাপি যাইব না।

গুরুদেবের মহিমা আমি অনেকবারই প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তন্মধ্যে দুইটি মাত্র ঘটনা বলিতেছি। একবার বহু সাধু (প্রায় এক সহস্র সাধু) সমভিব্যাহারে গুরুদেব লাহোরের নিকটে যাইয়া আসন স্থাপন করিলেন। সহরে বাণিয়া শেঠ লোক অনেকে তাঁহার ও জমাতস্থ সাধুদিগের দর্শন করিতে আসিল, তন্মধ্যে শাল-ব্যবসায়ী বহু ধনাঢ্য এক বাণিয়া ছিল। গুরুদেব তাহাকে বলিলেন, “অদ্য তুমি এই সমস্ত সাধুদিগকে ভোজন করাও।” সে বলিল, “আমি এত লোকের ভোজন করাইতে পারিব না”; অধিকন্তু সাধুদিগের প্রতি কিছু অবজ্ঞা প্রদর্শনও করিল।

গুরুদেব বলিলেন, “বাণিয়া, তুমি ধনমদে মত্ত হইয়াছ, তুমি সাধুদিগের প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে, তন্নিমিত্ত তোমার কিছু দণ্ড হওয়া আবশ্যক। যাও, ঘরে ফিরিয়া যাও, তুমি শালবস্তায় অদ্যই অগ্নিদেবের কোপ দর্শন করিবে।” বাণিয়া চলিয়া গেলে, গুরুদেব

কিঞ্চিৎ জল হাতে লইয়া ধুনির অগ্নিতে তাহা অর্পণ করিয়া বলিলেন, "বাণিয়ার শালবস্তায় এই আগুন লাগিল।" আমি তখন তাঁহার নিকটেই বসিয়াছিলাম, দেখিলাম অল্পক্ষণ মধ্যেই সেই বাণিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে। সে আসিয়া অমনি ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মহারাজ, আমাকে রক্ষা করুন, আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, আমি সাতদিন পর্য্যন্ত আপনার জমাতের সমস্ত সাধুর ভোজন যোগাইব, আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, আমার সিন্দুকের মধ্যস্থিত শালের বস্তায় আগুন লাগিয়াছে।" তখন গুরুদেব বলিলেন, "আচ্ছা, সাতদিন পর্য্যন্ত তুমি জমাতের ভোজন দেও, তোমার শালের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল, কেবল তোমার দণ্ডের নিমিত্ত একখানি শাল নষ্ট হইল, সাধুদিগের প্রতি এরূপ অবজ্ঞা কখনও করিও না।" সেই সময় বাণিয়ার ঘর হইতে লোক দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল "মহারাজ! যে শালখানিতে প্রথম অগ্নি প্রকাশিত হয়, সেই শালখানি আমরা সিন্ধুক হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়াছি, সেই শালখানি নষ্ট হইয়াছে, এবং অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে।" বাণিয়া তখন গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া সাধুদিগের ভোজনের উদ্যোগ করিতে চলিল।

বাণিয়া চলিয়া গেলে এই ব্যাপার দর্শনে আমি

অতিশয় বিস্মিত হইয়া গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ পূর্ব্বক করজোড়ে নিবেদন করিলাম, "মহারাজ! এই ব্যাপার দেখিয়া আমি অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। যদি আমার শ্রোতব্য হয় তবে কৃপা করিয়া ইহার তত্ত্ব আমাকে বলুন।" তখন গুরুদেব প্রসন্ন হইয়া আমাকে বলিলেন, "বৎস! তুমি ইহাতে বিস্মিত হইও না, যোগীশ্বরদিগের সকল প্রকার বিদ্যাই আয়ত্ত আছে, প্রয়োজন হইলে সকল প্রকার বিদ্যারই প্রয়োগ তাঁহারা করিয়া থাকেন। এই বাণিয়া সজ্জন লোক, কিন্তু ধনমদে গর্ব্বিত হইয়া ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছিল, এই দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাবধি সে পুনরায় বিনম্র হইবে এবং নানা ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। যে বিদ্যা দ্বারা ইহার কল্যাণার্থে আমি ইহাকে অদ্য দণ্ডিত করিলাম, সেই বিদ্যার নাম কালাগ্নি বিদ্যা, এই বিদ্যা আমি তোমাকে অর্পণ করিব, কিন্তু তুমি ইহা গোপনে রাখিবে, অপাত্রে অর্পণ করিবে না।"

একবার ভ্রমণ করিতে করিতে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ দূরস্থানে রাখিয়া ভূপাল-তালের উপর গুরুদেব একাকী গিয়া আপন আসন স্থাপন করিলেন এবং আসনে উপবিষ্ট হইয়া অতিশয় বেগের সহিত শঙ্খধ্বনি করিলেন। ঐ তালের অপর দিকে নিকটে মুসলমান নবাবের বাসস্থান ছিল। সেই নবাব ইতিপূর্ব্বে ঘোষণা করিয়া-

ছিলেন যে তাঁহার বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে শঙ্খ অথবা ঘণ্টাধ্বনি হইতে পারিবে না, যে কেহ এইরূপ ধ্বনি করিবে তিনি তাহার শিরশ্ছেদ করিবেন। গুরুদেব সজোরে শঙ্খধ্বনি করিলে, সেই ধ্বনি নবাবের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি তাঁহার পারিষদ্-বর্গের প্রতি আদেশ করিলেন যে "দেখ, কোন্ ব্যক্তি আমার আদেশের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া শঙ্খবাদন করিতেছে।" তখনই দ্রুতবেগে নবাবের অনুচরেরা তালের পাড়ে আসিয়া দেখিল, গুরুদেব শঙ্খহাতে তথায় উপবিষ্ট আছেন; এবং অনতিবিলম্বে নবাবের সমীপে গিয়া বলিল, "এক জটাজূটধারী তেজস্বী তপস্বী এই শঙ্খবাদন করিয়াছে।" তাহাতে নবাব বলিলেন, "এই ব্যক্তি অতিশয় ধৃষ্ট, আমার আদেশ অবজ্ঞা করিয়া আমার ভবনের নিকটেই তালের উপরে বসিয়া এইরূপ শঙ্খধ্বনি করিতেছে, অবিলম্বে যাইয়া ইহার শিরশ্ছেদ কর, অথবা ইহাকে ধৃত করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস।" তখন নবাবের অনুচরেরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গুরুদেব যেস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন সেইস্থানে আসিল। কিন্তু তথায় আসিয়া দেখিল যে সেখানে কোন জীবিত মনুষ্য নাই; সেই সাধুর মুণ্ড এক জায়গায়, হাত এক জায়গায়, পা এক জায়গায়; এইরূপ শরীর স্থানে স্থানে খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়া আছে। ইহা দেখিয়া

অনুচরেরা ফিরিয়া গেল এবং নবাবকে সংবাদ দিল যে অপর কোন ব্যক্তি তাহারা যাইবার পূর্ব্বেই সেই সাধুর শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিয়াছে। কিন্তু তৎপরক্ষণেই পুনরায় গুরুদেব সজোরে শঙ্খধ্বনি করিলেন। পুনরায় শঙ্খধ্বনি শুনিয়া অনুচরদিগকে নবাব তথায় প্রেরণ করিলেন। তাহারা এইবার আসিয়া দেখিল যে সেইস্থানে কোন মনুষ্যই নাই, এবং কাটা মুণ্ড হস্ত পদ প্রভৃতি যাহা তাহারা পূর্ব্বে দেখিয়া গিয়াছিল, তৎসমস্ত কিছুই নাই! তখন তাহারা বিস্মিত হইয়া নবাবের নিকট গিয়া এই সংবাদ জানাইল। কিন্তু তৎপরক্ষণেই পুনরায় সেইস্থান হইতে শঙ্খধ্বনি শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। তখন নবাব ভীত হইলেন এবং মনে করিলেন যে যিনি এই শঙ্খধ্বনি করিতেছেন, তিনি কোন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধ মহাপুরুষ হইবেন, অতএব তাঁহার সঙ্গে বিরোধ করা সঙ্গত নহে এবং যাহাতে কোন অভিসম্পাত করিয়া রাজ্যের বিঘ্ন উৎপাদন না করেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে নবাব সাহেব স্বয়ং অমাত্যবর্গের সহিত সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেইস্থানে শঙ্খহস্তে জটাজূটধারী দীর্ঘকায় একজন যোগিপুরুষ বসিয়া আছেন। তখন নবাব সাহেব ও তাঁহার অমাত্যবর্গসকলে সেই যোগীশ্বরকে যথাবিহিত অভিবাদন

পূর্ব্বক তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহারা তাঁহার কি অভিপ্রায় প্রতিপালন করিবেন তাহা আদেশ করিতে বলিলেন। তখন গুরুদেব বলিলেন, "এই শঙ্খ ঘণ্টা বাদন করিতে যে তুমি প্রতিষেধ করিয়াছ ইহা অতি অন্যায় ; তুমি মুসলমান, তোমার ধর্ম্ম তুমি যাজন কর ; কিন্তু হিন্দু হিন্দুর ধর্ম্ম যাজন করিবে, ইহাতে তুমি কেন বিঘ্ন উৎপাদন করিবে ? তোমার এই আদেশ প্রত্যাহার কর। আর এই তালের নিকট এক মন্দির আছে, তাহার সংস্কার করিয়া আমি প্রস্তুত করাইব, তাহাতে তুমি কোন বাধা দিতে পারিবে না।" নবাব তদ্রূপই হইবে বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে আমার গুরুদেব সেইস্থানে ঠাকুর-মন্দির প্রস্তুত করাইলেন। তদবধি ঐ ভূপাল-তালই আমার গুরুদ্বারা হইয়াছে।

এবম্বিধ সদ্গুরুর আশ্রয়লাভ করিয়া আমি প্রফুল্ল-মনে ও নিষ্ঠার সহিত তাঁহার সেবা এবং তৎপ্রদত্ত উপদেশ সকল পালন করিতে লাগিলাম। যাহাতে আমি যথার্থ সাধু হই, তদ্রূপ উপদেশ আমার গুরুদেব আমার প্রতি করিতেন। তাঁহার মায়িক মোহ কিছুমাত্র ছিল না। আমার প্রতি প্রতিরাত্রের নিমিত্ত এই উপদেশ ছিল যে সন্ধ্যার পর ধুনী চেতন করিয়া তৎ-

সমীপে আপন আসন স্থাপন করিবে এবং আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া ভজন করিবে ; সন্ধ্যার পর অপর কাহারও নিকট যাইবে না। একখানি তিন হাত মাত্র দীর্ঘ বস্ত্র আমার ব্যবহারের নিমিত্ত দিয়াছিলেন। আমি যদি রাত্রে উপবেশনে না থাকিয়া শয়ন করিতে চেষ্টা করিতাম, তবে বস্ত্রের অভাবেই শীত নিবারণের জন্য বাধ্য হইয়া আমাকে ধুনীর আশ্রয়ে পুনরায় উঠিয়া বসিতে হইত। "উত্তরাখণ্ডে" অত্যন্ত শীত, বরফ পড়ে ; গাছতলায় আমার আসন। যে বস্ত্রখানি দিয়াছিলেন, লম্বা হইয়া শয়ন করিয়া তাহা দ্বারা পায়ের দিক ঢাকিতে গেলে বুক পর্য্যন্ত খালি থাকিত, মাথার দিক ঢাকিতে গেলে পায়ের দিক খালি হইয়া পড়িত ; সুতরাং শীতে কম্পিত হইয়া পুনরায় উঠিয়া বসিতে হইত। নিয়ম ছিল, সম্মুখের দিকে ধুনী থাকিবে, তাহার উত্তাপে শরীর গরম থাকিবে, আর পশ্চাতের দিকে দুই ভাঁজ করিয়া ঐ বস্ত্রখানি স্কন্ধ হইতে নিম্নদিকে ঝুলাইয়া রাখিবে এবং তাহার উপরে মস্তকের জটা বিস্তৃত করিয়া দিবে ; এইরূপে পৃষ্ঠদেশ শীত হইতে রক্ষা করিবে! এইরূপ করিয়া সমস্ত রাত্রি আসনে উপবেশন পূর্ব্বক ভজন করিবে। তদ্ব্যতীত আমার কোমরে মোটা ভারি কাষ্ঠের আড়বন্ধ এবং কাষ্ঠের লেঙ্গুটি বিধিপূর্ব্বক তাহা ধারণের মন্ত্র উপদেশ করিয়া আমাকে পরাইয়া

দিয়াছিলেন। শয়ন করিতে গেলে ঐ কাষ্ঠের আড়বন্ধ বহুদিন পর্য্যন্ত আমাকে কষ্ট দিত; এক্ষণে যদিও এই আড়বন্ধ লইয়াই শয়ন করা আমার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি প্রথমে ইহাও রাত্রে শয়ন করিবার পক্ষে আমার প্রতিবন্ধক জন্মাইত। দিনের বেলায় মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইবার পর (আমাদের এক বেলাই আহারের নিয়ম ছিল) কোন বালুকাময় স্থানে বালি সরাইয়া তাহার উপর কিছুকাল শয়ন করিবার ব্যবস্থা ছিল। আমি ঐ সময় আড়বন্ধের কাষ্ঠ বালির মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতাম, সুতরাং সমস্ত শরীর সমতল বালির উপর থাকিত, তাহাতে আর শয়ন করিতে কষ্ট হইত না। এইরূপে কিছুক্ষণ শয়ন করিতাম।

আমার গুরুদেব একটি ছোট ঝুপ্‌ড়ির ভিতরে থাকিতেন; আসনে সর্ব্বদা উপবিষ্ট থাকিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাধারণতঃ তাঁহার কোন আহার ছিল না, কেবল একবার বিভূতি জলে গুলিয়া পান করিয়া তাহা উদ্গার করিয়া ফেলিতেন এবং চরস ও গাঁজার ধূম সময় সময় পান করিতেন। তাঁহার শাসনের কঠোরতা-নিবন্ধন তাঁহার অপর শিষ্যগণ ক্রমে ক্রমে সকলেই তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, কেবল আমিই তাঁহার সঙ্গে রহিলাম। তাঁহার শাসন কিরূপ ছিল, তাহা নিম্নোক্ত দুই একটি ঘটনা দ্বারা বুঝিতে পারিবে।

একদিন উত্তরাখণ্ডে শীতের রাত্রিতে ধুনীর নিকট আমি বসিয়া ভজন করিতেছিলাম; কিন্তু তামস আলস্য বশতঃ সেই দিবস আমার নিদ্রা উপস্থিত হইল। আমি বিনা চেষ্টায় আস্তে আস্তে শুইয়া পড়িলাম; অতি গাঢ়-নিদ্রায় অভিভূত হওয়ায় কিছুক্ষণ ধরিয়া আমার কোন চৈতন্য রহিল না। এইদিকে বরফ পড়িতেছিল, স্থতরাং ধুনী আপনা হইতে অল্পক্ষণ পরে বুজিয়া গেল। ধুনী বুজিয়া যাইবার পর অল্পক্ষণের মধ্যেই এত অধিক শীত শরীরে প্রবিষ্ট হইল যে তাহাতে শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল এবং আমার নিদ্রা সহজেই ভঙ্গ হইয়া গেল। আমি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিলাম এবং দেখিলাম ধুনী নির্ব্বাপিত, এবং চতুর্দ্দিকে বরফ পড়িতেছে। অগ্নি প্রজ্বলিত না করিলে নিশ্চয় মৃত্যু। কি করিব ভাবিতে লাগিলাম। আসন ছাড়িয়া অন্য কাহারও নিকট রাত্রে যাওয়া গুরুদেব কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ। রাত্রে তাঁহার নিকটে যাওয়াও নিষিদ্ধ। তাঁহার নিকটে গিয়া আগুন চাহিলে আমি যে ভজন ছাড়িয়া নিদ্রিত হইয়াছিলাম, তন্নিমিত্ত তিনি আমাকে দণ্ডিত করিবেন। অগ্নি আনয়ন না করিলেও শীতে শরীর বরফ হইয়া যাইবে এবং নিশ্চিত মৃত্যু ঘটিবে। এই সকল ভাবিয়া অবশেষে স্থির করিলাম যেরূপ দণ্ডই করুন, গুরুদেবের নিকটই যাইব, তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া অপর কাহারও নিকটে যাইব

না। তখন আমি আস্তে আস্তে উঠিয়া গুরুদেব যে ঝুপ্‌ড়িতে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহার দরজার সমক্ষে গিয়া দণ্ডায়মান হইলাম। তিনি তখনই জিজ্ঞাসা করিলেন "কে বাহিরে দাঁড়িয়ে?" আমি বলিলাম "মহারাজ, আমি রামদাস।" তিনি বলিলেন "তুমি রাত্রিকালে আসন ছাড়িয়া কেন এখানে আসিয়াছ?" আমি বলিলাম "মহারাজ, আমার ধুনী বুজিয়া গিয়াছে, একটু আঁচ লইতে আসিয়াছি।" তিনি বলিলেন "তুমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে, নতুবা ধুনী কিরূপে বুজিয়া গেল? তুমি এইরূপ ঘুমাইবার জন্য কি পিতামাতাকে কষ্ট দিয়া ঘর বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছ? যদি এইরূপ ঘুমাইয়াই রাত্রি কাটাইতে হয়, তবে ত ঘরেই বেশ ঘুমাইতে পারিতে? পিতামাতার প্রাণে কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি ছিল?" এইরূপ নানা কথা বলিয়া আমাকে ধমকাইতে লাগিলেন। আমি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলাম "মহারাজ, আমার অপরাধ হইয়াছে, হঠাৎ ঘুম আসিয়া আমাকে অচেতন করিয়াছিল, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি এখন হইতে আরও বিশেষ সাবধান থাকিব।" তিনি তখন খুব তেজের সহিত আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "তুমি যেখানে আছ, সেইখানে এক ঘণ্টা খাড়া থাক, এক্ষণে আগুন পাইবে না।" গুরুদেবের মহিমা আমি অবগত ছিলাম, সুতরাং তাঁহার আদেশ

অবহেলা করা আমার দুঃসাধ্য ছিল। আমি সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং শীতে কাঁপিতে লাগিলাম। কিছুকাল পর গুরুদেব তাঁহার ধুনী হইতে এক প্রজ্বলিত কয়লা বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "এইবার ইহা লইয়া যাও, ফের্ যেন এমন আর কখন না হয়।" আমি কয়লা লইয়া গিয়া পুনরায় আমার ধুনী প্রজ্বালিত করিলাম এবং আসনে উপবিষ্ট হইয়া ভজন করিতে লাগিলাম।

একদিন গুরুদেব আমাকে বলিলেন "বৎস, কোন প্রয়োজনে আমি একস্থানে যাইব, আমি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ তুমি এই স্থানে বসিয়া থাকিতে পারিবে ? কিন্তু যতক্ষণ না ফিরিব ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই স্থান হইতে কোন কারণে অন্যত্র উঠিয়া যাইতে পারিবে না।" আমি বলিলাম "আপনার আদেশ আমি অবশ্য প্রাণপণে প্রতিপালন করিব।" তখন তিনি একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে বলিলেন "আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত এইস্থানে তুমি বসিয়া থাকিবে।" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। আমি তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া সে স্থানে উপবেশন করিলাম। ক্রমশঃ দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু তিনি আসিলেন না। অবশেষে অষ্টম দিবসে তিনি প্রত্যাগত হইলেন। তখন আমি দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি এই স্থানে উপবিষ্ট

ছিলে ?” আমি করযোড়ে বলিলাম “হাঁ, মহারাজ, আপনি এই স্থান হইতে যাওয়ার পর হইতে এইক্ষণ পর্য্যন্ত এই স্থানেই উপবিষ্ট আছি।” তিনি বলিলেন “তুমি মলমূত্র ত্যাগ করিতেও এখান হইতে উঠিয়া যাও নাই কি ?” আমি বলিলাম “না, আপনার কৃপায় আমার প্রস্রাব অথবা বাহ্যের বেগ এই সময়ের মধ্যে বিশেষরূপে হয় নাই।” তিনি বলিলেন, “তুমি কিছু আহার কর নাই ?” আমি বলিলাম “না, মহারাজ, আমি কিছু আহার পাই নাই।” তখন তিনি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন “বৎস ! এইরূপেই গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিতে হয় ; পিতামাতাকে কষ্ট দিয়া, আত্মীয়স্বজনকে কাঁদাইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া গুরুর আদেশ কায়মনোবাক্যে এইরূপে প্রতিপালন করিলেই ভগবান্ প্রসন্ন হয়েন এবং পিতামাতাকে কাঁদান সার্থক হয়।”

এইরূপে আমি দৃঢ়ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক গুরুসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার আদেশ সকল প্রতিপালন করিতে লাগিলাম। তিনিও আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ক্রমশঃ হঠযোগের সমস্ত ক্রিয়ার সহিত অষ্টাঙ্গযোগ আমাকে শিক্ষা দিলেন এবং প্রয়োগ প্রণালীর সহিত সর্ব্ববিধ মন্ত্র আমাকে উপদেশ করিলেন এবং যাহাতে আমার ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি পরাজিত হয় তন্নিমিত্ত সময় সময় আমাকে নানা প্রকার শাসন ও যন্ত্রণাদায়ক

ও ক্রোধ-উদ্দীপক বাক্য দ্বারা তিরস্কৃত করিতে লাগিলেন। সামান্য কারণে অথবা কেবল কল্পিত কারণ ভাণ করিয়া আমাকে "ভাঙ্গী", "চামার", "পেটের নিমিত্ত বৈরাগ লইয়াছিস্" এইরূপ কথা সকল যাহা বলিয়া অপর লোকে সাধুদিগকে তিরস্কৃত করে, সেই সকল গালি আমার উপর বর্ষণ করিতেন। এবং তদ্দ্বারা আমার ক্রোধ অথবা অভিমান উদ্দীপিত হয় কি না তাহা পরীক্ষা করিতেন। কখনও অনশনে রাখিয়া, কখনও নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যবস্তু উপস্থিত করাইয়া আমার লোভ উপগত হইয়াছে কি না এবং ক্ষুধায় ধর্ম্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হয় কি না তাহা পরীক্ষা করিতেন। আমার প্রতি তাঁহার এতই অমায়িক স্নেহ ছিল যে আমার হিতার্থে এই সকল কঠোর ব্যবহার করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না।

এইরূপে বৎসরের পর বৎসর গুরুসন্নিধানে থাকিয়া আমি অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। আমি তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ দেখিতাম, এবং সময় সময় তাঁহার প্রভাব ও মহিমা দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। এইরূপে বহু বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে একদিবস গুরুদেব অতি রুদ্র-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হঠাৎ আমার সমক্ষে এক বৃহৎ যষ্টি-হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন এবং তদ্দ্বারা সজোরে আমার সর্ব্বাঙ্গে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং সক্রোধে বলিতে

লাগিলেন "বাইনচৎ! আমার বড় বড় সব চেলা চলিয়া গিয়াছে, তুই একলা আমার পিছে পড়িয়া আছিস্ কেন, তুই আমার নিকট হইতে চলিয়া যা। আমি কাহারও সেবা চাই না।" এইরূপ বলিতে বলিতে আমাকে এমন প্রহার করিতে লাগিলেন যে আমার সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া গেল এবং আমার সর্ব্বাঙ্গে ভীষণ বেদনা উপস্থিত হইল। আমি তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং হাত জোড় করিয়া বিনীত অথচ স্থিরভাবে তাঁহাকে নিবেদন করিলাম "মহারাজ, আমার একটি কথা আপনি কৃপা করিয়া শ্রবণ করুন; আমার পিতামাতার ঘরে আহার বিহারে কোনপ্রকার অসচ্ছলতা ছিল না, তাহা আপনি অবগত আছেন। আমি নিজ ইচ্ছাতেই পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছি। তদবধি আপনাকেই পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু এবং গুরু জানিয়া আপনার নিকট অবস্থান করিতেছি। আমি সংসারে আর কাহাকেও আপনার বলিয়া জানি না। আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলে আমি আর কোথায় যাইব? তবে আপনি একান্তই যদি আমাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার এই গলা আপনার নিকট উপস্থিত করিলাম, আপনি ছুরি দ্বারা ইহা ছেদন করিয়া আমার দেহান্ত করুন; জীবিত থাকিতে আমি কখনই আপনাকে ছাড়িয়া থাকিব না।" আমাব এই

নিবেদন শুনিয়া গুরুদেব প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন "বৎস, তোমার শেষ পরীক্ষা অদ্য আমি করিলাম। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। তোমার বুদ্ধি নিশ্চল হইয়াছে। অদ্যাবধি তোমার পরীক্ষা শেষ হইল। এক্ষণ হইতে তুমি সুখে বিচরণ করিবে। আমি তোমার প্রতি অতি প্রসন্ন হইয়াছি। তোমাকে এই বর দান করিতেছি যে তোমার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তুমি উপাস্যদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে এবং তোমার নিকটে সর্ব্বদা ঋদ্ধি সিদ্ধি সকল উপস্থিত থাকিবে। তুমি যাহাকে যাহা বলিবে তৎসমস্ত সফল হইবে। তোমার বাক্য কখনও নিষ্ফল হইবে না" ইত্যাদি। আমি এই সকল বরলাভ করিয়া অবাক হইয়া রহিলাম এবং গুরুদেবকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিলাম।

ইহার কিয়দ্দিবস পর একদা গুরুদেব এক সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগরের প্রান্তে গিয়া আসন স্থাপন করিলেন। তাঁহার আসন হইতে কিছু দূরে আমিও আপন আসন স্থাপন করিলাম, কারণ গুরুদেবের আসনের সন্নিকটে অপর কাহারও আসন স্থাপন করিবার আদেশ ছিল না। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ শরীর দর্শনে নগরের লোকসকল আকৃষ্ট হইয়া দর্শন লালসায় আমরা যে স্থানে ছিলাম সে স্থানে আসিতে লাগিল। কয়েকজন লোক তাঁহাকেও দর্শন দণ্ডবৎ করিল এবং আমার নিকটে আসিয়া

আমাকেও দর্শন দণ্ডবৎ করিল। তৎপর তাহাদের মধ্যে একজন আমাকে দণ্ডবৎ করিয়া চারিটি টাকা ভেট স্বরূপে আমার নিকটে রাখিল। আমি তাহাকে বলিলাম "ছি ছি, তুমি কর কি? আমার গুরুদেব যোগীরাজ ঐ নিকটে বসিয়া আছেন, তাঁহার সমীপে গিয়া 'ভেট' উপস্থিত কর। তিনি সাক্ষাতে রহিয়াছেন, তাঁহার নিকট ভেট না ধরিয়া আমার অগ্রে ধরা উচিত নয়।" সেই লোকটি উত্তর করিল "বাবাজি, আমি আপনাকেই পূজা করিতেছি, আপনার প্রতিই আমার শ্রদ্ধা হইয়াছে, আপনাকেই এই ভেট অর্পণ করিলাম।" আমি বলিলাম "ইহা কখনও হইতে পারে না, যোগীশ্বর গুরুদেব সাক্ষাতে থাকিতে আমি কখন ভেট পূজা গ্রহণ করিতে পারি না, তুমি এই ভেট লইয়া গিয়া তাঁহার সাক্ষাতে ধর।" কিন্তু সেই ব্যক্তি তদ্রূপ করিতে কিছুতেই সম্মত না হইয়া টাকাগুলি আমার অগ্রে রাখিয়া চলিয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ শশব্যস্তে উঠিয়া ঐ টাকাগুলি লইয়া গুরুদেবের নিকট গেলাম, এবং ঐ টাকাগুলি তাঁহার সাক্ষাতে রাখিয়া করযোড়ে নিবেদন করিলাম "মহারাজ, এই চারিটি টাকা একজন লোক ভেট দিয়াছে, তাহা কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন।" তিনি যেন ক্রোধ করিয়া আমাকে বলিলেন "হাঁরে, তুই কেমন চেলা! গুরুর সাক্ষাতেই তুই পূজা গ্রহণ করিতে

আরম্ভ করিয়াছিস্!” আমি করযোড়ে বিনীতভাবে নিবেদন করিলাম “মহারাজ, আমি ইহা লইতে চাহি নাই, আপনার সম্মুখে এই ভেট উপস্থিত করিতে আমি সেই লোকটিকে বিশেষরূপে বলিয়াছি, কিন্তু সে কিছুতেই আমার কথা না শুনিয়া আমার সাক্ষাতে ভেট রাখিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সে চলিয়া গেলে আমি তৎক্ষণাৎই তাহা লইয়া আপনার সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়াছি। আমি ইহা স্বয়ং গ্রহণ করি নাই।” তখন গুরুদেব একটু হাসিয়া বলিলেন “বৎস, তুমিও এখন সিদ্ধ হইয়াছ।” এই কথা বলিয়া যেন স্বগত ভাবে বলিলেন “তুম্‌বি অব্ সের হো গিয়া; বাকি, দো সের এক ঠোর মে নহি রহনে শক্তা হায়।”

এই ঘটনার দুই তিন দিবস পর গুরুদেব আমাকে বলিলেন “বৎস, দ্বারকা আমাদের সম্প্রদায়ের মুখ্যধাম। এই ধাম একবার দর্শন করিয়া আসা তোমার পক্ষে অত্যাবশ্যক।” আমি বলিলাম “মহারাজ, আমি আপনাকেই ভগবান্ বলিয়া জানি, আর শাস্ত্রেও আছে গুরুচরণে সমস্ত তীর্থ বিরাজমান আছে। অতএব আপনার চরণদর্শনেই আমার সমস্ত তীর্থ দর্শন হইতেছে। অতএব অন্য কোন তীর্থদর্শনে যাইতে আমার ইচ্ছা নাই।” গুরুদেব বলিলেন “আরে, তুই বড় জ্ঞানী হইয়াছিস্! তোর মত জ্ঞানী বুঝি আর কেহ কখনও

হয় নাই ! তোর গুরু দ্বারকা দর্শন করিতে গিয়াছেন, দাদা গুরু গিয়াছেন, পর দাদা গুরু গিয়াছেন, আর তুই এম্‌নি জ্ঞানী হইয়াছিস্ যে বলিতেছিস্ তোর কোন তীর্থ দর্শনের প্রয়োজন নাই। এই সকল বুদ্ধি পরিত্যাগ কর্। আমি বলিতেছি দ্বারকাধাম দর্শন করিয়া আয়।” গুরুদেব এইরূপ বলিলে আমি বলিলাম “মহারাজ, আমি দ্বারকা কোথায় কিছুই জানি না, কোন্ দিকে ঐ দেশ তাহাও জানি না, আমি কি প্রকারে দ্বারকায় যাইব ? আপনি কৃপা করিয়া আমাকে আপনার নিকটেই থাকিতে দেন। আপনার সেবা করিলেই আমার মন প্রসন্ন হয়।” গুরুদেব তখন চুপ করিয়া রহিলেন, আমার কথার প্রত্যুত্তরে আর কিছুই বলিলেন না। কিন্তু পরদিবসই দুইটি সাধু গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমরা কোথায় যাইবে ?” তাঁহারা বলিলেন “আমরা দ্বারকাধাম দর্শন করিতে যাইতেছি।” তখন গুরুদেব সমীপস্থ আমাকে বলিলেন “তুমি বলিয়াছিলে দ্বারকাধাম কোথায় কোন্‌দিকে তাহা জান না, এই দুইটি সাধু আসিয়াছেন, ইঁহাদের উভয়েই দ্বারকাধামে যাইবেন। অতএব তুমি ইঁহাদিগের সঙ্গে দ্বারকা দর্শনে প্রস্থান কর।” তখন অগত্যায় বাধ্য হইয়া আমি গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ঐ পূর্ব্বোক্ত

সাধু দুইটির সঙ্গে দ্বারকায় যাত্রা করিলাম। গুরুদেব আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "তুমি দ্বারকা দর্শন করিয়া আইস, রাস্তায় তোমার কোন কষ্ট হইবে না। তোমার সমস্ত আবশ্যকীয় বস্তু তোমার বিনা চেষ্টায় তোমার নিকট উপস্থিত হইবে।"

আমি দ্বারকাভিমুখে প্রস্থিত হইলে রাস্তায় বাস্তবিকই আমার কোন প্রকার অভাব বা অসুবিধা ঘটিল না। যেখানে গিয়া মধ্যাহ্নে অথবা সায়াহ্নে আসন স্থাপন করিতাম, সেখানেই লোকজন আসিয়া আমাদের খাদ্য সামগ্রী ও গাঁজা চরস প্রভৃতি সব দিয়া যাইত। রাজপুতানার মরুভূমি পার হইতে বস্তির লোক আপনা হইতে শকট গাড়ী জুটাইয়া দিত। এইরূপে দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া দ্বারকানাথের দর্শন করিলাম এবং তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া গুরুদেব যে স্থানে ছিলেন সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম সেইস্থানে আমার জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা সকলে উপস্থিত আছেন, সকলেরই বদন বিষণ্ণ, এবং গুরুদেব সে স্থানে নাই। আমি গুরুদেবের কথা জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম; তখন অতি কষ্টের সহিত তাঁহারা বলিলেন যে গুরুদেব দেহরক্ষা করিয়াছেন, তিন দিবস হইল দেহরক্ষা করিয়াছেন। এই নিদারুণ সংবাদ শুনিবামাত্র আমার মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। আমি জানিতাম তিনি

ভগবান্, ব্রহ্মর্ষি, জরামৃত্যু রহিত, সুতরাং গুরুভ্রাতাদিগের প্রদত্ত সংবাদে আমি আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না। আমি কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তাঁহাদিগকে বলিলাম, গুরুদেব সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ ছিলেন, তাঁহার কিরূপে মৃত্যু হইতে পারে ? আপনারা আমাকে ছলনা করিতেছেন। তাঁহারা বলিলেন, তাঁহাদের সাক্ষাতেই তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহারা তাঁহার দেহের সৎকার করিয়াছেন। আমি এই সকল বাক্য শুনিয়া একেবারে মর্ম্মাহত হইলাম, বলিলাম, হায় এই জন্যই কি তিনি আমাকে স্থানান্তরে পাঠাইয়াছিলেন ? তিনি ভগবান্, তাঁহার মৃত্যু কিরূপে সম্ভব হয়? আমি তাঁহার দর্শন না পাইলে এ জীবন রাখিব না। আমি শোকে ক্রমে এতই অভিভূত হইলাম যে স্বহস্তে আমার মস্তকের দীর্ঘ জটা সকল উৎপাটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। গুরুভ্রাতা সকল দয়ার্দ্র হইয়া আমাকে মুণ্ডিত করাইয়া দিলেন; কিন্তু আমি শোকে অভিভূত হইয়া ভূমির উপর লুণ্ঠিত হইতে হইতে অনশনে কালযাপন করিতে লাগিলাম। কাহারও প্রবোধবাক্য আমার অন্তরে স্থান পাইল না; অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিতে করিতে আমার কাল অতীত হইতে লাগিল। অবশেষে সপ্তম দিবসে গুরুদেব প্রসন্ন হইয়া আমাকে দর্শন দিলেন এবং আমাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন "বৎস! তুমি

আর শোক করিও না, উত্থিত হও, তোমার মঙ্গল হইবে ; আমার মৃত্যু হয় নাই, তুমি শান্ত হও। আমার মৃত্যু নাই ইহা সত্য ; কিন্তু প্রয়োজন বশতঃ আমি আত্মগোপন করিয়াছি, মৃত্যুর ব্যাপার যে ইহাদিগকে প্রদর্শন করিয়াছি ইহা লীলা মাত্র। সময় সময় আমি তোমাকে দর্শন দিব। আমি অপরের অলক্ষিতভাবে এখন হইতে নর্ম্মদা তীরে বাস করিতেছি ও করিব। তুমি আর শোক করিও না, উত্থিত হইয়া সাধুমার্গে বিচরণ কর, তোমার সমস্ত কামনা সফল হইবে।” আমাকে এইরূপে প্রবোধিত করিয়া গুরুদেব অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার দর্শনলাভে এবং প্রবোধবাক্যে আমার চিত্ত শান্ত হইল ; আমি উত্থিত হইলাম এবং স্নান আহার করিলাম। জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা সকল যথাবিধানে গুরুদেবের ভাণ্ডারা করিয়া আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন। গুরুদেব সময় সময় আবির্ভূত হইয়া আমাকে দর্শনদান দ্বারা তাঁহার বাক্য সত্য করিতে লাগিলেন।

ইতি চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়

সিদ্ধিলাভ—ইষ্টদেব সাক্ষাৎকার

এই পর্য্যন্ত একপ্রকার ধারাবাহিকরূপে শ্রীশ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের জীবন বৃত্তান্ত তাঁহার কথা অনুসারে বর্ণিত হইল। তাঁহার গুরুদেব অপ্রকট হইবার পর তিনি কিরূপ সাধনাদি করিয়াছিলেন তাহা আমার নিকট কখনও বর্ণনা করেন নাই। আমিও জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করি নাই। এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে মানসসরোবর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত পদব্রজে পর্য্যটন করিয়া তিনি ভারতবর্ষের তীর্থ সমুদায় পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়াছেন। রেলের পথ তখন খোলা হয় নাই। অনেক সময়ে বৃহৎ অরণ্যের মধ্যে তাঁহাকে পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে। হিংস্রজন্তু সকল অনেক সময় তাঁহাকে দর্শন করিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে হিংসা করে নাই। একবার হিংস্রজন্তুসঙ্কুল এক অরণ্যের মধ্য দিয়া তিনি এবং অপর কয়েকটি সাধু যাইতেছিলেন, তখন তিনি স্বয়ং অন্য সকল সাধুর পশ্চাতে ছিলেন। সর্ব্বাগ্রে যে সাধুটি চলিতেছিলেন তিনি হিংস্র জন্তুর শব্দ শুনিয়া বলিলেন "আমি সর্ব্বাগে যাইতে পারিব না, আমার বড় ভয় হইতেছে।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন "আমি সর্ব্বাগ্রে যাইতেছি, তুমি ইচ্ছা করিলে পশ্চাতে আইস।" তখন সেই সাধুটি পশ্চাতে আসিলেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সর্ব্বাগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই এক বৃহৎকায় ব্যাঘ্র আসিয়া

সেই পশ্চাদ্দিকের সাধুটির উপর ঝাঁপ দিয়া পতিত হইল, এবং তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিল, কিন্তু অপর সকলে নির্ব্বিঘ্নে বন-পথ অতিক্রম করিয়া এক বস্তিতে উপনীত হইলেন।

ভারতের উত্তরখণ্ডে তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে একবার ভগবান্ সাধুর বেশে তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া উত্তরখণ্ডে তাঁহার সঙ্গে প্রায় একমাস বাস করিয়াছিলেন। তিনি কিছুমাত্র ভোজন বা পান করিতেন না। অবশেষে একদিন তাঁহাকে বলিলেন "চল আমার সঙ্গে বেড়াইয়া (সয়েল করিয়া) আসিবে।" তখন তিনি তাঁহার সঙ্গে গেলেন। দুই-জনে নদীর উপর এক পুলের উপর দিয়া যাইতেছিলেন ; যাইতে যাইতে সেই সাধুরূপী ভগবান আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন "দেখ, উদিকে কি ?" তিনি বলিলেন "উদিকে নির্ম্মল আকাশ।" তখন পুনরায় পুলের নিম্নস্থিত নদীজলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "দেখ উদিকে কি ?" তিনি বলিলেন "জল"। সেই সাধুরূপী ভগবান পুনরায় উপরে আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "এখন দেখ উপরে কি ?" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ উপর দিকে চাহিয়া দেখিলেন অতি ঘনীভূত কাল মেঘ আকাশমণ্ডল ছাইয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি সেই সাধুকে বলিলেন "এ এক ভোজবিদ্যা দেখিতেছি, ইহা এক-প্রকার বুজরুকী ভিন্ন কিছু নহে।" সেই সাধুটি কিছু না

বলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। পরে সেই সাধুরূপী ভগবান্ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে তাঁহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া পুল হইতে নদীতে নামিয়া পড়িলেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও তাঁহার সঙ্গে নদীতে নামিলেন। সেই স্থানে নদী অতি গভীর ছিল ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উভয়েই পদব্রজে চলিয়া নদী উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের কাহারও হাঁটুর উপর জল উঠিল না। পরে উভয়ে এইরূপে নিঃশব্দে নদী উত্তীর্ণ হইয়া এক জঙ্গল পথে গমন করিতে করিতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ দেখিলেন যে ঐ পথের উভয় পার্শ্বে কোন স্থানে শ্মশান জ্বলিতেছে, কোন স্থানে শবদেহ সকল পড়িয়া আছে, কোন স্থানে কাটামুণ্ড মাত্র রহিয়াছে। এইরূপ নানা-প্রকার ভীষণ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সেই সাধুরূপী ভগবান্‌কে আর দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি তাঁহার বহু অন্বেষণ করিলেন কিন্তু কোনস্থানে আর তাঁহার দর্শন পাইলেন না। ফিরিয়া আসিবার সময় দেখিলেন যে রাস্তার উভয় পার্শ্বে যে প্রজ্বলিত শ্মশান এবং মৃতদেহ প্রভৃতি দেখিয়াছিলেন তৎসমস্ত কিছুই নাই। সেই সকল স্থানে অরণ্যজাত নানাবিধ বৃক্ষলতা মাত্র রহিয়াছে। পরে বুঝিতে পারিলেন ভগবান্‌ই সাধুবেশে তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া গিয়াছেন।

আর একবার শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ হরিদ্বারের নিকটস্থ চণ্ডীর পাহাড়ের নিকটে এক পাহাড়ের উপরিভাগ হইতে আপথে

নামিতে গিয়া এক অতি নিভৃত স্থানে তিন শত বৎসরের এক সাধুর দর্শন পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে ফলমূলাদি খাইতে দিয়া খুব যত্ন করিয়াছিলেন, এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার সংবাদ দিতে বারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সে বারণ না মানিয়া হরিদ্বারে আসিয়া তাঁহার জমাতের অপর সকলের নিকট ঐ বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন এবং সেই সাধুদিগের কৌতূহল নিবারণার্থ তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় সেই স্থানে যান; কিন্তু এইবার তথায় গিয়া দেখেন যে সেই স্থানে সে সাধুও নাই তাঁহার গুফাও নাই। তখন বিফলমনোরথ হইয়া সকলে ফিরিয়া আসিলেন।

সিপাহী মিউটিনির সময় একদা আগ্রায় যমুনার কিনারে স্থিত এক রাস্তা দিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ চলিতেছিলেন, তখন যমুনায় গোরাদিগের জাহাজ ছিল। ঐ জাহাজ হইতে তাঁহাকে যমুনার কিনারায় দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক সাহেব বন্দুকের গুলি ছাড়িল; সেই গুলি তাঁহার গণ্ডদেশের এক পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। তখন সেই সাহেব পুনরায় এক গুলি ছাড়িল; সেই গুলি তাঁহার গণ্ডদেশের অপর পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। যখন পুনরায় গুলি করিবার নিমিত্ত ঐ সাহেব বন্দুক উত্তোলন করিল, তখন তিনি মনে মনে বলিলেন "এ তো ছোড়েগা নেই দেখ্‌তে হেঁ" এই বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সাহেবের বন্দুক তাহার হাত হইতে খসিয়া যমুনা-গর্ভে পতিত হইল। তখন সাহেবেরা সকলে অতি চমৎকৃত হইয়া দলে দলে অনেক মেমের সহিত একত্রে তাঁহার নিকট

আসিয়া মাথার টুপী খুলিয়া তাঁহাকে সেলাম করিতে লাগিল এবং তাঁহার প্রতি আর কোন অনিষ্ট আচরণ করিল না।

একদা একস্থানে এক গ্রামে থাকিয়া তিনি পঞ্চধুনী তাপিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রামের লোক সকল তাঁহাকে অতি শ্রদ্ধা, ভক্তি করিতে লাগিল। আর একটি সাধু তখন তাঁহার সঙ্গে ছিল, সে তাহাতে এতই ঈর্ষ্যান্বিত হইতে লাগিল যে সে তাঁহার বধ সঙ্কল্প করিয়া, তিনি একদিন ধুনী তাপিতে পঞ্চধুনী মধ্যে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যাননিমগ্ন হইলে, তাঁহার চারিদিকে প্রায় সহস্র কাণ্ডা এমনভাবে সাজাইয়া দিল যে সেই কাণ্ডার ঘেরা তাঁহার মস্তক হইতে উচ্চ হইয়া তাঁহাকে তন্মধ্যে একেবারে লুক্কাইত করিয়া ফেলিল। পরে সেই সাধুটি ঐ কাণ্ডার মধ্যে অগ্নিপ্রদান করিলে কাণ্ডা সকল অগ্নিতে এমন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল যে চারিদিকের কাণ্ডার অগ্নি একত্রে একটি মাত্র শিখায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেই সাধুটি তখন সেই স্থান ছাড়িয়া পলায়ন করিয়া গেল। পরে গ্রামিক লোক সকল সেই স্থানে আগমন করিয়া এই অগ্নিশিখা দর্শন করিয়া ভাবিল যে ঐ অগ্নি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে অবশ্য দগ্ধীভূত করিয়াছে। পরে যথাসময়ে কাণ্ডা সকল জ্বলিয়া শেষ হইলে, শিখা নির্ব্বাপিত হইল এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজেরও ধ্যান ভঙ্গ হইল। তাঁহার শরীরের উপর অগ্নিদেব কিছুমাত্র কার্য্য করিলেন না। ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি ঐ কাণ্ডা-ভস্মরাশির মধ্যভাগ হইতে বহির্গত হইলেন। গ্রামবাসী লোক সকল তাহা দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইল, এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ

দিল। তখন তিনি গ্রামের সর্দ্দারকে বলিলেন "এখন হইতে আমি প্রতিদিন এক হাজার কাণ্ডার ভিতরে বসিয়া ধুনী জ্বালিব। তোমাকে এই পরিমাণ কাণ্ডা প্রতিদিন যোগাইতে হইবে।" সর্দ্দার বলিল "মহারাজ, এত কাণ্ডা প্রতিদিন আমি কিরূপে যোগাইব?" তিনি বলিলেন "তোমরা অদ্য কিরূপে এত কাণ্ডা দিয়াছিলে? আমাকে কি ভস্মীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে? দেখ, আমি এত কাণ্ডার মধ্যে অখণ্ড আছি। অগ্নিদেব কৃপা করিয়া আমার এক গাছি রোমও বিনষ্ট করেন নাই।" সর্দ্দার বলিল "মহারাজ, আপনার সঙ্গের সেই সাধুটি এই কাণ্ডা আমাদের নিকট হইতে আনিয়াছে। এক সঙ্গে যে এই সমস্ত কাণ্ডা সাজাইয়া দিবে তাহা আমরা কখনও জানি না, অন্যান্য দিনের ন্যায় অল্প কাণ্ডাই দিবে মনে করিয়াছিলাম। সেই সাধুটি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া আপনার মৃত্যুসাধন করিবার নিমিত্ত এইরূপ করিয়াছে, নতুবা সে এখান হইতে তাহার জিনিষ পত্র লইয়া এখন পলায়ন করিয়াছে কেন? তাহাকে ও তাহার জিনিষ পত্র এখন এখানে দেখিতেছি না কেন? আপনি আদেশ করুন, এখনি অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিয়া আমরা তাহার উপযুক্ত দণ্ডবিধান করি। তখন তিনি বলিলেন "না তোমাদের কিছু করিতে হইবে না। সে অন্যায় করিয়া থাকিলে আপনা হইতেই দণ্ড পাইবে।" এই ঘটনার দিন দুই পরে পুলিশ তাহাকে অন্য এক অভিযোগে

ধৃত করিয়া আনিল এবং ছয় মাসের জন্য তাহার কারাবাস আদেশ হইল। *

গ্রীষ্মকালে যেমন পঞ্চধুনী তাপিতেন শীতকালে তেমনি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ জলশয্যায় অবস্থিতি করিতেন। ভোর রাত্রিতে জলে যাইয়া যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যাননিমগ্ন হইতেন; বেলা প্রায় ছয় দণ্ডের সময় তাঁহার সেবক সাধুগণ জল হইতে তাঁহাকে উঠাইয়া আনিতেন এবং তাঁহার শরীরে অগ্নির উত্তাপ লাগাইতে লাগাইতে তাঁহার বাহ্য চেতনা হইত।

এইরূপে তিনি নানাবিধ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। অবশেষে ব্রজধামে আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তথায় নিয়ত বাস করিতে থাকেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে সকল স্থান অপেক্ষা ব্রজমণ্ডলই তাঁহার নিকট অধিক প্রিয় বোধ হইয়াছিল এবং সাধুদিগের বাসোপযোগী এইরূপ অন্য কোনও স্থান তাঁহার লক্ষিত হয় নাই। তিনি আরও বলিয়াছিলেন "যে 'উত্তরাখণ্ড' ও তপস্যার নিমিত্ত উপযুক্ত স্থান সত্য, কিন্তু সেখানে কন্দমূলের উপর আহারার্থ নির্ভর করিতে হয় এবং বর্ষার সময় কোন্ স্থানে কন্দ অঙ্কুরিত হইয়াছে তাহা খুঁজিয়া দেখিয়া রাখিতে হয়। এইরূপ

* অগ্নি শরীরকে কেন দাহ করিল না এই কথা আমি জিজ্ঞাসা করাতে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ বলিলেন, "ধুনী তাপিতে বসিয়া প্রথমে অগ্নি হইতে শরীর যাহাতে রক্ষা পায় সেই আত্মরক্ষার মন্ত্রের দ্বারা অগ্নির উত্তাপ থামাইতে হয়। যাহাদের দেহ অগ্নি দ্বারা ক্লিষ্ট হয় তাহারা "কুযোগী", মন্ত্রবিৎ নহে জানিবে।"

আহারের চেষ্টা সেখানেও আছে। আমি ভাবিলাম ব্রজধামই ইহা অপেক্ষা ভাল। সেখানে আহারের নিমিত্ত এইরূপ সঞ্চয়ের চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। সাধুর উপযুক্ত সুন্দর সুন্দর আহার্য্য বস্তু সকলসময়েই তথায় সুলভ অতএব আমি ব্রজেই থাকিব মনস্থ করিলাম।”

ভরতপুরে সয়লানিরকুণ্ড নামক একটি কুণ্ড আছে। ব্রজধামে আসিয়া স্থায়ীরূপে বাস করিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ঐ কুণ্ডের নিকটস্থ একটি স্থানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি যে সেইস্থানে তিনি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং পূর্ণরূপে সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার একটি গাথা আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল :—

“রামদাস কো রাম মিলা সয়লানিকি কুণ্ডা।
শান্তন ত সচ্চিমানে ঝুঁটমানে গুণ্ডা।”

ভরতপুরে তিনি প্রথমে চেলা করিতে আরম্ভ করেন। তথাকার অতি সদ্বংশজ এবং অতি নিষ্ঠাবান্ একজন ব্রাহ্মণ সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার পুত্রকে আনিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের চেলা করিয়া দেন। তিনি গরীবদাস নামে আখ্যাত ও প্রসিদ্ধ হয়েন। তিনি বালককাল হইতে দেহান্ত পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গে থাকিয়া অতি যত্ন ও নিষ্ঠার সহিত তাঁহার সেবা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র এমন নির্ম্মল এবং তিনি এইরূপ ত্যাগী অথচ প্রেমিক পুরুষ ছিলেন

যে সাধু মাত্রেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইতেন, এবং তাঁহার বিনম্র স্বভাব, ধৈর্য্যগুণ, গুরুর কার্য্যে সর্ব্বপ্রকার কষ্টসহিষ্ণুতা এবং সকলের প্রতি দয়া প্রভৃতি গুণের একবাক্যে প্রশংসা করিতেন। তাঁহার চেহারাই এমন প্রশান্ত ছিল, যে তাঁহাকে আমি প্রথম দেখিয়াই মনে করিয়াছিলাম যে তিনি একজন অসাধারণ পুরুষ, যেন শান্তির সমুদ্র বিশেষ। তাঁহাকে দেখিলেই যেন চিত্ত প্রশান্ত হইত।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের দ্বিতীয় চেলা শ্রীযুক্ত ভগবান্‌দাস নামে আখ্যাত হয়েন। তিনি কিছুদিন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সেবা করিয়াছিলেন এবং অবশেষে সাধন ভজন করিয়া বোম্বাইয়ের অতি নিকটবর্ত্তী একস্থানে মহন্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেন। তিনিও এক্ষণে গত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের তৃতীয় চেলার নাম শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাসজী। তিনি অতিশয় সুপণ্ডিত লোক ছিলেন এবং তীব্র বৈরাগ্য হেতু পরমহংসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভারতের উত্তরখণ্ডে চলিয়া যান। তাঁহার সংবাদ আর পাওয়া যায় নাই।

ভরতপুরের অপর একজন নিষ্ঠাবান্ তপস্বী ব্রাহ্মণের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের চতুর্থ চেলা। তাঁহার নাম নরোত্তম-দাসজী। ইনি একদা এক কূয়া হইতে জল উঠাইতে গিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের কমণ্ডলু কূয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে তাড়নার ভয়ে তিনি পলায়ন করিয়া যান এবং পরে নিজে সাধন ভজন করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক সাধু থাকিত এবং বৃহৎ জমাৎ সঙ্গে লইয়া

তিনি সর্ব্বদা বিচরণ করিতেন এবং মহন্তোচিত সম্মান সর্ব্বদা প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহারও দেহান্ত হইয়াছে। নরোত্তম-দাসজীকে আমি একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "আপনি আপনার বালককালে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে কোন সাধন করিতে দেখিয়াছেন কি?" তিনি বলিলেন, "তখন তিনি সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার সাধন অবস্থা আমি দেখি নাই। আমি তাঁহার নিকট বাল্যকালে থাকিবার সময় কেবল একটি ক্রিয়া তিনি কখন কখন করিতেন দেখিয়াছি। মাসে একবার কি দুইবার কোনদিন গরীবদাসজীকে, কোন দিন আমাকে সঙ্গে লইয়া একটি বৃহৎ গ্লাস লইয়া কোন না কোন জঙ্গলে যাইয়া ঐ গ্লাস উত্তম জলে পূর্ণ করিয়া আনিতে আমাদিগকে বলিতেন। ঐ গ্লাসে প্রায় আধ সের জল ধরিত। ঐ জল তিনি লিঙ্গের দ্বারা টানিয়া শুষিয়া লইতেন এবং খানিকক্ষণ পরে প্রস্রাবের ন্যায় পুনরায় তাহা গ্লাসে নিক্ষেপ করিতেন। তাঁহার পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুসারে আমরা যেমন আরতির সময় বাতি দেওয়া যায়, তদ্রূপ বাতি প্রস্তুত করিয়া লইয়া যাইতাম; তিনি প্রস্রাবের ন্যায় পূর্ব্ব প্রকারে গ্লাসে জল নিক্ষেপ করিয়া বলিতেন "ঐ বাতি জ্বালাইয়া ঐ জলে ধারণ করিয়া দেখ ইহা অবাধে জ্বলিতে থাকে কিনা।" আমরা তদ্রূপই করিতাম, এবং দেখিতাম যে এক গ্লাস ঘৃতের মধ্যে বাতি রাখিলে যেমন তাহা নিঃশব্দে জ্বলিতে থাকে, তাঁহার লিঙ্গ-নির্মুক্ত ঐ জলেও ঐ বাতি তদ্রূপই নিঃশব্দে স্থিরভাবে জ্বলিতে থাকিত। বাতি ঐরূপ জ্বলিতেছে দেখিয়া তিনি পুনরায়

আসনে প্রত্যাগত হইতেন। এই একটি মাত্র ক্রিয়া আমি তাঁহার দেখিয়াছি। তদ্ভিন্ন অপর কোন ক্রিয়া আমি দেখি নাই।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের প্রথম চারিজন চেলার নাম বলিয়াছি। তৎপরে বহু চেলা (অধিকাংশ বাঙ্গালী চেলা) হইয়াছে। তাঁহারা এক্ষণে প্রায় সকলেই জীবিত আছেন; সুতরাং তাঁহাদের বিশেষ উল্লেখ এইস্থানে নিষ্প্রয়োজন। একজন বৃন্দাবনবাসী খ্যাতনামা চোরকেও তিনি পরে চেলা করিয়াছিলেন, কেবল তাহার কথা এবং আমার নিজের বিষয় পরে বিশেষরূপে উল্লেখ করা যাইবে।

তিনি একদা ভ্রমণ করিতে করিতে হাত্‌রাস গিয়াছিলেন; তথাকার অতি ধনাঢ্য জমিদার অপুত্রক ছিলেন। তিনি অতি যত্নের সহিত তাঁহার সেবা করেন এবং অবশেষে এই নিবেদন করেন যে "মহারাজ, আমার পুত্র সন্তান হয় না। আপনি আমার প্রতি এইরূপ কৃপা করুন যাহাতে আমার পুত্র সন্তান হয়।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন "আচ্ছা, তুমি বৃন্দাবনে আমার জন্য এক ঠাকুর মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিবে প্রতিজ্ঞা কর; তোমার পুত্র জন্মিবে।" তখন সেই ধনী ব্যক্তি বলিলেন "আমার পুত্র জন্মিলে আমি অবশ্য বৃন্দাবনে মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিব।" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন "অদ্যাবধি বৎসরদিনের মধ্যে তোমার পুত্র হইবে, কিন্তু দেখিও যদি পরে মন্দির প্রস্তুত করিয়া না দেও ত তোমার পুত্র থাকিবে না। আমি এক বৎসর পরে তোমার এখানে আসিব।" তৎপরেই সেই ধনী

ব্যক্তির স্ত্রী গর্ভধারণ করিলেন এবং নিয়মিত সময়ে একটি পুত্র প্রসব করিলেন। বৎসরান্তে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সেই জমিদারের নিকটে পুনরায় উপস্থিত হইলে, সে তাঁহাকে সৎকার করিল এবং পুত্র জন্মিয়াছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল সত্য, কিন্তু বৃন্দাবনে মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিতে সম্মত হইল না; বলিল, আমার এই বৃহৎ বাগান বাড়ী আছে, আমি এই স্থানে মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিব। আপনি এইখানেই অবস্থান করুন।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "তুমি বৃন্দাবনে মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, এক্ষণে পুত্রলাভে অহঙ্কৃত হইয়া সেই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে, অতএব অদ্যাবধি তৃতীয় দিবসে তোমার এই পুত্রের মৃত্যু হইবে।" এই বলিয়া সেই ধনী ব্যক্তির গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অনতিদূরে স্বীয় আসন স্থাপন করিলেন। বস্তুতঃ তৃতীয় দিবসেই সেই ধনীর পুত্রের মৃত্যু ঘটিল। তখন তাহার স্ত্রী অতিশয় আর্ত্তা হইয়া রোদন করিতে করিতে অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আসন সমীপে উপস্থিত হইল, এবং চরণপ্রান্তে ধরণীতে লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল "মহারাজ, আমার স্বামীর অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি নিঃসন্তান ছিলাম, আপনি কৃপা করিয়া সন্তান দিয়াছিলেন; আমার স্বামীর কুমতি হেতু আপনাকে অবজ্ঞা করিয়াছে, তাহাতেই আমার সন্তান বিনষ্ট হইয়াছে; কিন্তু আমি নিরপরাধা, আমার প্রতি আপনি কৃপা করুন। আমাকে যাহা আদেশ করিবেন তাহাই

করিব।” এইরূপে আর্ত্তনাদ করিতে থাকিলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন “আচ্ছা, তোমার এক পুত্র মরিয়াছে, আমার বাক্যে পুনরায় তোমার দুই পুত্র হইবে এবং বাঁচিয়া থাকিবে। আমি তোমাদের নিকট কিছু চাই না। কিন্তু সাধুর নিকট দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনরায় সেই প্রতিজ্ঞা তোমরা ভঙ্গ করিও না।”

অতঃপর শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বৃন্দাবনে আসিয়া প্রথমে কেমারবনে দাবানল কুণ্ডের উপরিস্থ আখড়ায় কিয়ৎদিবস বাস করিয়াছিলেন; অনেক সাধু তখন ঐ স্থানে বাস করিতেন। তিনি সেখানে থাকিয়া বড় বড় ডেগ সকল মাজিতেন, তিন মণ চারি মণ কাষ্ঠ বন হইতে কাটিয়া মাথায় করিয়া আনিয়া সাধুদিগের সেবার নিমিত্ত দিতেন। এইরূপে কিছুদিন সেখানে থাকিয়া পরে যমুনাতীরে শ্রীগঙ্গাজীর কুঞ্জের গলির সম্মুখে যে ঘাট আছে সেই ঘাটের উপর এক বৃক্ষতলে আসন স্থাপন করিয়া সেইখানেই বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত গরীবদাসজী তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত রহিলেন।

ঐ ঘাটে বহু স্ত্রীলোক ও পুরুষ নিত্য আসিয়া স্নান করিত। কোন কোন ব্রজবাসী মনে করিল এই ঘাটে অনেক স্ত্রীলোক সর্ব্বদাই আসিয়া থাকে, এই সাধু এইখানে বসিয়া থাকেন, ইঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত ইনি কেমন সাধু। এই সঙ্কল্প করিয়া একদিন গভীর অন্ধকার রজনীর মধ্য রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে একজন যুবতী স্ত্রীলোককে

তাহারা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আপন আসনে শয়ান আছেন, এমন সময়ে সেই স্ত্রীলোকটি নিঃশব্দে পদচালনা করিয়া তাঁহার আসনে গিয়া তদুপরি তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। শ্রীযুক্ত গরীবদাসজী প্রায় ২০ হাত দূরে স্বীয় আসনে তখন শয়ন করিতেছিলেন। ঐ স্ত্রীলোকটি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে ঐরূপ জড়াইয়া ধরিলে, তিনি গরীবদাসজীকে ডাকিয়া বলিলেন "গরীবদাস্! হিঁয়া আয়, দিবা জাগাকের দেখ্, হমরা আসনপর কোন্ আয় গিয়া।" তখন গরীবদাসজী উঠিয়া প্রদীপ জ্বালাইলেন, এবং ঐ স্ত্রীলোককে তখন আসনের উপর দেখিতে পাইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন "তুমি কে, এমন সময়ে তুমি আমার আসনে কি নিমিত্ত আসিয়াছ?" স্ত্রীলোকটি বলিল "মহারাজ, আমি বড় কামান্ধা হইয়াছি, এই নিমিত্ত তোমার নিকট আসিয়াছি, আমি একজন বিধবা, আমার কেহ নাই।" তিনি বলিলেন "তেরা কাম হওয়া তো কোই গৃহস্থিকো পাস্ চলা যা, হিঁয়া গৃহস্থি বহোত হ্যায়।" স্ত্রীলোক বলিল "মহারাজ! তোমরা উপর হমরা মন বহোত চলা, তুম্‌কো যব্‌সে হম দেখা, তব্‌সে তোমারি উপর হমারা মন চল্‌নে লাগা; তুমহি হমারি উপর কৃপা করো।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "গরীবদাস! তু হিঁয়াসে জেরা হট্ যা, হম্ এই রাঁড়কো সাধুকা কেরামত কুচ্ছ দেখায় দেয়েঙ্গে, ইয়ে সাধুকা সত্ব

খিঁচ লেনে মাংতা হ্যায়, ইস্‌কো দেখায় দেয়েঙ্গে সাধুকা সাত্ রমণ কেয়সা হোতা হ্যায় ; এক ঘণ্টা ভরকা বিচমে ইস্‌কে জান হম্ খিঁচ লেয়েঙ্গে, যব ইস্‌কো মালুম পড়েগা সাধুকা সামর্থ কেয়সা হোতা হ্যায়।" এই বলিয়া ঐ স্ত্রীলোককে বলিলেন "আব্ আয় যা তু হমারা পাস।" তখন স্ত্রীলোকটা অতিশয় ভীতা হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "মহারাজ ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার কোন দোষ নাই, ব্রজ-বাসিগণ তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছে, তাহাতেই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর।" তখন তিনি বলিলেন "আচ্ছা চলা যা, ঔর সাধুকা পাশ ইসমাফিক কবহি নহি যানা, সব সাধু বরাব্বর নহি হোতা হ্যায়, কোই যোগীরাজ বি হেয়।"

অপর এক দিবস সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একক ঐ ঘাটের উপর আসনে বসিয়া আছেন, এমন সময় অতি রূপ-যৌবনসম্পন্না দুইটি পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিল, এবং কিছু ভেট তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিয়া তাঁহার সমক্ষে বসিয়া হাবভাব ভঙ্গীযুক্ত হইয়া কথোপকথন করিতে লাগিল ; কিছুক্ষণ এইরূপে নানা কথা প্রসঙ্গে কাটাইয়া, অবশেষে হাসিতে হাসিতে একজন হঠাৎ তাঁহার...ধারণ করিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। তখন তিনি বলিলেন "লে শালী ...পাকড় লিয়া !! ইস্‌মে কেয়া হেয়, হম ত কুচ্চ নহি দেখতে হেঁ ; তেরা যেত্না মর্জি হোয় তু ইস্‌কো আচ্ছি

তরেছে দেখ্‌লে !” তখন সেই দুইটি স্ত্রীলোকেই তাঁহার... ধরিয়া নানা প্রকার টানাটানি করিয়া দেখিল, কিন্তু...কোন প্রকারে খাড়া হইল না, তাহারা তখন অপ্রস্তুত হইয়া তথা হইঁতে চলিয়া গেল।

ইহার পরদিবস বৃন্দাবনের গৌতম ব্রাহ্মণ ছন্নু সিং (যিনি বড় পালওয়ান ছিলেন, এবং সর্ব্বদাই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট আসিয়া গাঞ্জা খাইতেন এবং নানারূপ গল্প সল্প করিতেন তিনি) আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট বসিয়া গল্প সল্প করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও অতি বলবান্ পুরুষ ছিলেন এবং ব্রজবাসিদের সহিত সখ্য ভাব পোষণ করিতেন, সুতরাং তাহাদের সহিত তিনি সমানভাবে মিশিয়া বয়স্যের ন্যায় ঠাট্টা চাতুরী প্রভৃতি করিতেন। ছন্নু সিং সেই দিন কথা কহিতে কহিতে বলিল, “বাবাজি, তোমার পালওয়ানী ও তাকত জানা গিয়াছে, তুমি পুরুষত্ববিহীন “না-মরদ,” তোমার আবার পালওয়ানী কি ?” তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পূর্ব্বদিনের ঘটনা স্মরণ করিয়া তাহার বাক্যের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন “হাঁরে তুই আমাকে “না-মরদ” ঠাওরাইলি কিসে ; দেখে লে তোর...হইতেও আমার ......কড়া, তোর......কখন এমন··· হইবে না।” এই বলিয়া তখনই বৃহৎ···খুলিয়া তাহা লোহের শিকের মতন কড়া করিয়া দেখাইলেন। তখন ছন্নু সিংহের ভ্রম দূর হইল, এবং তিনি দণ্ডবৎ করিয়া বলিলেন “বাবাজি ! তুমি যথার্থ কামজিৎ পুরুষ; যুবতী স্ত্রীলোকেরা তোমার...করিতে পারিল না দেখিয়া

আমরা মনে করিয়াছিলাম তুমি পুরুষত্বহীন ; কিন্তু অদ্য তোমার প্রভাবের পরিচয় পাইলাম ; তুমি সাক্ষাৎ মহেশ্বর।”

এক দিবস শ্রীযুক্ত ছন্নু সিং ব্রজবাসী শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় শ্রীবৃন্দাবনের একজন বিখ্যাত চোর তাঁহাদের নিকট আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দণ্ডবৎ করিয়া, গাঁজা খাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট বসিল, এই ব্যক্তির নাম গোসাঞা, ব্রাহ্মণকুলে শ্রীবৃন্দাবনে ইহার জন্ম ; এই ব্যক্তি ডাকাতদিগের দলের সর্দ্দার ছিল, এবং নানাবিধ দুঃসাহসিক কর্ম্মসকল সর্ব্বদা করিয়া বেড়াইত। তাহাকে কেহ ধৃত করিতে পারিত না ; অবশেষে গোরা পল্টন লইয়া, এক বনের মধ্যে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া এক সাহেব তাহাকে ধৃত করে ; এবং সে চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়া দ্বীপান্তরে প্রেরিত হয়। এই চতুর্দ্দশ বৎসর কারাবাস ভোগ করিয়া, সে বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসে। কিন্তু চতুর্দ্দশ বৎসর কারাবাস করাতেও তাহার চরিত্রের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তাহার অত্যাচারে সকল লোকই ভীত হইয়া থাকিত। এই ব্যক্তি পূর্ব্বো-লিখিতরূপে গাঁজা খাইবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট আসিয়া বসিলে, শ্রীযুক্ত ছন্নু সিং তাঁহাকে বলিলেন, “বাবাজী মহারাজ! আপনি এই চোরকে সংশোধন করিয়া দিন্। এই চোর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ইহার মত পাষণ্ড ব্যক্তি শ্রীবৃন্দাবনে নাই। ইহার অত্যাচারে পল্লীর সকল লোকই সর্ব্বদা ত্রাসযুক্ত থাকে। চতুর্দ্দশ বর্ষকাল এই

ব্যক্তি কারাবাস করিয়া আসিয়াছে, তথাপি ইহার কিছুমাত্র শিক্ষা হয় নাই। আপনি মহাত্মা, সিদ্ধপুরুষ; ইহার অত্যাচার হইতে পল্লীবাসীকে মুক্ত করুন।" এই কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ গোসাঞাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "কেমন গোসাঞা, তুমি সাধু হইবে? তোমার চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া আমার চেলা হইবে?" তাঁহার এই কথাগুলি গোসাঞার হৃদয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিল। গোসাঞা কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া অতি আর্ত্তস্বরে বলিল, "মহারাজ! আমি এত কুকার্য্য সকল করিয়াছি যে লোকে তাহা করিতে পারে না, তথাপি কি তুমি আমাকে চেলা করিবে?" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমি তোমাকে চেলা করিব; তুমি এক্ষণেই বাজারে গিয়া একগাছি তুলসীর কণ্ঠী লইয়া আইস, আমি তোমার গলায় কণ্ঠী বাঁধিয়া দিয়া অদ্যই তোমাকে চেলা করিব।" গোসাঞা তখনই বাজারে যাইয়া কণ্ঠী লইয়া আসিল, এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শঙ্খবাদন করিয়া তাহার গলায় তুলসীর কণ্ঠী বাঁধিয়া, তাহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। সেই অবধি গোসাঞার চেহারা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তাহার চৌর্য্যবৃত্তি ও লোকের প্রতি অত্যাচারের স্পৃহা দূরীভূত হইল, এবং সে একজন অতি প্রেমিক প্রকৃতির দয়ার্দ্রচিত্ত সাধুরূপে পরিণত হইল। গোসাঞা যমুনার তটস্থ শ্রীবৃন্দাবনের এক নিভৃত বাগানে নিয়ত বাসস্থান স্থাপন করিল। তথায় থাকিয়া সাধারণতঃ সমস্ত দিন সে ভজন করিত; সন্ধ্যার পর একবার সহরে

গিয়া, কোন দোকানের নিকট উপস্থিত হইত। দোকানীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, পূর্ব্বের ভীতির নিমিত্তই হউক অথবা অন্য কারণেই হউক তাহার আহারের নিমিত্ত দুধ, পুরী, প্রভৃতি প্রতিদিন যোগাইত। কখনও সাধুদিগের "জমাতে" গেলে, আমোদ করিবার নিমিত্তই হউক, অথবা তাহার পূর্ব্ব প্রবৃত্তি-বশতঃই হউক, সে একজনের ঘটা অপরের নিকট, এবং অপরের ঘটা অপরের নিকট নির্জ্জনে লইয়া রাখিয়া দিত। সকলেই জানিত যে গোসাঞারই এই সকল কার্য্য; এবং তন্নিমিত্ত "চোর গোসাঞা" বলিয়া তাহাকে ঠাট্টা করিত। গোসাঞা হাসিয়া হাসিয়া আপনার পূর্ব্বচৌর্য্যবৃত্তির এবং চতুর্দ্দশবৎসর কারাবাস-বিষয়ক সুদীর্ঘ স্বরচিত গীত গান করিয়া সকলকে আমোদিত করিত। এইরূপে মহাপাষণ্ড চোর, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের প্রসাদে প্রেমিক সাধুরূপে পরিণত হয়।

শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া গঙ্গাজীর কুঞ্জে বাস

ঐ ঘাটের উপরে গাছতলায়ই লোক সকল আপনা হইতে আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু যোগাইত। দুই টাকা তিন টাকা মূল্যের গাঁজা ও চরস নিত্য তাঁহার আসিত এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীও এইরূপেই জুটিত। এই সকল বৈভব দেখিয়া চোরেরা মনে করিতে লাগিল যে বাবাজীর অনেক টাকা সঞ্চিত আছে, সেই নিমিত্ত সময় সময় তাহারা তথায় রাত্রে আসিয়া তাঁহার উপদ্রব জন্মাইত। যাহারা রাত্রে চুরি করিত তাহারাই আবার দিনের বেলায় ভদ্রলোক

সাজিয়া বেড়াইত। চোরদিগের মধ্যে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বা অন্য জাতীয় লোক ছিল। তাহারাও অনেকে দিনের বেলায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আসনের নিকটে আসিয়া বসিত, তামাক, গাঁজা খাইত এবং গল্প সল্প করিয়া যাইত। একদিন তিনজন এইরূপ ভদ্রবংশীয় বৃন্দাবনবাসী চোর প্রাতে তাঁহার নিকট বসিয়া গল্প সল্প করিতে করিতে কথা-প্রসঙ্গে উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে বলিল "বাবাজী এমন সেরের মত ভয়-শূন্য হইয়া কথা কও, একদিন রাত্রে ভালরূপে তাহার প্রতিফল পাইবে।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন "তোমরা যে চোর বদ্‌মায়েস তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। কিন্তু তোমরা এতই বদ্‌মায়েস যে সাধুকে পর্য্যন্ত ধমকাইতে আরম্ভ করিয়াছ। আচ্ছা, আমি বলিতেছি, আজই তোমরা পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইবে।" চোরেরা বলিল "আরে, রয়নেদে বাবাজী তেরা সিদ্ধাই; হাম্‌লোগো কো পাকড়েনেওয়ালা কোই নেই।" এই বলিয়া অবজ্ঞা পূর্ব্বক চলিয়া গেল। কিন্তু ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই এক চুরির অভিযোগে পুলিশ আসিয়া ইহাদের তিনজনকেই গ্রেপ্তার করিয়া সেই দিবসেই আদালতে লইয়া গেল। তাহারা তিনজনেই জামিন দিয়া খালাস হইয়া আসিল, এবং মোকদ্দমার অন্য তারিখ পড়িল। আদালত হইতে খালাস হইয়া এই তিন জনের মধ্যে দুইজন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হাত যোড় করিয়া চরণে পতিত হইয়া বলিল "মহারাজ, আমরা তোমার সন্তান-সদৃশ, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের

অপরাধ ক্ষমা কর। আমাদিগকে পুলিশে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে লইয়া গিয়াছিল, আমরা জামিন দিয়া খালাস হইয়া আসিয়াছি। তুমি কৃপা না করিলে আমরা অব্যাহতি পাইব না। তুমি আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, আমরা আর কখনও এইরূপ করিব না।” তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, “তোমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া বল যে আর কখনও সাধুদিগের উদ্বেগ জন্মাইবে না এবং চুরি করিবে না।” তাহারা বলিল, “না, কখনই করিব না।” তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, “আচ্ছা যাও, তোমরা দু’জন খালাস পাইবে।” তৎপর তাহারা দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া গেল। পরে মোকদ্দমার তারিখে তাহারা দুইজন খালাস পাইল এবং তৃতীয় ব্যক্তির চারি মাসের কারাদণ্ড হইল। সে আপীল করিল, কিন্তু আপীল অগ্রাহ্য হইল। তাহাকে লোহার বেড়ী পরাইয়া মথুরা হইতে বৃন্দাবন যে সড়ক আসিয়াছে সেই সড়ক মেরামত করাইবার নিমিত্ত মাটিকাটার কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল।

পরে একদিন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ মথুরার ঐ সড়ক দিয়া মথুরা হইতে বৃন্দাবন আসিতেছেন, এমন সময় রাস্তায় সেই চোর ব্রাহ্মণটি মাটিকাটার কাজ করিতেছে দেখিতে পাইলেন। সেও তাঁহাকে দর্শন করিয়া সড়কের উপরে তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিল, এবং কাঁদিয়া তাঁহাকে বলিল “মহারাজ, আমি এইবার নির্দ্দোষী ছিলাম, তথাপি তোমার অভিসম্পাতেই আমি এইরূপ কষ্টে পতিত হইয়াছি। আমরা ব্রজবাসী, তোমার বালক সদৃশ,

অবোধ। আমাকে কি এইরূপ কঠিন দণ্ড করা তোমার উচিত হইয়াছে?" তাহার কষ্ট দেখিয়া এবং তাহার কাতর উক্তিতে তিনি দয়ার্দ্র হইলেন এবং বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি আর কখনও সাধুদিগের পীড়া জন্মাইও না। অদ্যাবধি তৃতীয় দিবসে তুমি কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবে।" সে বলিল, "মহারাজ, ইহা কিরূপে সম্ভব? আমার আপীল পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য হইয়াছে।" তিনি বলিলেন "আরে, শান্তন কি বচনমে অব্ ভি তেরা বিশ্বাস নহি হোতা হায়? হামারা বচন কব্ হি ঝুঁট হোগা নহি।" ইহা শুনিয়া সে আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিল। তিনি চলিয়া আসিলেন। তৎপর তৃতীয় দিবসে সরকার হইতে হুকুম আসিল যে প্রত্যেক জেল হইতে তিনজন কয়েদী মুক্ত করিয়া দিবে। সেই হুকুম অনুসারে ঐ ব্যক্তিও মুক্তিলাভ করিল, এবং বৃন্দাবনে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট আসিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

শ্রীবৃন্দাবনে একবার কুম্ভের মেলা উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সমবেত সাধুগণ কর্ত্তৃক ব্রজধামের মহন্ত পদে অভিষিক্ত হইলেন। সাধু সকল অনেকেই গাঁজা ও চরসের ধূম পান করিয়া থাকেন, ব্রজবাসীও অনেকে গাঁজা ও চরস খান। একজন গৌতম ব্রজবাসী সাধুদিগের বল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত দাউজি হইতে এক বৃহৎ চিলম প্রস্তুত করাইয়া আনিয়া সেই চিলমে সওয়া সের চরস একসঙ্গে সাজিল। চরস সাজিবার নিয়ম এই যে প্রথমে কলিকার মধ্যে তামাক সাজিতে হয়, সেই

সাজা তামাকের মধ্যস্থানে চরসের গোলা রাখিতে হয়, তাহার উপরে পুনরায় তামাক এক স্তর রাখিতে হয়, তদুপরি জ্বলন্ত কয়লার গুঁড়া রাখিয়া সেই চিলম মুখে টানিয়া তাহার ধূমপান করিতে হয়। খুব জোরের সহিত টানিলে ঐ প্রথম স্তরের তামাক জ্বলিয়া চরসে খুব অগ্নির তাপ লাগে এবং তখন চরস ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। তখন চিলমের উপর প্রজ্বলিত শিখা দৃষ্ট হয়। ইহাকেই চরস উড়ান বলে। সওয়া সের চরসের গোলা এক সঙ্গে এক কলিকায় সাজিতে হইলে অন্ততঃ সওয়া সের তামাক (গুড় মাখান কাটা তামক) লাগে। এইরূপে সওয়াসের চরস এক বৃহৎ চিলমে সাজিয়া এক লোহার শিকল দিয়া বাঁধিয়া তাহা এক গাছের ডালে সেই ব্রজবাসী ঝুলাইয়া দিল, এবং সকলকে আহ্বান করিয়া বলিল, "যাহার সামর্থ্য থাকে সে আসিয়া এই চরস চিলম উড়াও।" অনেক লোক চেষ্টা করিল কিন্তু কেহই ঐ চিলম হইতে ধূম পর্য্যন্ত বাহির করিতে সমর্থ হইল না। পরে অনেক সাধু একত্র হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট গিয়া বলিল "মহারাজ! এক ব্রজবাসী সওয়া সের সুল্‌ফা (চরস) এক চিলমে ভরিয়া বলিতেছে কোন সাধুর সামর্থ্য হইলে ইহা উড়াও। আমরা সকলেই চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কেহ ইহার ধূম পর্য্যন্ত বাহির করিতে পারিলাম না। আপনি যদি আসিয়া সাধুদিগের নাম রক্ষা করেন তবেই মান থাকে।" তিনি বলিলেন "আচ্ছা, আমি যাইতেছি।" তখন গরীবদাসজীকে সঙ্গে করিয়া যে স্থানে চিলম ঝুলিতেছিল সেই স্থানে গিয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা

গরীব দাস, তুমি প্রথমে ইহার ধূম বাহির কর।” তখন গরীবদাসজী প্রথমে খুব জোরের সহিত চিলম টানিলেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ ধূম নির্গত হইল, কিন্তু চিলম “উড়িল” না। তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ নিজেই গিয়া এমন বেগে চিলম আকর্ষণ করিলেন যে সমস্ত চরস একেবারে ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহার শিখা গাছের উপর পর্য্যন্ত চড়িয়া গেল। তখন সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং ঐ ব্রজবাসীও প্রসন্ন হইয়া ভেট দ্বারা তাঁহার পূজা করিল।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ধূমপান শক্তির বিষয়ে আর একটি কীর্ত্তি বর্ণনা করিতেছি। একবার শ্রীযুক্ত গরীবদাসজীকে সঙ্গে লইয়া ভরতপুর হইতে প্রায় দুই সের সুল্‌ফা সঙ্গে করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ৺বৃন্দাবনের দিকে আসিতে-ছিলেন। ব্রিটিশ রাজ্যে এত সুল্‌ফা রাখা আইন-বিরুদ্ধ। পুলিশ তাঁহাকে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল। সাহেব বলিলেন “তুম এতনা সুল্‌ফা লে যাতে ক্যায়সা ? বিক্রী করোগে ?” তিনি বলিলেন “হাম্ ইস্‌কো তো একদিন দুদিনমে পিযাতে হেঁ।” সাহেব বলিল “এতনা সুল্‌ফা দুরোজমে পিযাতে হো! আচ্ছা হাম্‌কো দেখাও।” তখন তিনি গরীবদাসজীকে আধ আধ পোয়া করিয়া সুল্‌ফা চিলমে ভরিতে বলিলেন। এবং সাহেব ও মেমের সাক্ষাতে এমন করিয়া চিলম টানিতে লাগিলেন যে ভক্ ভক্ করিয়া চিলমের উপর অগ্নিশিখা উত্থিত হইতে লাগিল। তখন মেম সাহেব ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়া সাহেবকে

বলিলেন—"ইহাকে ছেড়ে দাও।" সাহেব বলিল—"আচ্ছা সীতা পাদ্রী তোম্‌কো চরস্‌কা তাম্রপত্র দে দেঙ্গে। আউর কোই তুম্‌কো পাক্‌ড়েগা নেই।" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন—"হামকো তাম্রপত্র নেহি চাহিয়ে। কোই পাক্‌ড়ে গা তো ফের এয়সা পিকে দেখায় দেয়েঙ্গে।" তখন সাহেব ও মেম হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা তুম্ যাও।"

একবার উজ্জয়িনীর কুম্ভের মেলায় কয়েকদিন পূর্ব্বেই অনেক সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হয়েন। তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ তপস্বী ছিলেন এবং তাঁহার অনেক অলৌকিক শক্তি ছিল। উজ্জয়িনীর রাজা তাঁহার বিভূতি দেখিয়া তাঁহার চেলা হইলেন, এবং সন্ন্যাসীদল খুব উৎসাহ ও হর্ষযুক্ত হইয়া কুম্ভের মেলার সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন, এবং সাধুদলকে আর ঐ মেলায় স্থান দিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। সাধু সকল যথাসময়ে মেলায় উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসীরা তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করিতে দিলেন না; তাঁহারা মেলার বাহিরে একত্রিত হইতে লাগিলেন। প্রায় ষষ্টি সহস্র সাধু একত্রিত হইল; কিন্তু সন্ন্যাসীদের সংখ্যা তদপেক্ষাও অধিক ছিল এবং রাজার আনুকূল্য লাভ করিয়া তাহারা অতিশয় দর্পিত হইয়াছিল। সুতরাং তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিয়া নিজের অবধারিত স্থান অধিকার করিতে সাধুরা সাহসী হইলেন না। মেলার স্থানে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সমস্ত সাধু একত্রে তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রজের মহন্তেরও প্রত্যেক কুম্ভের মেলায় উপস্থিত হইবার

নিয়ম আছে। তদনুসারে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কয়েকজন সাধু সমভিব্যাহারে তৎকালে উজ্জয়িনী অভিমুখে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ সাধুদলের সহিত তাঁহার মিলন হইল। তিনি অপর মহন্তদিগকে বলিলেন "তোমরা মেলা হইতে ফিরিয়া যাইতেছ কেন? এখনও ত মেলার তিথি উপস্থিত হয় নাই?" তাঁহারা বলিলেন, আমরা সংখ্যায় ষষ্ঠি সহস্র সত্য, কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের সংখ্যা আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক। অধিকন্তু তাহারা রাজাকে চেলা করিয়া সহায় সম্পন্ন হইয়াছে। তাহারা আমাদের নির্দ্দিষ্টস্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে, আমরা তথায় প্রবেশ করিতে চাহিলে তাহারা দাঙ্গা করিতে প্রস্তুত; সুতরাং ভয়ে আমরা তথা হইতে ফিরিয়া যাইতেছি। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "তোমরা বৃথা সাধু হইয়াছ। মৃত্যুতেই যদি তোমাদিগের ভয় থাকে, তবে তোমাদের গৃহে থাকাই উচিত ছিল। সাধু হইয়া মৃত্যুভয় করা কখনও সঙ্গত নহে। তোমরা তোমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে চাহিলে যদি লড়াই হইত, তবে তাহাতে কি ক্ষতি ছিল? সন্ন্যাসীরা শিবজীর উপাসনা করে, তাহারা শিবজীর বড়াই করিয়া তোমাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। তোমরা বিষ্ণুর উপাসক, বিষ্ণুর বড়াই করিয়া থাক, তাঁহার বড়াই করিয়া তোমরা তোমাদের স্থান অধিকার করিতে গেলে যদি লড়াই উপস্থিত হইত, তবে তোমরা বিষ্ণু বিষ্ণু করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়া

বৈকুণ্ঠে যাইতে, এবং সন্ন্যাসীরা শিব শিব করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়া শিবলোক লাভ করিত। ইহাতে উভয়েরই কল্যাণ। তোমরা কাপুরুষের ন্যায় ফিরিয়া আসিয়া বড় অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ এবং উপাস্যদেব বিষ্ণুর উপরে নিন্দা আনিয়াছ।" তাঁহার এইরূপ বাক্যে সমস্ত সাধুদল উৎসাহিত হইয়া উঠিল এবং বলিল, "মহারাজ, আমরা অন্যায় করিয়াছি, তুমি আমাদের অগ্রে অগ্রে চল, আমরা এই ষষ্টি সহস্র ফৌজ তোমার পশ্চাতে চলিব।" এই বলিয়া তাহারা অন্য এক মহন্তের সঙ্গের এক হাতী আনিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সাক্ষাতে উপস্থিত করিল। উনি সেই হাতীর উপর আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন এবং সমস্ত সাধুদল তাঁহার পশ্চাৎ চলিল। কিন্তু মেলাস্থানে তাঁহারা উপস্থিত হইলে অগ্রে স্থিত তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিয়াই সন্ন্যাসীদল বিমুগ্ধ হইল এবং ত্রাসযুক্ত হইয়া সাধুদিগের নির্দ্দিষ্টস্থান পরিহার পূর্ব্বক স্বীয় নির্দ্দিষ্টস্থানে গিয়া আসন স্থাপন করিল। তখন সাধুদল জয়ধ্বনি করিয়া স্বীয় অবধারিত স্থান অধিকার করিল এবং পরে কেহ কেহ সন্ন্যাসীদের উপর অত্যাচার পর্য্যন্ত করিতে আরম্ভ করিল। এমন কি, এক উদ্ধত-স্বভাব সাধু একজন সন্ন্যাসীর জীবন পর্য্যন্ত বিনাশ করিয়া ফেলিল। সেই সংবাদ প্রচারিত হইলে রাজকর্ম্মচারিগণ সঙ্গে করিয়া সাহেব তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বাবাজী মহারাজের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে খুন করিয়াছে, ধরাইয়া দাও।" তিনি বলিলেন, "সাহেব, আমি আমার আসনে

বসিয়া থাকি এবং অপর সাধুগণ আপন আপন আসন লাগাইয়া আছে। ইহার মধ্যে কে উঠিয়া গিয়া অপরের সহিত কলহ করিয়াছে এবং খুন করিয়াছে তাহা আমি কি প্রকারে বলিতে পারি ? তোমার রাজ্যে কত লোক কত কু-কাজ করে তাহা কি তুমি জান ? তোমার সম্মুখেই সাধুদল পড়িয়া আছে, তোমার আসামী যদি ইহার মধ্যে থাকে, তুমি অন্বেষণ করিয়া লও।" যে ব্যক্তি খুন করিয়াছিল সে অন্যত্র যাইয়া লুক্কায়িত হইয়াছিল, সুতরাং সাহেব আসামীর সনাক্ত না পাইয়া ফিরিয়া গেলেন। কুম্ভের মেলাও নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল।

একবার এক বৃহৎ সাধু-জমাতের সহিত শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কোন স্থানে যাইতেছিলেন। জমাতের চলিবার নিয়ম এই যে তাঁহারা রাত্রির শেষভাগে গাত্রোত্থান করিয়া শৌচ ও স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করেন। তৎপর আপন আপন ঠাকুরের পূজা করিয়া মঙ্গলারতি করেন। তৎপর ভোরের সময় সমস্ত আসন উঠাইয়া স্থানান্তরে যাত্রা করেন ; এবং মধ্যাহ্নে কোন স্থানে যাইয়া গ্রামের বাহিরে যে স্থানে উত্তম পানীয় জল আছে এমন স্থান দেখিয়া বৃক্ষের ছায়ায় আসন স্থাপন করেন। পশ্চিমদেশে সাধু-জমাত উপস্থিত হইলে ক্রমশঃ গ্রামবাসীরা আসিয়া তাহাদিগকে দর্শন ও দণ্ডবৎ করে ; এবং কত মূর্ত্তি সাধু উপস্থিত হইয়াছেন আন্দাজ করিয়া তাঁহাদের আহারের উপযুক্ত আটা, ডাল, লবণ ইত্যাদি দ্রব্যসামগ্রী গ্রামবাসী সকলে একত্র সংগ্রহ করিয়া দিনান্তে সাধুদের জন্য মহন্তের

নিকট উপস্থিত করে। তৎপর মহন্তের নির্দ্দেশ অনুসারে দুই চারিজন সাধু উপস্থিত হইয়া সেই সকল দ্রব্যসামগ্রী সাধুদিগের আপন আপন আসনের নিকট লইয়া গিয়া বাঁটিয়া দেয়। তাহাতে অনেক সময় এইরূপ ঘটে যে যাঁহার সঙ্গে পাঁচজন সাধু আছে তিনি হয়তো দশ জন সাধু আছে বলিয়া দশ জনের ভাগ লইতে চাহেন। এই কারণে কখন কখন কলহও উপস্থিত হয়।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ যে সাধুজমাতকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছিলেন সেই জমাতেও কোন কোন দিন এইরূপ কলহ উপস্থিত হইত। সেই জমাতে একজন প্রাচীন পরমহংস ছিলেন। সেই পরমহংস একদিন এই সকল কলহ দেখিয়া অতিশয় বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে বলিলেন—"তোমারা সম্প্রদায় কা বৈরাগ কুচ নেই। খালি পেটকা বৈরাগ। পেটকি ওয়াস্তে সারাদিন লড়তা হায়।" সমস্ত বৈরাগী সম্প্রদায়ের উপর এইরূপ তীব্র অবজ্ঞা শুনিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তখনই অতি দীন ভাবে হাত জোড় করিয়া পরমহংসকে বলিলেন— "মহারাজ, বৈরাগ ক্যায়সা হ্যায় আপ কৃপা কর্‌কে হাম্‌কো উপদেশ করিয়ে। আজসে আপ্‌কা উপদেশ মাফিক চলেঙ্গে।" পরমহংস তখনি প্রসন্ন হইয়া আপনাকে গুরু স্থানে স্থাপিত বোধ করিয়া বলিলেন—"বাচ্চা, বৈরাগ এয়সা হোতা হ্যায় কি কোই চিস্ কোই লায়কে আপন আগারি ধর দিয়া, তো আপনা প্রয়োজন মাফিক ওস্‌মেসে কুচ্ লে লিয়া। ইস্ মাফিক যো কুচ্ মিলে উসিসে সন্তোষ কর লিয়া। নেই কুচ্ মিলা, তো এসাই সন্তোষ কর লিয়া। কিসিছে মাঙ্গ্না নহী,

আপনা মন্‌মে সদা সন্তোষ রাখ্‌না।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন "মহারাজ, আজসে হামারা আসন আপকা আসন কি পাশ লাগে গা। ঔর আপ যেয়সা বাতায়া হাম এয়সাই করেঙ্গে। ঔর সাধু এয়সা করে ঔর নেই করে, হাম জরুর আপ যেয়সা বাতায়া এয়সা করেঙ্গে।" তৎপর অন্যান্য সাধু সর্দ্দারদিগকে আহ্বান করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ গোপনে বলিয়া দিলেন "আজসে তোমারি ওয়াস্তে ঋদ্ধি সিদ্ধি নেই আওয়েগা। তোম্‌ গাম্‌মে যাকে কের কুচ্‌ দিন তক্‌ মাঙ্গকের গুপ্‌ চুপ্‌ আপনা গুজারা করলেনা। জমাত কি পাশ আওর ঋদ্ধি সিদ্ধি নেই আওয়েগা। পরমহংসকো কুচ দেখলেনা চাইয়ে।" সেই দিবস সাধু সকলের আহার্য্য বিতরণ হইয়া গিয়াছিল। রান্না করিয়া তাঁহারা আপন আপন ঠাকুরের নিকট ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ পাইলেন। পরদিন প্রাতে যথানিয়মে সেই স্থান হইতে জমাত উঠিল এবং মধ্যাহ্নে অন্য গ্রামে গিয়া পড়িল। কিন্তু সেই দিন সেই গ্রাম-বাসীরা কেহ সাধুদিগের নিমিত্ত আহার্য্য বস্তু উপস্থিত করিল না। পরে অপরাপর সাধুসকল গ্রামে গিয়া কেহ এক বাড়ীতে কেহ অন্য বাড়ীতে কিছু কিছু ভিক্ষা করিয়া গোপনে আহার করিয়া আসিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ও পরমহংস আপন আসন হইতে উঠিলেন না। তাঁহারা দুইজনেই অনশনে রহিলেন। কেবল বাবাজী মহারাজ গাঁজা, চরস, ভাঙ খাইতেন। পরমহংস তাহা খাইতেন না, তিনি কেবল উদক পান করিয়া রহিলেন। পরদিন পুনরায় জমাত উঠিয়া অন্য গ্রামে গেল।

কিন্তু সেই গ্রামেও গ্রামবাসীরা কেহ আহার্য্য বস্তু কিছু উপস্থিত করিল না। পরমহংস ও শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অনশনে রহিলেন। অপর সকলে ভিক্ষা করিয়া পূর্ব্বদিনবৎ গোপনে আহার করিয়া আসিলেন। এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, পরমহংস ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে লাগিলেন। পরে অষ্টম দিবসে পরমহংস একেবারে চলৎশক্তিরহিত হইয়া বিকল হইয়া পড়িলেন। এবং আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বাবা! এক্ষণে আমার প্রাণ যায়। অন্নাভাবে আমি অবসন্ন হইয়াছি।" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তখন পুনরায় হাত জোড় করিয়া পরমহংসকে বলিলেন—"পরমহংসজী, আপনি আর্ত্তনাদ করিতেছেন কেন? আপনার কি করিতে হইবে আমাকে আদেশ করুন।" পরমহংস বলিলেন—"বাবা, ক্ষুধায় আমার প্রাণ যায়। আমার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। তুমি গ্রামে যাইয়া কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য মাগিয়া লইয়া আইস; এবং আমাকে দাও। নতুবা আমার প্রাণ যায়।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পুনরায় হাত জোড় করিয়া বলিলেন—"মহারাজ! বৈরাগ কিস্‌কে কহতা হ্যায়? আপ্‌তো বাতায়া থা কি কিসিসে মাঙ্গ্‌নে সে বৈরাগ নেহি রয়তা হ্যায়। আব্ হাম্‌কো ক্যায়সা মাঙ্গ্‌নে কো উপদেশ কর্‌তে হো?" তখন পরমহংসের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি মনে করিলেন আমি বৈরাগের উপর অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া বড় অপরাধ করিয়াছি; এবং হাত যোড় করিয়া বলিলেন—"বাবা, হামারা বড় কসুর হোয়া। তুম ক্ষমা কর। হাম্ অজ্ঞান হ্যায়। বৈরাগ

কি মাহাত্ম্য হাম্‌কো খবর নহি থা। হামারা কসুর তুম মাপ করো। হাম্ আপ্‌না কাণ পাকড় লেতে হেঁ।” তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—“পরমহংসজী, আপ্ কুচ্ চিন্তা মৎ করিয়ে, অবহি গামওয়ালা সব ঋদ্ধি সিদ্ধি লে কে তোমারা সাম্‌নে হাজির হোগা। বৈরাগ কো এয়সা নিন্দা নেই কর্‌না। বৈষ্ণব লোক বড় লীলা চতুর হোতা হ্যায়। ইন্‌কা প্রভাব সমুঝ্‌না বড়া কঠিন হ্যায়। ইয়ে সব লীলা কর্‌তে ফির্‌তে। কোন্ ঘট্‌মে ক্যায়সা পুরুষ বিরাজতে হেঁ ইস্‌কা পতা সব্‌কো নেহি মিল্‌তা হ্যায়।” এইরূপ বলিতেছেন সেই সময়ই গ্রামবাসী লোক খাদ্যসামগ্রী মস্তকে লইয়া আসিতেছে দেখা যাইতে লাগিল। এবং ক্ষণকাল মধ্যেই সমস্ত জমাতের জন্য খাদ্যসামগ্রী বাবাজী মহারাজের নিকট আনিয়া গ্রামবাসীরা উপস্থিত করিল। পরমহংসও যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিয়া বিনীত হইলেন।

প্রতি বৎসর জন্মাষ্টমীর পরবর্ত্তী দশমীতে ব্রজ চৌরাশি ক্রোশের পরিক্রমা আরম্ভ হয়। তখন বহু সাধু একত্রিত হইয়া ব্রজমণ্ডলের পরিক্রমা করেন। ব্রজের মহন্তেরও তাঁহাদের সঙ্গে প্রতি বৎসর যাওয়ার নিয়ম আছে। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও সেইজন্য প্রতি বৎসর পরিক্রমায় যাইতেন। ভূতেশ্বর মহাদেব যে স্থানে আছেন মথুরার সেই স্থান হইতে পরিক্রমা আরম্ভ হয়। সাধুদিগের পরিক্রমা প্রায় দেড় মাসে শেষ হয়। যে দিন পরিক্রমা শেষ হয় সেই দিবস সাধু-জমাত মথুরায়

আসিয়া গোকর্ণ মহাদেব যে স্থানে আছেন সেই স্থানে কয়েক দিন অবস্থিতি করিতেন। পরে জমাত ভাঙ্গিয়া যাইত এবং যিনি যথেচ্ছা গমন করিতেন। যে কয়দিন গোকর্ণ মহাদেবের নিকটে থাকিতেন সেই কয়দিন মথুরাবাসী লোক সাধুদিগের ভোজন যোগাইত। একবার পরিক্রমান্তে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ জমাত লইয়া এইরূপে গোকর্ণ মহাদেবের সমীপে আসিয়া আসন স্থাপন করিলেন ; এবং জমাত সেইখানেই পড়িল। সেই বার সাধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ বড় ক্রোধী ছিল। সহরে তাহারা সহরবাসী গৃহস্থদের ঘরে দুধ লুটিতে গিয়া অনেক ঝগড়া বিবাদ করিল। তাহাতে সহরবাসীরা ক্রুদ্ধ হইয়া সাধুদিগের নিমিত্ত খাদ্যসামগ্রী প্রথম দিন উপস্থিত করিল না ; সুতরাং সাধুরা অনেকে অনশনে রহিলেন। নাগাজীর বর হেতু দুধ লুটিয়া লইতে তাঁহাদের অধিকার আছে বলিয়া সাধুরা মনে করেন। যাহা হউক, প্রথম দিবস সেইবার মথুরায় সাধুদিগের নিমিত্ত আহার্য্য উপস্থিত হইল না। তৎপর দিবস কয়েকজন মথুরাবাসী লোক সাধুদিগকে দর্শন করিতে আসিল। তাহাদের মধ্যে একটু বাবু রকমের কয়েকজন জুতাপায়ে আসিয়া একে-বারে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ধুনীর নিকটে বসিয়া কথোপ-কথন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা যে জুতাপায় আসিয়া ধুনীতে বসিয়াছে, তৎপ্রতি তিনি তত লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু অপর একজন সাধু আসিয়া ইহা দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"হারে, তুম্ সব্ ক্যায়সা জুতি লেকের মহাত্মাকা ধুনী পর আনকর বৈঠ্ গিয়া।" তাহাদের মধ্যে একজন বলিল "হারে, হম্ বি ব্রজবাসী

সাধু হ্যায়। জুতা লে আয়া তো ক্যা হোয়া।” সেই সাধুও তখন চটিয়া তাহাদিগকে দুই এক গালি দিল এবং তাহারাও গালি দিয়া বলিল “হারে, সব পেট্‌কা বৈরাগ। হম্‌ সব জান্‌তে হেঁ। সবই বড়া বড়া মহন্ত বন্‌ জাতে হেঁ, ঔর হিঁয়া আনকের ভুখা পড়তা হ্যায়।” এই অবজ্ঞাসূচক কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একবার মাত্র তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু কোন একটা কথাও তাহাকে বলিলেন না। এই তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে যে ব্যক্তি দণ্ডায়মান ছিল, সে তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হইল এবং ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। অপর সকল মথুরাবাসী যাহারা জমাত দর্শন করিতে আসিয়াছিল তাহারা তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল; কিন্তু অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই সে ব্যক্তি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন সকলে হাহাকার করিয়া তাহার শবদেহ সেইখান হইতে অপসারিত করিল। গ্রামবাসীরা আসিয়া পরে সাধুদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু এইবার গোকর্ণের মহন্তের সহিতও কিছু গোলযোগ হওয়াতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন—“আমি আর কখনও এখানে আসিয়া আসন স্থাপন করিব না।” তৎপর অবধি পরিক্রমার পর আর তিনি সেখানে যাইতেন না। অনেক বৎসর পর কোন কোন সাধু নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে যাইয়া আসন স্থাপন করিতেন। সেইস্থানে আর সাধু মেলা এখন হয় না।

কুম্ভের মেলা হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে হইয়া থাকে। সেই সময় ব্রজের মহন্তকেও তথায় যাইতে হয়।

সুতরাং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও তৎকালে শ্রীবৃন্দাবন ছাড়িয়া কুম্ভমেলার স্থানে যাইতেন। তদ্ব্যতীত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় তিনি প্রতিবৎসরই যাইতেন। অন্য সময়ে সচরাচর শ্রীবৃন্দাবনে যমুনা কিনারে পূর্ব্বোক্ত ঘাটের উপরেই থাকিতেন। ব্রজবাসীরা অনেকে বিশেষতঃ গৌতমবংশীয় ব্রাহ্মণেরা তাঁহার প্রতি বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ গৌতম ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রধান ছন্নু সিং, নোনা সিং প্রভৃতি কয়েকজনের এজমালী স্বত্ব এক বাগিচা কেমারবন মহল্লায় রেলওয়ে লাইনের সংলগ্ন স্থানে ছিল। সেখানে হনুমানজীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রজবাসী যুবক ও বালকেরা সেখানে গিয়া কুস্তী লড়িত। ছন্নু সিং প্রভৃতি মালিকগণ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে ঐস্থানে আনিয়া স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়া তাঁহার নিকট একদিন এই বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থিত করে। তাহাতে তিনি বলিলেন "যদি এই স্থান আমাকে তোমরা একেবারে দান কর, তবে যাইতে পারি, নতুবা এই যমুনা কিনারেই বেশ আছি।" তাহারা দান করিতে সম্মত হইয়া বলিল "আপনি এবং আপনার চেলা, নাতি চেলা প্রভৃতি যতদিন কেহ জীবিত থাকিবে তত দিন ইহা আপনাদের। কিন্তু আপনার চেলা শ্রেণীর কেহ না থাকিলে এই বাগিচা পুনরায় আমাদের বংশধরগণের স্বত্ব হইবে; এইরূপ বলিয়া তাহারা তাঁহাকে সেই বাগিচা অর্পণ করিল। ইহা অদ্যাবধি প্রায় তেইশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সেই বৎসরই প্রয়াগে মাঘ মাসে কুম্ভমেলা হয়। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তখন যমুনা তীর ছাড়িয়া ঐ বাগিচায়

আসিলেন এবং তথায় ছনের এক ঝুপরী প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতরে ধুনী স্থাপন করিলেন, এবং তদবধি সেইস্থানে বাস করিতে লাগিলেন। ইহার অল্প কিছুকাল পরেই প্রয়াগে কুম্ভের মেলা উপস্থিত হয়। তখন শ্রীযুক্ত গরীবদাসজীকে আশ্রমে রাখিয়া, এবং প্রেমদাস নামক তাঁহার এক সাধক চেলা এবং কল্যাণ দাস নামে একটি অতি কৃষ্ণকায় শূদ্র জাতীয় শ্রীসম্প্রদায়ের সাধুকে এবং গঙ্গা নাম্নী একটি বড় বকনা গাভীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রয়াগরাজে কুম্ভের মেলা স্থানে যাইয়া উপস্থিত হয়েন।

এইস্থলে শ্রীযুক্ত প্রেমদাসজীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইনি ব্রজবাসী ব্রাহ্মণতনয় ছিলেন। দাউজীর নিকটস্থ এক গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের একজন জ্যেষ্ঠ গুরু ভাই তাঁহাকে বালক কালে চেলা স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রেমদাস নামকরণ করেন ; এবং তাঁহাকে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট লইয়া গিয়া সমর্পণ করিয়া বলেন—"এই চেলাটি তোমার নিকট থাকিয়া সর্ব্বদা তোমার সেবা করিবে। ইহাকে তুমি আপন চেলার ন্যায় রাখিও।" তদবধি তিনি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতেন। তাঁহার নাম যেমন প্রেমদাস তাঁহার স্বভাবও তদ্রূপ প্রেমময় ছিল। লেখাপড়াও তিনি বেশ শিক্ষা করিয়াছিলেন, "সুরসাগর" পাঠ করিতে তাঁহার বড় প্রেম ছিল। শ্রীবৃন্দাবনে অনেক স্থানে সময় সময় পুরাণাদির পাঠ পণ্ডিত সকল করিয়া থাকেন। এই পাঠ শুনিতে তাঁহার বড় প্রেম

ছিল। সুতরাং তিনি অনেক সময় পাঠ শুনিতে যাইতেন। পণ্ডিতের পাঠ শুনিতে শুনিতে একবার তাঁহার মনের এইরূপ সংস্কার জন্মিল যে কণ্ঠী উপবীত প্রভৃতি রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। খাদ্যাখাদ্যের নিষ্ঠা ও নিয়ম যেরূপ বৈষ্ণবেরা রক্ষা করেন তাহা নিষ্প্রয়োজন। পরমহংস বৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা বৈরাগীর উপযুক্ত বৃত্তি। সকলের মধ্যেই ব্রহ্ম আছেন। সর্ব্ব বস্তুই সমান। এই সকল মত তিনি আশ্রমে আসিয়াও প্রকাশ্যে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন "এতো ছিন্দি (পাগল) হো গিয়া। ইস্‌কা বাত ক্যায়া শুনেঙ্গে।" এই কথা তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইবার পরক্ষণেই প্রেমদাসের উন্মাদ লক্ষণ প্রকাশিত হইল, এবং তিনি উন্মাদের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আরক্তিম এবং বিস্ফারিত হইল; এবং তিনি তৎক্ষণাৎ এক চিম্‌টা হাতে করিয়া আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন। এবং এক প্রকার বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় দূরবর্ত্তী বর্ষাণা প্রভৃতি স্থানে অতি দ্রুতবেগে গিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আহার নাই, তৃষ্ণা নাই, নিদ্রা নাই, যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন সেই দিকেই কেবল বাবাজী মহারাজের মূর্ত্তি দেখিতে পান। পাঁচ দিন এইরূপ নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কণ্টকের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত শরীরে পুনরায় বৃন্দাবনে আসিলেন। শ্রীযুক্ত গরীবদাসজী তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া অতিশয় দয়ার্দ্র চিত্ত হইলেন এবং তাঁহাকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক আশ্রমে আনয়ন করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের

নিকট করজোড়ে নিবেদন করিলেন "মহারাজ, প্রেমদাস বালক। তোমার বাল গোপাল। ইহার প্রতি কৃপা কর। এ একেবারে উন্মাদ হইয়াছে, বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ইহাকে কৃপা করিয়া প্রকৃতিস্থ কর।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন "আমি কি করিব। আমি কি বৈদ্য?" পরে গরীবদাসজী আরও অনুনয় বিনয় করিতে, তিনি বলিলেন "ঠাকুরের প্রসাদ আছে। এই প্রসাদ ইহাকে দিতে পার। প্রসাদের মাহাত্ম্য যদিও এ মানে না, তথাপি খাওয়াইয়া ইহাকে দেখাও ইহার মাহাত্ম্য আছে কিনা।" তখন গরীবদাসজী শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের একখানি প্রসাদের রুটি প্রেমদাসের হাতে দিয়া তাঁহাকে ধমকাইয়া বলিলেন "ইহা খাও।" তিনি ঐ রুটির এক টুক্‌রা প্রথমে মুখে দিলেন ; কিন্তু ইহা তাঁহার নিকটে "জহরের" মত তিক্ত বোধ হইল। গরীব-দাসজীর ধমকানিতে তিনি ঐ টুক্‌রাটি গলাধঃকরণ করিলেন, কিন্তু আর কোন প্রকারে কিছু খাইতে পারিলেন না। তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ নিজেই বলিলেন—"আরে খা! ঔর এক বখত দেখ ক্যায়সা হ্যায়।" মৌনী এই কথায় পুনরায় এক টুক্‌রা ছিঁড়িয়া লইয়া মুখে দিলেন। কিন্তু এইবার মুখে দেওয়া মাত্র দেখিলেন যে ইহা যেন অমৃত। আর কখনও এইরূপ সুস্বাদু দ্রব্য তিনি খান নাই। তৎপর সমস্ত রুটি আস্তে আস্তে খাইলেন। এবং তাহাতে পূর্ব্বোক্তরূপ অমৃতের স্বাদ প্রাপ্ত হইলেন। আহারান্তে তাঁহার ছন্নতা তৎক্ষণাৎ

দূরীভূত হইল এবং তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন; এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিলেন। তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "কেমন, তুমি না বলিয়াছিলে যে সকল বস্তুই সমান? এইক্ষণে প্রসাদের মাহাত্ম্য দেখিলে ত? এইজন্য বৈষ্ণবগণ শুদ্ধাচারে থাকিয়া পবিত্র দ্রব্যের দ্বারা ঠাকুরের ভোগ দেন। এই প্রসাদ অপর খাদ্যের তুল্য নহে। ইহার মাহাত্ম্য এত অধিক যে তাহা বর্ণনা করা কঠিন।" প্রেমদাস তখন পুনরপি দণ্ডবৎ করিয়া বলিলেন "মহারাজ, আমি পণ্ডিতের বাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া পবিত্র অপবিত্র, শুচি অশুচি, ইত্যাদি ভেদ কেবল ভ্রম মাত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। আপনার কৃপায় আমার এই ভ্রম এক্ষণে দূর হইয়াছে।" তদবধি প্রেমদাস পুনরায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি স্বভাবতঃ অতি প্রেমিক হইলেও গাঁজা চরসের ধূম অধিক পরিমাণে পান করাতে তাঁহার মস্তিষ্ক গরম হইয়া উঠিত; এবং তিনি সময় সময় অন্য লোকের সহিত ঝগড়া ও ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। তাহা দেখিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এক দিবস তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন—"ওরে, তোর বড় ক্রোধ। তুই লোকের সঙ্গে বড় ঝগড়া করিস্। অতএব অদ্যাবধি তুই মৌনী থাকিবি। কাহারও সহিত বার বৎসর কথা কহিতে পারিবি না।" শ্রীযুক্ত মৌনীজী এই সকল ঘটনা স্বয়ং বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে "যখন

বাবাজী মহারাজ আমাকে এইরূপ বলিলেন আমি তখনই বোধ করিলাম যেন আমার জিহ্বাতে কেহ "কুলুপ" লাগাইয়া দিয়াছে। আমার আর কথা কহিবার শক্তিই রহিল না। সুতরাং আমি বাধ্য হইয়া মৌনী হইলাম।" প্রেমদাসজী দ্বাদশ বৎসর এইরূপে মৌনী রহিলেন। সুতরাং তাঁহাকে মৌনী বলিয়াই সকলে ডাকিত। একবার তাঁহাকে অতি বিষাক্ত সর্প আঘাত করে। তিনি তীব্র দংশনযাতনায় অস্থির হইয়া পড়িয়া গেলেন। কিন্তু একবার "উঁ" করিবারও সামর্থ্য তাঁহার তৎকালে হয় নাই। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সেই সময় এক জ্বলন্ত কয়লা ধুনী হইতে লইয়া সেই আঘাতের স্থানে বসাইয়া দিলেন। তাহা পুড়িতে লাগিল। কিন্তু তথাপি মৌনী একবার উঁ পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না। এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন মৌন বৃত্তিতে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে মৌনীর মৌনব্রত ভঙ্গ করাইবেন বলিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ভাণ্ডারা করাইলেন। ভাণ্ডারা স্থলে সকলে উপস্থিত হইয়া মৌনীকে বলিলেন "তোমার ব্রত এক্ষণে পূর্ণ হইয়াছে। তুমি কথা কও।" কিন্তু মৌনী তখনও কথা কহিতে অসমর্থ হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন তিনি কথা কহিতে পারেন না, যদি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কথা কহিবার শক্তি খুলিয়া দেন, তবেই তিনি কথা কহিতে পারিবেন। তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ মৌনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মৌনী, তুমি এখন হইতে কথা কও।" তখন মৌনী বোধ করিলেন যেন তাঁহার জিহ্বার কুলুপ খসিয়া পড়িল; এবং

তিনি আনন্দিত হইয়া "শ্রীজী" এই বাক্যটি প্রথমে উচ্চারণ করিলেন ; এবং তৎপর হইতে সকলের সহিত সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।

মৌনীজী স্বয়ং বলিয়াছেন যে তাঁহার মৌনাবস্থায় ব্রজ পরিক্রমার সময় তিনি একবার অভিমান করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার অবর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সেবার ত্রুটি হইতেছে মনে করিয়া তিনি মনে মনে অতিশয় কষ্ট পাইলেন, এবং অনুতাপ করিয়া যেদিন পরিক্রমার জমাত রাধাকুণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইল সেই দিবস তিনি তথায় আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সেই সময় স্বীয় আসনোপরি শায়িত হইয়া আরাম করিতেছিলেন। মৌনী সেই সময় চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে তাঁহার চরণ-প্রান্তে বসিয়া পদসেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ধীরে ধীরে তাঁহাকে বলিলেন—"আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি ; সুতরাং তুই আর আমার কাছে থাকিবি কেন ? আমি দুঃখ পাইয়া মরিয়া গেলে তুই তখন আশ্রমে আসিবি।" মৌনী তখন নীরবে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে পদসেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যেই দেখিলেন যে তাঁহার হস্ত শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের অঙ্গে লাগিতেছে না, আসনের উপর পড়িতেছে ; এবং বাবাজী মহারাজের শরীর সেইস্থানে নাই। মৌনী তখন একেবারে অবাক হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অজস্র চক্ষের জল নিক্ষেপ

করিতে লাগিলেন। এইরূপে যখন মৌনীজী অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন তখন ক্ষণকাল মধ্যে পুনরায় দেখিলেন যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পূর্ব্বের ন্যায় আসনেই শয়ান রহিয়াছেন। তখন মৌনী আশ্বস্ত হইলে তিনি বলিলেন—"কেমন, আমি চলিয়া গেলে যদি তুই প্রসন্ন হোস, তবে বল্ আমি এক্ষণি চলিয়া যাই। নতুবা এমন বৃদ্ধকে একলা ফেলিয়া যদি তোরা চলিয়া যাস্ তবে আর কে সেবা শুশ্রূষা করিবে।" তিনি এমন অসহায়ের ন্যায় এই সকল কথা বলিলেন যে মৌনীর প্রাণ তাহাতে একেবারে দ্রবীভূত হইয়া গেল। বেগের সহিত চক্ষের জল নিক্ষেপ করিতে করিতে মৌনী তখন উঠিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে তিনবার পরিক্রমা করিলেন, এবং সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিয়া করজোড়ে তাঁহার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে বসিয়া সেবা করিতে আদেশ করিলেন এবং "পুনরায় এইরূপ অভিমান করিয়া বৃদ্ধকে ফেলিয়া যাইও না" বলিলেন।

শ্রীযুক্ত গরীবদাসজী পূর্ব্বোক্ত প্রয়াগের কুম্ভমেলার ছয় মাস পরেই শ্রীবৃন্দাবনে দেহত্যাগ করেন। তদবধি বহু বৎসর অকপট হৃদয়ে মৌনীজী শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি রান্না করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরজীর সেবা পূজা করিতেন। পোড়া বাসন প্রভৃতি মাজিতেন, দূর হইতে স্কন্ধে করিয়া বহু ঘড়া জল আনিতেন, আশ্রম পরিষ্কার রাখিতেন। গরুসকলের কুটি কাটিয়া দিতেন, গোবরের দ্বারা কাণ্ডা প্রস্তুত

করিতেন, কাঠ চেলা করিতেন, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের পদসেবা করিতেন, এবং আবশ্যকীয় যখন যে কাজ পড়িত তৎসমস্তই স্বয়ং করিতেন। প্রায় সর্ব্বদা একাকীই এই সমস্ত কার্য্য করিতেন, কখন কখন বা অপর কেহ সাহায্যও করিত। এতৎসমস্ত আমি নিজ চক্ষে দেখিয়াছি। তিনি পাককার্য্যে অতি নিপুণ ছিলেন, তাঁহার পক্ক ব্যঞ্জনাদি অতি সুস্বাদু হইত। সেবাকার্য্যে এরূপ নৈপুণ্য ও ধৈর্য্য আমার আর চক্ষুগোচর হয় নাই।

এই মৌনীজীকে এবং কল্যাণদাস ও গঙ্গা নাম্নী একটি বক্‌না গো সঙ্গে লইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কুম্ভের মেলায় গিয়াছিলেন ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই মেলা স্থলেই আমি প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের দর্শন লাভ করি। একটি বড় ছাতার নীচে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আসীন থাকিতেন। তাঁহার এক পার্শ্বে ঐ ছাতাটির নিম্নে মৌনীজী বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার মৌন তখন ভঙ্গ হয় নাই; সুতরাং কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না; সারাদিন একস্থানে বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অজস্র ধারায় অশ্রুজল নীরবে বর্ষিত হইত; তাঁহার মুখমণ্ডল সর্ব্বদা আরক্তিম থাকিত। দর্শক মাত্রেই সেইস্থানে তাঁহার মূর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইতেন। কুম্ভের স্নানের দিবস সমস্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে এক হস্তীর উপর উপবেশন করাইয়া তাঁহাকে অগ্রে করিয়া ত্রিবেণীতে স্নানার্থ গমন করেন। তৎপর মাঘ মাস সমস্ত কুম্ভের মেলা থাকে। ফাল্গুন মাসে মেলা ভাঙ্গিয়া যায়। তখন

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রয়াগ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে নিজ আশ্রমে প্রত্যাগত হয়েন। তৎপরাবধি তিনি নিয়ত আশ্রমেই বাস করিতেন। কেবল ভাদ্রমাসে বন পরিক্রমার সময় জমাত লইয়া ব্রজ চৌরাশি ক্রোশ পরিক্রমা করিতে যাইতেন; এবং একবার অর্থাৎ ১৯০৩ সালে ডিসেম্বর মাসে (১৩১০ বাঙ্গলার পৌষ মাসে) কলিকাতা আসিয়া প্রায় একমাস কাল বাগ-বাজার বোস্‌পাড়ার যে বাটীতে আমি বাস করিতেছিলাম, আমার প্রতি কৃপা করিয়া সেই বাটীতে আসিয়া অবস্থিতি করেন। অতঃপর শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাগত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে ১৩১৬ বাঙ্গলার ৮ই মাঘ তারিখ পর্য্যন্ত নিয়ত বাস করিয়াছিলেন।

যে মাঘ মাসে প্রয়াগের কুম্ভের মেলা হয় পূর্ব্বে বলিয়াছি তৎপরবর্ত্তী শ্রাবণ মাসে শ্রীযুক্ত গরীবদাসজী আশ্রমে থাকিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিয়াছেন যে শ্রীযুক্ত গরীবদাসজীর সাধুত্ব সম্পূর্ণ নির্দ্দোষিতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং ভগবান্ অনন্তদেব, যাঁহার প্রতি তিনি অতিশয় আকৃষ্ট ছিলেন এবং যাঁহার মূর্ত্তি তিনি দক্ষিণ হইতে আনিয়া সর্ব্বদা পূজা করিতেন, তিনি তাঁহাকে এই মানবদেহের দুঃখ হইতে একেবারে মুক্ত করিয়া স্বীয় ধামে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে সর্পরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার দেহকে দংশন করেন; কিন্তু গরীবদাসজী এমনই ধৈর্য্যসম্পন্ন ছিলেন যে সেই সর্পের দংশনযন্ত্রণা যে তাঁহার কিছুমাত্র অনুভব হইতেছিল তাহা বাক্য অথবা মুখের ভঙ্গির দ্বারাও কাহাকেও বুঝিতে দেন নাই। ভীষণ সর্প দংশন করিবার পর "এক কিরা কাট খায়া" এই

কথা মাত্র বলিয়া তৎপরেই ভোর রাত্রে তাঁহার নিয়মিত সময়ে তিনি স্নান করিলেন। স্নান করিয়া নিয়মিত ইষ্ট উপাসনার নিমিত্ত উপবিষ্ট হইয়া অল্পক্ষণ পরেই ঢলিয়া পড়িলেন; নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির ন্যায় তিনি গুরুসন্নিধানে শয়ন করিলেন; তাঁহার মুখশ্রী পূর্ব্ববৎ প্রশান্ত এবং নির্ম্মল রহিল। অবশেষে দেহ একেবারে নিস্পন্দ হইলে তিনি গোলোকধামে গমন করিয়াছেন জানিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার দেহকে যমুনায় বিসর্জ্জন করিলেন। বর্ষাকালের প্রবল স্রোতে দেহ যমুনায় প্রবাহিত হইতে লাগিল কিন্তু যেন ব্রজধামের প্রতি তাঁহার দেহেরও প্রীতি প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত মথুরার বিশ্রাম ঘাটের সম্মুখে সেই অতি দীর্ঘ জটাজূটসমন্বিত বৃহদাকার দেহ তিন দিবস পর্য্যন্ত সকলের দর্শনার্থ অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাঁহার প্রিয় বিশ্রাম ঘাট যেন সাধুসঙ্গ লাভার্থেই যমুনার মধ্যে ঘূর্ণিপাক উপস্থিত করিয়া তাঁহার দেহকে আপন সন্নিধানে রক্ষা করিল। তিনি মথুরাবাসী সকলের পরিচিত ছিলেন, সুতরাং মথুরাবাসী জনগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও আরতি করিতে লাগিল; এবং সকলেই শোকাতুর হইয়া তাঁহার অনুপম গুণাবলীর কীর্ত্তন করিতে লাগিল। এইরূপে তিন দিবস পর্য্যন্ত ব্রজবাসীকে দর্শন দিয়া বিশ্রামঘাট পরিত্যাগ করিয়া দেহ অদৃশ্য হইল।

শ্রীযুক্ত গরীবদাসজীর দেহান্ত হইলে শ্রীযুক্ত মৌনীজী সেবাকার্য্যের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন; এবং অকপট প্রাণে সেবাকার্য্যে রত হন। এইরূপে প্রায় দ্বাদশ বৎসর কাল তাঁহার

অতীত হয়। তিনি আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন; এবং আমার প্রতি স্নেহ বশতঃ এই সময়ের মধ্যে দুইবার কলিকাতা আসিয়া আমার সহিত একসঙ্গে কিয়ৎদিবস অবস্থিতি করেন। তাঁহার প্রেমিক প্রকৃতিতে সকলেই মুগ্ধ হয়। অবশেষে শিরঃপীড়া ও হাঁপানি রোগে তিনি ক্লিষ্ট হইয়া পড়েন; এবং অন্তিমে আশ্রম হইতে কেশী ঘাটে গিয়া দেহত্যাগ করেন।

ইতি পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত

ষষ্ঠ অধ্যায়

শেষ অবস্থার লীলা

পূর্ব্বে যে প্রয়াগরাজে কুম্ভের মেলায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ গমন করার কথা বলিয়াছি, তাহা ১৩০০ বাঙ্গলা সালের মাঘ মাসে মিলিত হয়। সেই মেলাতেই প্রথম আমি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করি। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুও সেইবারে বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে সেই মেলায় গমন করিয়া মেলা স্থানে সাধুদিগের মধ্যে তাঁবু বসাইয়া তথায় স্বীয় আসন স্থাপন করিয়াছিলেন।

আমি ইতিপূর্ব্বে কোন যোগী সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া প্রায় দ্বাদশ বর্ষ তাঁহাদের অধীনে থাকিয়া প্রাণায়ামাদি যোগ শিক্ষা করিতাম। অবশেষে আমার মনে এইরূপ ধারণা হইল যে যে পর্য্যন্ত সাধন এই সম্প্রদায়ে আছে তাহা আমার লব্ধ হইয়াছে এই ধারণা আমার ভ্রমাত্মক হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায়

এইরূপই আমার ধারণা হইল; এবং এখানে থাকিয়া যে আমার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইবে এইরূপ আর বিশ্বাস রহিল না। কারণ এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার কেহ লাভ করিয়াছেন এইরূপ পুরুষ আমার দৃষ্টিগোচর হইল না। যে সকল সাধন ও ক্রিয়া ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে তৎসমস্ত বিশেষ কল্যাণকর সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ্দ্বারা যে কাহারও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে অথবা হইতে পারে এই বিষয়ে আমার বিশ্বাস তিরোহিত হইল। এতৎ সমস্তই আমার ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু আমার মনে এইরূপই প্রতীতি জন্মিল। সুতরাং যিনি যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছেন এবং যাঁহার কৃপায় আমি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি, এমন সদ্গুরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়া আমার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমি সদ্গুরু লাভের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর সহিত আমি বহুপূর্ব্বাবধি খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলাম। তিনি এই কুম্ভের মেলার প্রায় দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে সদ্গুরুলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন; ঐ কুম্ভের মেলার পূর্ব্বে তাঁহার বহু শিষ্যও হইয়াছিল; আমিও সময় সময় তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতাম এবং তাঁহার তীব্র তপশ্চরণ দেখিয়া তাঁহার প্রতি খুব শ্রদ্ধান্বিত ছিলাম; তাঁহার সাধনের বেগ এমন ছিল যে আমি কিছুদিন পরে পরে যাইয়া দেখিতাম যে ইতিমধ্যেই তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাঁহার নেত্রের ভঙ্গীর এবং মুখশ্রীর পরিবর্ত্তন অতি শীঘ্র শীঘ্র ঘটিতেছে লক্ষ্য করিতাম। তাঁহার এই সকল পরিবর্ত্তন তাঁহার

সাধনাবস্থার উন্নতির সূচক ছিল। এইরূপ সচরাচর সাধকের ঘটে না। আমি তন্নিমিত্ত তাঁহাকে অতি অসাধারণ পুরুষ বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু এই সকল উন্নতি দর্শন করাতেই আমি তাঁহাকে তৎকালে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারি নাই, তাঁহাকে অতি উচ্চ অবস্থার পুরুষ বলিয়া মনে করিলেও উচ্চ সাধক বলিয়াই মনে করিতাম, একেবারে সিদ্ধ-মনোরথ হইয়াছেন বলিয়া মনে হইত না ; সুতরাং তাঁহাকেও গুরুত্বে বরণ করিতে আমার ইচ্ছা হইল না।

আমার মনের এইরূপ অবস্থা ঘটিলে একবার আমার অন্তঃ-করণের অতিশয় ব্যাকুল অবস্থায় কোন দৈব কৃপাবশে আমি একটি একাক্ষরী বীজমন্ত্র লাভ করিলাম। এবং সেই মন্ত্র সাধন করিতে করিতে ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরু আমার লাভ হইবে বলিয়া আমি সেই দৈব কর্ত্তৃক উপদিস্ট হইলাম। তদবধি আমি সেই মন্ত্রই জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। একদিন মধ্য রাত্রির পর কলি-কাতার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের পার্শ্বস্থিত একটি বাটীর বারান্দায় একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রশ্ন আমার মনে উদিত হইল। সেই নিভৃত স্থানে অনেকক্ষণ বসিয়া তাহার উত্তর চিন্তা করিলাম। কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর চিন্তায় উপস্থিত হইল না। কোন প্রকারে এক সিদ্ধান্ত করিয়া বাটীতে চলিয়া গেলাম। তাহার দুই তিন মাস পরে মাঘ মাসে একজন বন্ধুর অনুরোধে বাধ্য হইয়া তাঁহার সহিত একত্রে আমি পূর্ব্বোক্ত কুম্ভের মেলা দর্শনার্থ প্রয়াগে গমন করিলাম। তথায় যাইয়া শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ

গোস্বামী প্রভুর তাঁবুতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম এবং তিনিও প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন “এখানে আসিয়াছেন বড় ভাল হইয়াছে। এখানে অনেক মহাত্মা পুরুষের সমাগম হইয়াছে। কাহারও শুভদৃষ্টি পড়িলে উদ্ধার হইয়া যাইবেন।” যে বন্ধুটি আমাকে সঙ্গে করিয়া প্রয়াগে লইয়া গিয়াছিলেন তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ রায়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায়। তিনি এই কুম্ভের মেলার প্রায় ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমরা যাইবার পূর্ব্বাবধি শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভুর তাঁবুতে বাস করিতেছিলেন। আমি ও হরিনারায়ণ বাবু যে সময় শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভুর তাঁবুতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম, ঠিক সেই সময়ে শ্রীযুক্ত অভয় বাবুও তথায় আসিয়া আমাদিগকে দেখিয়া বড় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—“এই মাত্র আমি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট হইতে আসিতেছি। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এখানে আসিবার কথা ছিল, কিন্তু সে অদ্যাপি আসিল না। সে আসিবে কি?” তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন “সে এখনই আসিতেছে।” চলুন আপনারা উভয়ে তাঁহার দর্শন করিয়া আসিবেন। তখন আমরা দুইজনেই শ্রীযুক্ত অভয় বাবুর সঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে চলিলাম। অভয় বাবু যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহা আমি পূর্ব্বেই শ্রুত হইয়াছিলাম। কিন্তু

তিনি কি প্রকারের সাধু তৎসম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র অবগত ছিলাম না। শ্রীযুক্ত অভয় বাবুর সহিতও পূর্ব্বে এ বিষয়ে আমার কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। অভয় বাবুর সঙ্গে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম এক বৃহৎ ছাতার নীচে জটাজূটধারী অতি তেজঃপুঞ্জকলেবর এক প্রাচীন সাধু উপবিষ্ট আছেন। অভয় বাবু ইঁহাকেই তাঁহার গুরুদেব বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। আমরা উভয়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। অভয় বাবু তাঁহার নিকটে আমাদের এইরূপে পরিচয় দিলেন "ইনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, যাঁহার এখানে আসিবার কথা কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম, আর ইনি আমাদের একটি বন্ধু; ইঁহারা দুইজনে এই মাত্র এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন "আয়া ত বহুত আচ্ছা হুয়া।" এবং আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "ইন্‌কো ত হম বৃন্দাবনমে দর্শন কিয়া।" আমি তৎপূর্ব্বের আশ্বিন মাসে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলাম, এবং হরিনারায়ণ বাবুও কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, সত্য; কিন্তু তাঁহার সহিত আমাদের কাহারও পূর্ব্বে সাক্ষাৎ হয় নাই; তথাপি তিনি কেন কেবল আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া ঐ কথা বলিলেন তাহার কোন কারণ বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমরা তিনজনেই তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আসনের সমীপে উপবিষ্ট হইলাম। আমরা উপবিষ্ট হইলে আমার মনে যে প্রশ্নটি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের পার্শ্বস্থ বারান্দায় মধ্যরাত্রের পর বসিলে দুই তিন মাস পূর্ব্বে উদয় হইয়াছিল বলিয়াছি,

সেই প্রশ্নটিও তাহার উত্তর শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রথমেই আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন। এই সম্বন্ধীয় কোন কথা তখন আমার মনেও ছিল না। তিনি এইরূপ বলিলে আমি একেবারে চমকিয়া উঠিলাম, মনে ভাবিলাম "এ কি, দুই মাস কাল পূর্ব্বে নিভৃত দূরবর্ত্তী স্থানে গভীর নিশীথে বসিয়া মনে মনে আমি কি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছি তাহা ইঁহার বিদিত হইয়াছে!! ইনি কিরূপে ইহা জানিলেন? তবে বোধ হইতেছে আমার মনের আবদার ভগবান শুনিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার জন যিনি যেখানে আছেন তাঁহারও ইহার খবর হইয়াছে; বোধ হয় ইনি একজন ভগবদ্ভক্ত হইবেন, তাহাতেই ইঁহারও এই বিষয়ে অবগতি আসিয়াছে" এইরূপ ভাবিয়া আমি ক্ষণকালের নিমিত্ত বড় আশাযুক্ত হইলাম। তৎপর আবার ভাবিতে লাগিলাম; "আচ্ছা যদি ইনি আমার জিজ্ঞাসিত বিষয় অবগতই হইয়াছেন, তাহা হইলেও আমাকে এইরূপে বলিলেন কেন? তবে কি আমি যেরূপ মহাপুরুষের আশায় কাল কাটাইতেছি, ইনি সেইরূপ মহাপুরুষ, এবং আমার প্রতি কৃপা করিবেন বলিয়া এইরূপ আত্মপ্রকাশ করিলেন? যাহা হউক, আমি এক্ষণে কেবল দেখিয়া যাইব, কোন কথা কিছু বলিব না।" এইরূপ স্থির করিয়া দুই পাঁচ মিনিট বসিয়া অন্যান্য কর্ত্তাবার্ত্তা শুনিলাম; তৎপর শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভুর তাঁবুতে আসিয়া আহারাদি করিলাম, এবং তৎপর অন্যান্য সাধু ও সন্ন্যাসী দর্শন করিয়া ও নানা সৎপ্রসঙ্গে সেদিন অতিবাহিত করিলাম।

তৎপর দিবস প্রাতঃস্নান করিয়া আসিয়া শুনিলাম শ্রীযুক্ত

গোস্বামী প্রভু সশিষ্যে শ্রীযুক্ত দয়ালদাস স্বামীকে দর্শন করিতে যাইবেন। শ্রীযুক্ত দয়ালদাস স্বামী তাঁহার জমাত লইয়া ঝুসীর সংলগ্ন একটি বালি চরার উপরে আপন আসন স্থাপন করিয়াছিলেন; দিল্লীর এক শেঠ দাসের ন্যায় তাঁহার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; যত লোক স্বামীজির নিকট উপস্থিত হইতেন প্রত্যেককেই তিনি অতি পরিপাটিরূপে নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা উদর পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করাইতেন; শুনিয়াছি যে প্রত্যহ ৩।৪।৫ হইতে ১০ হাজার পর্য্যন্ত লোক তথায় আহার করিত। শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভু তাঁহার দর্শনে সশিষ্য যাইবেন শুনিয়া আমিও তথায় যাইব স্থির করিলাম। শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভুর তাঁবুতে বহু লোক (প্রায় ৬০।৭০ জন লোক) তৎকালে একত্র হইয়াছিলেন, সকলেই প্রাতে চা খাইতেন। অপর সকলে চা খাইয়া শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভুর সঙ্গেই তাঁবু হইতে নির্গত হইলেন। ঘটনাক্রমে কেবল তাঁহার শিষ্য শ্রীধর, অশ্বিনী এবং অভয় বাবু ও আমি চা খাওয়ার অপেক্ষায় তাঁবুতে রহিলাম। তখন আমাদের নিমিত্তও চা আসিল; এবং শ্রীধর চা খাইতে খাইতে বলিলেন "গোঁসাই এত শিষ্য করিয়াছেন আমার ভাল লাগে না, এখানে যেন এক হাট বসিয়াছে, সমস্ত দিন গোলমাল; এর চেয়ে বড় কাঠিয়া বাবাকে আমার ভাল লাগে; শুনিয়াছি তাঁহার গুরু বলিয়াছেন চারি চেলা করিবে; তিনিও তদনুসারে চারি দেশে চারি চেলা করিয়াছেন, আর চেলা করেন না।" শ্রীধরের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া আমি ইহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিলাম, তাঁহার

যে সময় সময় মাথা গরম হয় এবং তখন যাহা ইচ্ছা বকেন, তাহা আমি জানিতাম না। তাঁহার এই কথা সত্য মনে করিয়া আমি ভাবিলাম যে পূর্ব্বদিবস আমি যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম "যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজই বা সেই পুরুষ হইবেন, যিনি আমার গুরু হইয়া আমাকে কৃপা করিবেন" তাহা সত্য নহে ; কারণ শ্রীধর বলিলেন, তিনি আর চেলা করেন না। অতএব পূর্ব্বদিবসের চিন্তা কেবল বৃথা কল্পনা বলিয়া আমি অবধারণ করিলাম। তৎপর চা খাওয়া হইলে আমরা চারিজন সাধু-মণ্ডলীর পরিক্রমা করিয়া খ্যাতনামা সাধুদিগকে বিশেষরূপে অভিবাদন করিতে করিতে চলিলাম। প্রথমে ছোট কাঠিয়া বাবাজী নামক জনৈক সাধুকে অভিবাদন করিয়া তৎপর শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আসনের নিকট গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া যেমন তাঁহার আসন সমীপে বসিলাম, অমনি তিনি আপনা হইতে বলিয়া উঠিলেন "হমারা ত পাঁচ ছে চেলা হেয়। সুপাত্র হোনেসে অব্‌ভী চেলা করতেহেঁ।" এই কথা কোন প্রসঙ্গ বিনা তিনি বলাতে অল্পক্ষণ পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শ্রীধরের কথা প্রসঙ্গে আমার মনে যে ধারণা হইয়াছিল তাহা দূর করিবার জন্য ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাকেই বলা হইতেছে বলিয়া আমি ধারণা করিলাম। কিন্তু তখনও প্রকাশ করিয়া কাহাকেও কিছু বলিলাম না। কিয়ৎক্ষণ তথায় বসিয়া অপর সাধু সকলকে দর্শন করিতে করিতে শ্রীযুক্ত দয়ালদাস স্বামীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমি মোটে ৫।৬ দিবস প্রয়াগের মেলা স্থানে

ছিলাম ; কিন্তু প্রায় প্রত্যেক দিবসই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে গেলে এইরূপ কোন না কোন কথা তিনি বলিতেন, যাহাতে তাঁহার অন্তর্যামিত্ব আমার নিকট প্রকাশিত হইত, এবং যেন আমাকে তিনি কৃপা করিবেন বলিয়া এইরূপ পরিচয় দিতেছেন বলিয়া আমার ধারণা হইতে লাগিল। কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁহার কিম্বা অপর কাহারও নিকট আমি এই সকল ভাব প্রকাশ করিলাম না। পরে যে দিবস আমি মেলা হইতে চলিয়া আসিব, সেই দিবস তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গেলাম। যখন তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া আসিব, তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তুম্ চৈত্ মাহিনেমে বৃন্দাবনমে যায়কের হমকো ফের দর্শন দেনা।" আমি বলিলাম "মহারাজ! আমি ওকালতী কার্য্য করি, চৈত্রমাসে কোন দীর্ঘ ছুটী নাই, আমি কেমন করিয়া সেই সময় বৃন্দাবনে যাইব? তবে আপনি যদি আমাকে টানিয়া নেন, তবে আমি যাইতে পারি।" তিনি হাসিয়া বলিলেন "হাঁ, তুমকো মহাবীরজি জরুর লে যায়গা!" তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া, শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভুর অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া হরিনারায়ণ বাবু ও আমি পুনরায় কলিকাতায় আসিলাম। কিন্তু আমার মনে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইতেছিল তাহা আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিলাম না। এবং পূর্ব্বের দৈবপ্রাপ্ত মন্ত্রেরই সাধন আমার চলিতে লাগিল।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের কুম্ভের মেলা উপলক্ষে প্রয়াগে

বাস কালের দুই একটি প্রসঙ্গ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর কোন কোন শিষ্যের ও অপরের মুখে আমি শ্রবণ করিয়াছি। তাহার উল্লেখ এইস্থলে করিতেছি। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন যে তিনি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহা-রাজের নিকট এক দিবস গিয়া দেখিলেন যে গঙ্গা নাম্নী যে একটি গো সঙ্গে ছিল তাহার গায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার নিজের কম্বলখানি পরাইয়া দিয়াছেন। এবং নিজে বস্ত্রহীন শরীরে বসিয়া আছেন। প্রয়াগে মাঘ মাসে ত্রিবেণীর নদী-গর্ভস্থ বালুকাময় স্থানে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আসন ও সাধুদিগের জমাত পড়িয়াছিল। সুতরাং সেখানে অতিশয় শীত। এই শীতে তিনি আচ্ছাদনবিহীন হইয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবু বলিলেন—"বাবাজী মহারাজ! এই গাভীকে আপনার কম্বলখানি দিয়া নগ্নকায়ে বসিয়া আছেন কেন? পশুতো অমনিই থাকে। তাহাকে আপনার কম্বল দিয়া আপনি শীত ভোগ করিতেছেন কেন?" তিনি উত্তর করিলেন—"বাবা, এই স্থানে বড় শীত। ইহার শীতে বড় কষ্ট হইয়াছে, এ মৌনী, এ অপরকে কিছু বলিতে পারে না। সুতরাং আমাকে ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। আমার ধুনী আছে এবং গায়ে বিভূতি মাখা আছে, আমার শীত লাগে না।" মহেন্দ্র বাবু বলিলেন—"এতদূর (বৃন্দাবন) হইতে এই গোটিকে এখানে কেন আনিলেন? ইহাকে আশ্রমে রাখিয়া আসিলেই তো হইত।" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ

বলিলেন "আমি তো ইহাকে আনিতে চাহি নাই, আমি তো রেল গাড়ীতে বসিয়াই আসিতে পারিতাম ; কিন্তু এই গোটি আমাকে বলিল "বাবা, তুমি মেলায় চলিয়া যাইবে, আমাকে সঙ্গে করিয়া নিবে না ? তোমার সঙ্গে আমারও যাইতে বড় ইচ্ছা হইতেছে।" তাহাতেই আমি ইহাকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে এখানে আসিয়াছি। ইহাকে এখানে আনাতে আমার কিছু কষ্ট নাই।"

শ্রীযুক্ত অভয় বাবু বলিলেন যে ঐ মেলার সময় একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ! ধ্রুব ও প্রহ্লাদের মত অবস্থাপ্রাপ্ত ভক্ত কি এক্ষণকার কালে হয়?" তিনি বলিলেন "হাঁ হয়।" অভয় বাবু বলিলেন "এই মেলাস্থলে কি এমন কেহ আসিয়াছেন?" তিনি বলিলেন "হাঁ বহুত আয়া। উস্‌সে বড়া বড়া বি বহুত আয়া। বাকি কাঁহা আঁখ তোমরা দেখ্‌নে কো। হিঁয়া দেবলোক বি আওয়া হায় ; ভগবান্ আপ্‌নে সাথ সাথ রয়তে হেঁ।"

মেলা ভাঙ্গিয়া গেলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া গেলেন। আমি শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিতে যাইতেছি এই-মাত্র বন্ধুবর্গকে বলিয়া চৈত্র মাসের শেষ ভাগে শ্রীযুক্ত অভয় বাবুর সঙ্গে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহা-রাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। শ্রীযুক্ত গরীব দাসজী, শ্রীযুক্ত মৌনীজী, কল্যাণ দাস নামক রামানন্দী সম্প্রদায়ের সাধুটি

যাঁহার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তিনি, এবং পুষ্কর দাস নামক আর একজন সাধু তখন আশ্রমে ছিলেন। আমরা সন্ধ্যার পর আশ্রমে উপস্থিত হইলাম এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ও অপর সকলকে অভিবাদন করিলাম। শ্রীযুক্ত গরীবদাসজীর চেহারা দেখিয়া আমি তাঁহার প্রতি বড় শ্রদ্ধান্বিত হইলাম। যেন শান্তির সাগর বলিয়া তাঁহাকে আমার বোধ হইতে লাগিল। তিনি রাত্রে ডাল ও রুটি প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে ভোজন করাইলেন। আমরা প্রায় তিন সপ্তাহ কাল এইবার আশ্রমে ছিলাম। নিত্যই অতি উপাদেয় ডাল রুটি হইত। আমরা প্রীতিপূর্ব্বক প্রসাদ পাইতাম। ভাতের জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা আমাদের হইত না। সকলেই স্বহস্তে আপন আপন উচ্ছিষ্ট মোচন করিতেন, আমরাও আহারান্তে আপন আপন উচ্ছিষ্ট মোচন করিয়া উচ্ছিষ্ট থালা মাজিয়া পরিষ্কার করিতাম। তাহাতে আমাদের কোন কষ্ট বোধ হইত না। কিন্তু আহারাদি বিষয়ে কোন কষ্ট না হইলেও আশ্রমে থাকিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া আমি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলাম। তথায় যাইবার পূর্ব্বে আমি ভাবিয়াছিলাম যে হয়তো গিয়া দেখিব যে তিনি অধিকাংশ সময় সমাধিস্থই থাকেন; অথবা এইরূপ অন্য কোন অলৌকিক ভাবে থাকিয়া কালযাপন করেন; কিন্তু তথায় গিয়া দেখিলাম যে তিনি অতিশয় সাধারণ অপেক্ষাও সাধারণ লোকের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছেন। নিত্য নিজে প্রাতে বাজার করিতে যান এবং খুব দর করিয়া শাক তরকারী প্রভৃতি জিনিষ

পত্র বাছিয়া বাছিয়া খরিদ করেন। নিজে কাঁধে করিয়া তৎসমস্ত বাজার হইতে আশ্রমে লইয়া আসেন। অপর কোন চেলা দ্বারা জিনিস পত্র খরিদ করাইলে খুব কড়াকড়ি করিয়া তাহার হিসাব লয়েন। সেবাকুঞ্জের নিকট রাস্তার কিনারে সকালে বিকালে বসেন। যাত্রীক সকল এই রাস্তায়ই গমনাগমন করে। কেহ সিকি পয়সা, কেহ আধ পয়সা, কেহ বা একটি পয়সা তাঁহাকে ভিক্ষা দেয়। একটি সম্পূর্ণ পয়সা কোন যাত্রী দিলে তিনি বড় প্রসন্নভাব দেখান। ব্রজবাসী কেহ কেহ আসিয়া তাঁহার নিকট ঐ স্থানেই বসিয়া গাঁজা খায় এবং যাত্রীকে রাস্তায় যাইতে দেখিলে কখন কখন বলিয়া উঠে—"আরে ইয়ে দুধাধারী বাবা হ্যায়, এ খালি দুধ পিকের রয়তা হ্যায়; ইন্‌কো কুছ্ দেও।" যাত্রীদিগকে ব্রজবাসিগণ কখন এইরূপ আহ্বান করিলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া হাসিতে থাকেন। এইরূপে দুই বেলা কিছু পয়সা সংগ্রহ করিয়া আশ্রমে লইয়া আসেন এবং সেই পয়সা অতি যত্নে নিজের কাছে রাখেন। অপর কাহাকেও তাহা স্পর্শ করিতেও দেন না। যেন চুরি করিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কিত। সন্ধ্যার পর আশ্রমে বসিয়া যখন আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলেন তখনও ভগবৎ প্রসঙ্গ একবারও করেন না। জিনিস পত্রের মহার্ঘতা ইত্যাদির কথা, জল কোন্ স্থানে ভাল, কোন্ স্থানে মন্দ, ইত্যাদির কথা, কে ধনী কোন্ কালে তাঁহাকে টাকা দিয়াছে ইত্যাদির কথা, জয়পুরের রাজা আসিবে এবং আসিয়া অবশ্য তাঁহাকে নিত্য পাঁচ মুত্তির খোরাকের বন্দোবস্ত করিয়া দিবে, এবং ঐ রাজার

মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবার সময় তাঁহাকে অবশ্য অনেক অর্থ দিবে ইত্যাদির কথা লইয়া ব্রজবাসীদিগের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেন। কখনও বা সামান্য কারণে অথবা অকারণে রাগ করিয়া কোন শিষ্যকে চিম্‌টা দ্বারাই আঘাত করিলেন ; এবং নানাবিধ অশ্লীল কথা বলিয়া (যেমন তেরি মাকি...তেরি বহিনীকি··· ইত্যাদি বলিয়া) বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে গালি দিতে লাগিলেন। যে কেহ পয়সা দেয় তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ; অমুক ব্যক্তি কিছু দেয় না, সে কোন কর্ম্মের লোক নহে এই বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন ; এবং সাধারণতঃ অভয় বাবুর প্রতি খুব স্নেহ এবং আমার প্রতি কিছু কঠোর ও ভিন্ন ভাব দেখাইতে লাগিলেন।

অপর দিকে দেখিলাম আশ্রমটি নানাবিধ সর্পের আবাস ভূমি বলিলেই হয়। হনুমানজীর মূর্ত্তি একটি অতি ছোট কুঠরীতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাহার উভয় পার্শ্বেও ঐরূপ ছোট (হাত দুই মাত্র প্রশস্ত) আর দুইটি অন্ধকারময় চোর কুঠরী আছে ; তাহার নানা স্থানে গর্ত্ত এবং গোক্ষুর ও রক্তবংশী প্রভৃতি বৃহৎ সর্প সকল তাহাতে বাস করে। ঐ হনুমানজীর কুঠরী ও পার্শ্বস্থ দুইটি চোর কুঠরীর সম্মুখদিকে একটি অল্পায়তন বারান্দার মতন স্থানে আছে, তাহা প্রায় চারি হস্ত পরিসর, এবং প্রায় সাত আট হাত লম্বা ; তাহার একদিকে একখানা তক্তপোষ পাতা আছে, তাহার উপরে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শয়ন করেন। অতি দীর্ঘকায় রক্তবংশী সর্প একটি অনেক সময় আসিয়া হনুমানজীর আসনের উপর চড়িয়া বসিয়া

থাকে। এক লাঠির মাথায় বলের মতন করিয়া নেকড়া জড়াইয়া রাখা হইয়াছে। সেই লাঠি হাতে করিয়া তাহার নেকড়ায় আবৃত অগ্রভাগ দিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ঐ সর্পটির শরীর ঠেলিতে থাকেন এবং বলেন "আরে হট্ যা, হট্ যা।" তখন সেই সর্পটি হনুমানজীর আসন হইতে নামিয়া একটি গর্ত্তের ভিতরে প্রবিষ্ট হয়, এবং তিনি হনুমানজীর গায় সিঁন্দুর লেপিয়া মালা পরাইয়া দেন। এই সকল ভীষণ সাপের আবাসভূমি স্বরূপ গৃহে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ রাত্রে একক থাকেন। তাহাদের সহিত যেন তাঁহার সখ্য ভাব। আবার আশ্রমে যে সকল ছোট অথবা বড় গাছ কি লতা আছে, তিনি স্বয়ং ভোজন করিবার পূর্ব্বে একখানি খুরপা হাতে করিয়া প্রতিদিন তাহাদের প্রত্যেকের নিকট যান। কাহারো গোড়ার মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দেন, কাহারো গোড়ায় জল দেন, কাহারো গায় হাত বুলাইয়া আসেন। প্রতিদিন এইরূপ করেন। আর নিজের আহার্য্য রুটি হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া চড়ুই প্রভৃতি পাখীর জন্য এক জায়গায় নিক্ষেপ করেন এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ আসিয়া খাইতে আরম্ভ করে। তৎপরে নিজে আহার করেন। নিজে আহার করিয়া আবার আমাদিগকে ডাকিয়া আমাদের হাতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসাদ দেন।

একটি ছোট ঘোড়া তাঁহার ছিল। একদিবস সেই ঘোড়াটি যথাসময়ে আশ্রমে আসিল না। তাহার জন্য শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বৈশাখ মাসের দ্বিপ্রহর রৌদ্রের সময় মাঠে জঙ্গলে

ঘুরিয়া ঘুরিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাহার অন্বেষণ পাইলেন না। আশ্রমে আসিয়া বলিলেন—"আমার ঘোড়া চলিয়া গিয়াছে। বদ্‌মায়েসেরা কেহ লইয়া গিয়া থাকিবে। এখন কি করিব।" তখন পূর্ব্বোল্লিখিত তাঁহার ডাকাত চেলা গোঁসাইয়া আশ্রমে উপস্থিত ছিল। সে তাহার উভয় নাসিকার নিঃশ্বাস বেগের সহিত পরিত্যাগ করিয়া বলিল— "বাবাজী মহারাজ! কুচ্ চিন্তা মৎ কর ; তোমারা ঘোড়া আয় যায়গা।" তিনি বলিলেন "আয় যায় গা ?" সে বলিল "হাঁ মহারাজ, ঠিক আয় যায় গা।" তিনি যেন তাহাতে আশ্বস্ত হইলেন।

আর একটি ব্যবহার তাঁহার ছিল, তাহাও এইস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। খাদ্য যে কোন বস্তু হউক, অতি অল্প পরিমাণেও আশ্রমে আসিলে তাহা কণিকা কণিকা করিয়াও আশ্রমস্থ সকলকে বাঁটিয়া দিতেন। অধিক হইলে অধিক করিয়া দিতেন ; নিজে সর্ব্বশেষে এক কণিকা মাত্র গ্রহণ করিতেন।

একদিন সন্ধ্যার পর অভয় বাবু ও আমি ও কয়েকজন ব্রজবাসী আশ্রমে বসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সহিত কথোপকথন করিতেছি। তখন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কি একটি কথা বলিলেন (এক্ষণে তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না)। তাহাতে আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়া একটু জোরের সহিত উত্তর করিলাম। তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ হাত জোড় করিয়া যেন বালকের মত হইয়া বলিলেন "বাবা! হম্ বুড্‌ডা আদ্‌মি মূরখ্ হ্যায়, তোমারা বাল গোপাল ;

শাস্ত্রকা বাত নহি জান্তি হেঁ ; তুম্ সম্‌ঝায় দেও।”
আমি তখন অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিলাম।

তাঁহার এবম্বিধ চরিত্র দেখিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে প্রয়াগরাজ হইতে আমি যে ধারণা লইয়া গিয়াছিলাম, তৎসমস্ত তিরোহিত হইল। দিন দিনই নূতন নূতন কার্য্য দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যে ইনি অতি সাধারণ শ্রেণীর লোক। লেখাপড়াও বিশেষ জানেন না, বিশেষ কোন যোগৈশ্বর্য্যও ইঁহার নাই। গ্রামেও খুব প্রাচীন বৈষয়িক লোক যেরূপ থাকে, ইঁহার অবস্থাও আমি তদ্রূপই দেখিতেছি! কোন প্রকার পার্থক্য বোধ হইতেছে না। কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে আবার প্রয়াগে আমার নিজের সঙ্গেই যে সকল কথাবার্ত্তা তিনি বলিয়াছিলেন পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি, সেই সকল কথা মনে হইয়া ইঁহাকে তদ্রূপ সাধারণ লোক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেও সঙ্কুচিত হইতে লাগিলাম। একবার ভাবিলাম, প্রয়াগে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ আকস্মিক হইতে পারে। আবার ভাবিলাম যদি ইঁহার কোন প্রকার সাধন ঐশ্বর্য্য না থাকে, তবে সমস্ত সাধু-সম্প্রদায় ইঁহাকে এত সম্মান করিয়া অগ্রগণ্য করিয়া মেলায় স্নান করিতে গেলেন কেন! একবার মনে হইল যে ইনি বয়োবৃদ্ধ এবং ব্রজের মহন্ত পদ পাইয়াছেন, এই নিমিত্ত অপর সাধুগণ তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইয়া থাকিতে পারেন। আবার মনে হইল যে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছিলেন অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষ সাধুদিগের মধ্যে মেলাস্থলে আছেন, এবং বয়োবৃদ্ধও অনেক সাধু আছেন।

ইঁহারা কি কেবল ইঁহার বার্দ্ধক্য দেখিয়া ইঁহার এমন সম্মান করিতেন! এইরূপ নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক আমার মনে সর্ব্বদা চলিতে লাগিল, কিন্তু কাহারও নিকট তাহা কিছু প্রকাশ করিলাম না ; কেবল তাঁহার আচরণ সকল দেখিয়া যাইতে লাগিলাম, এবং মনে মনে তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলাম। অবশেষে শ্রীমদ্‌ভাগবতের কয়েকটি কথা একদিন হঠাৎ আমার স্মরণ হইল ; মনে হইল যে শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে লীলা করিতেছিলেন, তখন নানা অলৌকিক কার্য্য তিনি করিয়া থাকিলেও সে সকল কার্য্য এমন ভাবে করিতেন, যে কেহই তাঁহাকে সাধারণ বালক অপেক্ষা অধিক কিছু মনে করিত না। এমন কি ব্রহ্মাদি দেবগণও তাঁহার চরিত্রে মোহপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সামান্য মানব বলিয়া গণনা করিয়াছিলেন। পরে কেবল তাঁহার কৃপাতেই তাঁহাদের ভ্রান্তি দূরীভূত হয়। এই সকল শ্রীমদ্‌ভাগবতের কথা স্মরণ হইয়া আমার মনে হইল যে ইনি যদি তদ্রূপ ব্রহ্মবিৎ হইয়া ব্রহ্মরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন! তাহাও তো অসম্ভব নয়, তাহা হইলে অবশ্য ইঁহার কার্য্যকলাপ লোকের বিচারশক্তির অতীত হইতে পারে এবং সমস্ত কর্ম্মই লীলা মাত্র হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনরায় আশঙ্কা করিলাম যে ইনি এইরূপই হইয়াছেন ইহাই বা আমি কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করিতে পারি? আমার নিজের এমন চক্ষু নাই যে ইঁহার অবস্থা চিনিয়া লই। অবশ্য তিনি এইরূপ পুরুষ হইলে আমি যেরূপ সদ্‌গুরু চাই, ইনি তাহাই। কিন্তু আমি নিশ্চিতরূপে না জানিয়া কিরূপে ইঁহার নিকট আত্ম-

সমর্পণ করিতে পারি। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি অবশেষে স্থির করিলাম যে আমি বৃন্দাবন দেখিতে আসিয়াছি, বৃন্দাবনই এইবার দেখা হইল ; অন্য কোন মনের বিষয় কাহারও নিকট কিছু বলিব না। আর ইনি যদি তদ্রূপই পুরুষ হন, তবে আমার মনের এই সমস্ত চিন্তা ও সন্দেহ অবশ্যই জানিতেছেন ; এবং আমাকে যদি শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি নিজে নিজেই তাহা প্রকাশ করিবেন এবং আমার সন্দেহ যাহাতে দূর হয় তাহা করিবেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া আমি স্থির হইলাম।

ইহার দুই তিন দিবস পরে অভয় বাবুর ভ্রাতা হরিনারায়ণ বাবুর লিখিত এক পত্র আমার নিকট উপস্থিত হইল। আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকটেই বসিয়া আছি এমন সময়ে সেই পত্র খানা গেল। অভয় বাবু পোষ্টকার্ডে লিখিত সেই পত্র খানা পড়িয়া আমাকে দিলেন, আমি তাহা পড়িতে লাগিলাম। অভয় বাবুর নিকট কলিকাতা হইতে সর্ব্বদাই পত্র যায়, কিন্তু কোন পত্রের বিষয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কোন কথা কখনও জিজ্ঞাসা করেন না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পোষ্টকার্ড পত্রখানা আমি পড়িতে থাকিলে তিনি বলিলেন "ইস্‌মে ক্যা লিখা হ্যায় বাতাও।" এই পত্রে হরিনারায়ণ বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আমি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি কিনা। বাস্তবিক তৎপূর্ব্বে কিম্বা পরে আর কোন পত্র কখনও তিনি আমার নিকট লিখেন নাই ; এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী

মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে যে আমার কখনও ইচ্ছা হইয়াছে তাহাও আমি কখনও তাঁহার কিম্বা অপর কাহারও নিকট বলি নাই। কেন যে কেবল এই মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি আমাকে পত্র লিখিলেন তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু পত্রে কি লেখা আছে তদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলে আমি কি বলিব ভাবিতেছি এমন সময়ে শ্রীযুক্ত অভয় বাবু তাঁহাকে বলিলেন ইহাতে লেখা আছে "বাবুজী আপনার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা; আমার ভাই এই পত্র লিখিয়াছে।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন "হাঁ, উন্‌কো লিখ্ দেও কি ইন্‌কা দীক্‌ষা হাম্‌সে মিল গিয়া।" অভয় বাবুকে এই কথা বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "ইস্ বক্‌ত্ তোম্‌কো দীক্‌ষা নেহি দেয়েঙ্গে। তোমারি স্ত্রী কি সঙ্গ্ শ্রাবণ মাইনামে ফের হিঁয়া আইও, ওস্ বক্‌ত্ তুম্ দোনোকো এক সঙ্গ দীক্‌ষা দেয়েঙ্গে।" এই কথা শুনিয়া আমার চিন্তা দূর হইল। আমি মনে মনে বলিলাম আমার তো এই সময়ে দীক্ষা লইতে মতিই হয় নাই, এই সময়ে দীক্ষার কথা বারণ করিলেন ইহা ভালই হইল। ইঁহার প্রতি আমার সন্দেহ দূর হইলে পরে যেরূপ হয় দেখা যাইবে।

ইহার দুই তিন দিবস পরেই আমরা শ্রীবৃন্দাবন হইতে কলিকাতায় ফিরিলাম। আশ্রমে থাকাকালীন আমার প্রতি কিঞ্চিৎ কঠোর ভাবে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ব্যবহার করিতেন

ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু আশ্রম হইতে যখন বিদায় লইয়া আসি তখন তিনি আমার প্রতি একবার এমন ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন যে আমার সর্ব্বশরীর যেন মধুময় হইয়া গেল; এবং তাঁহাকে একমাত্র স্নেহ ও প্রেমেরই আধার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার দৃষ্টিতে আমার হৃদয়ে এক অদ্ভুত প্রেমের সঞ্চার হইল এবং কলিকাতা আসিয়া পৌঁছা পর্য্যন্ত ইহা আমার অন্তরে ক্রীড়া করিতে লাগিল। কিন্তু তৎপর দুই এক দিনের মধ্যেই ইহা পুনরায় তিরোহিত হইয়া গেল, এবং আমি পূর্ব্বের শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হইলাম।

শ্রীবৃন্দাবনে থাকা কালীন কথা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিয়াছিলেন যে সাধকের পক্ষে তিন চারিটি উপদেশ পালন করা অশেষবিধ কল্যাণকর যথা ঃ—

(১ম) চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে নিদ্রিত না থাকা।

এই উপদেশটির অনুকূলে সাধুদিগের উপদিষ্ট একটি গাথা আছে তাহাও বলিয়াছিলেন, যথা ঃ—

"পহেলা পহর মে সব কোই জাগে।"
"দোস্‌রা পহর মে ভোগী ॥"
"তিস্‌রা পহর মে তস্কর জাগে।"
"চৌথা পহর মে যোগী ॥"

(২য়) ভিতরসে কাম কর্‌ না, নিন্দা স্তুতি কো নেই দেখ্‌না।

আমি ইহার অর্থ এইরূপ বুঝিয়াছিলাম যে আপনার অন্তরে

ভাল মন্দ বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করিবে। কেবল বাহিরের নিন্দা-স্তুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিবে না।

(৩) সদা শুক্ল রহ্ না। ইহার অর্থ নিষ্পাপ ও নিষ্কপট হওয়া আমি বুঝিয়াছিলাম।

অন্যান্য কথাও বলিয়াছিলেন; এইস্থলে এই তিনটি কথারই বিশেষ উল্লেখ করিলাম।

আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া প্রথমোক্ত উপদেশটি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতে গিয়া দেখিলাম যে, অনভ্যাস বশতঃ তাহাতে অনেক সময়েই অকৃতকার্য্য হই, এবং যখন কৃতকার্য্য হই তখন মস্তিষ্ক গরম হইয়া উঠে ও আমার ওকালতী ব্যবসার কার্য্য করিতে কিঞ্চিৎ শারীরিক কষ্টও বোধ হয়। আমার শরীরের স্বভাবতঃ বায়ুপ্রধান ধাত। বহুবর্ষ পূর্ব্ব হইতে একদিনের জন্যও আমার সুনিদ্রা হয় নাই। পূর্ব্বে যোগী সম্প্রদায়ে থাকা কালে যে সকল প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া আগ্রহের সহিত সাধন করিতাম তাহাতে আমার শরীরে বায়ুর গতি এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতে আমার সুনিদ্রা একেবারে তিরোহিত হইয়াছিল। শেষ রাত্রে ঠাণ্ডার সময়ে একটু নিদ্রার শান্তি পাইতাম; কিন্তু তৎকালেও নানাবিধ স্বপ্ন মাত্র হইত। সুতরাং শেষ প্রহরে জাগরণের চেষ্টা করাতে অনেক সময় অকৃতকার্য্য হইতাম এবং কৃতকার্য্য হইলেও সারাদিন মস্তিষ্ক গরম থাকিত। কিন্তু চেষ্টা করিতে তথাপি ক্ষান্ত হইতাম না। এই অবস্থায় আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে আমার একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। ঘরের ভিতরে

জানালার ঠিক সংলগ্নস্থানে মশারি টাঙ্গাইয়া শয়ন করিয়া আছি, শেষরাত্রে নিদ্রাবেশ হইয়াছে। তখন একজন কেহ আমাকে 'উঠ' বলিয়া আমার উপরে একটি ছোট ঢিল ছুঁড়িয়া ফেলিল ; ঢিলটি আমার গায় আসিয়া পড়িল ; আমি তখনই উঠিলাম এবং ঢিলটি হাতে করিয়া লইলাম, কিন্তু জানালার বাহিরে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না ; আরও দেখিলাম যে মশারির কোন স্থানে কোন ছিদ্র হয় নাই। ইহাতে ঢিল কিরূপে মশারির ভিতরে আসিয়া আমার গায়ে পড়িল তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না ; খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

তৎপরে আর এক দিবস খোলা ছাদের উপর শুইয়া আছি, শেষরাত্রে অতি মৃদুস্বরে কেহ আমার নাম করিয়া দুই তিন বার ডাকিল। সেই মৃদুস্বরে ডাক শুনিয়া আমি উঠিয়া দেখিলাম চারিদিক নিস্তব্ধ, কোনও জনপ্রাণী কোন দিকে দৃষ্ট হইল না ; অবাক হইয়া চিন্তা করিতে করিতে ছাদে বেড়াইতে লাগিলাম।

এই সকল ঘটনার মূল কারণ কি তৎসম্বন্ধে আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমি যে দৈবপ্রাপ্ত মন্ত্র পূর্ব্বে জপ করিতাম, তাহাই তখনও জপ করিতাম। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের প্রতি আমার আস্থা যে জন্মে নাই, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রাবণ মাসে যাইয়া দীক্ষা লইতে যে তিনি বলিয়াছিলেন তাহা আমার স্মরণ ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতি আমার বিশ্বাস জন্মে নাই ; সুতরাং সেই বাক্যে আমার কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। এবং শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়া বিষয়েও তখন আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না। আমি মনের কষ্টেতেই

—কবে ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইব, এই চিন্তাতেই দিনপাত করিতেছিলাম। দিনের বেলায় ব্যবসায় কর্ম্ম করিতাম, কিন্তু সন্ধ্যার পর আর তৎসংক্রান্ত কোন কর্ম্ম করিতাম না, এই বিষয়ের চিন্তাতেই আমার সময় যাইত। বোধ করি তন্নিমিত্তই ভগবান্ আমার প্রতি দয়াদ্র হইলেন এবং আমার সংশয় দূর করিবার নিমিত্ত আমার অভাবনীয় রূপেই উপায় সৃষ্টি করিলেন। আষাঢ় মাসের শেষভাগে আমি পূর্ব্বোক্তরূপে এক দিবস ছাদের উপর শুইয়া আছি ; শেষরাত্রে হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া বসিলাম এবং বসিবামাত্র দেখিলাম যেন আকাশ ভেদ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি আমার সম্মুখে ছাদের উপর আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং আমাকে আশ্বস্ত করিয়া তখনই একটি মন্ত্র আমার কর্ণকুহরে উপদেশ করিলেন। মন্ত্রোপদেশ করিয়া তিনি আকাশপথে উড্ডীন হইয়া ক্ষণকাল মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। আমাকে ঐ ছাদের উপরে এইরূপে দীক্ষা দিয়া যখন তিনি যান, তখন সেইস্থানে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুরও মূর্ত্তি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অন্তর্হিত হইলে আমি অনুভব করিতে লাগিলাম যেন আমার অন্তরের প্রত্যেক স্তরে স্তরে তাঁহার প্রদত্ত মন্ত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল সংশয় আমার ছিল তৎসমস্ত তখন একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি বোধ করিতে লাগিলাম যে সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার জীবন ধন্য হইল এবং আমি অভিলষিত সদ্‌গুরু লাভ

করিলাম। শ্রীবৃন্দাবনে চৈত্র বৈশাখ মাসে গেলে বাবাজী মহারাজের চরিত্র দর্শনে যে সকল সন্দেহ আমার উপস্থিত হইয়াছিল, তৎসমস্ত মুহূর্ত্তমধ্যে তিরোহিত হইল, তাঁহাকে পূর্ণজ্ঞ ব্রহ্মর্ষি বলিয়া আমি বোধ করিতে লাগিলাম।

অতঃপর শ্রাবণ মাসের শেষভাগে আমার স্ত্রী ও একটি বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও শ্রীযুক্ত অভয় বাবুর সমভিব্যাহারে আমি প্রসন্নচিত্তে বৃন্দাবনে গেলাম। এবং আশ্রমে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে অভিবাদন করিলাম। তিনি তখন আমাকে বলিলেন যে ভাদ্র মাসের জন্মাষ্টমী তিথিতে আমি এবং আমার স্ত্রী উভয়কে তিনি দীক্ষা দিবেন। তখন জন্মাষ্টমীর ৮৷১০ দিন বাকী ছিল। এই যে কয়দিন আশ্রমে রহিলাম, তখনও শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সাধারণ আচার ব্যবহার ঠিক পূর্ব্ববৎই দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু এক্ষণে আর সেই সকল আচরণ আমার সংশয় জন্মাইতে পারিল না। আমি মনে করিতে লাগিলাম ইহা তাঁহার লীলা মাত্র, আমার বুদ্ধির গম্য নহে। যিনি এখানে থাকিয়াও সহস্র মাইল দূরস্থিত কলিকাতায় আমাকে দৃষ্টি করিতে সমর্থ এবং তথায় উপস্থিত হইয়া আমাকে প্রবোধিত ও দীক্ষিত করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই আমাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন, এবং তাঁহার নিকট আমার আত্মসমর্পণ করিতে দ্বিধা করিবার কোন কারণ নাই। এইরূপ ভাবিয়া আমি পুনরায় দীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত রহিলাম; কিন্তু তথাপি তাঁহাকে জানাইলাম যে পূর্ব্বে কলিকাতায় ছাদের উপর অবস্থিত হইয়া যখন দীক্ষা দিয়াছেন তখন আর পুনরায়

দীক্ষার প্রয়োজন কি? তিনি বলিলেন "হাঁ, পুনরায় দীক্ষা দিব।" আমি তাহাতে পুনরায় দীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী, অভয় বাবু ও আমার নিকট বলিলেন যে তাঁহার একবার দীক্ষা দেশস্থ গুরুর নিকট হইয়াছে, সেই মন্ত্র তাঁহার অতিশয় প্রিয়, সুতরাং তিনি পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। তাহাতে শ্রীযুক্ত অভয় বাবু তাঁহাকে প্রতিদিনই সদ্গুরু হইতে দীক্ষার মাহাত্ম্য বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। জন্মাষ্টমীর পূর্ব্বরাত্রেও অভয় বাবুর সহিত তাঁহার কথোপকথন হইল; তিনি বলিলেন, অনেক দিন তিনি তাঁহার প্রাপ্ত মন্ত্র রটন করিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহার অতিশয় প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে। তিনি সেই মন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন মন্ত্র জপ করিবেন না। আমি তাহাকে এই বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিতাম না; কারণ আমার ধারণা হইয়াছিল যে যখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিয়াছেন জন্মাষ্টমীর দিনে আমার সহিত এক সঙ্গে তাঁহার দীক্ষা দিবেন, তখন যেরূপেই হউক স্ত্রীর দীক্ষা হইবে।

অতঃপর জন্মাষ্টমীর দিবস প্রাতে আমরা সকলে শৌচ ও স্নানাদি করিয়া আসিলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আমাকে বলিলেন, বাজার হইতে নূতন বস্ত্র, তুলসী কাষ্ঠের মাল্য, এবং গোপী চন্দন আনিতে হইবে; অদ্য তোমাদের দীক্ষা হইবে। আমি এই কথা শুনিয়া স্ত্রীর নিকট হইতে টাকা আনিতে ঘরে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বলিলেন "তোমার সঙ্গে আমিও দীক্ষা গ্রহণ করিব। আমার জন্যও কাপড় এবং মালা

আনিবে।” আমি হাসিয়া বলিলাম “তুমি না বলিয়াছিলে আর দীক্ষা গ্রহণ করিবে না ?” তিনি বলিলেন “আমার পুনরায় তো দীক্ষা নিবার ইচ্ছা ছিল না সত্য, কিন্তু আজ প্রাতঃকাল হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কেমন এক আবেগ আমার ভিতর হইতে আসিয়াছে। তুমি যখন দীক্ষা গ্রহণ করিবে, তখন আমিও গ্রহণ করিব।”

তখন আমি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের মহিমা চিন্তা করিতে করিতে বাজারে গেলাম এবং একজোড়া নূতন বস্ত্র, দুইটি তুলসী কাষ্ঠের মালা এবং কিছু গোপী চন্দন লইয়া আশ্রমে আসিলাম। পরে পূর্ব্বাহ্নেই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আমাকে দীক্ষা দান করিলেন। প্রথমে একটি মন্ত্র আমার কর্ণকুহরে তিনবার উচ্চারণ করিয়া বলিলেন এই মন্ত্র সচরাচর জপ করিবে। পায়ে জুতা রাখিয়া কখনও ইহা জপিবে না। এই মন্ত্র আমাকে অর্পণ করিয়া পুনরায় আর একটি মন্ত্র, যাহা পূর্ব্বে কলিকাতায় ছাদের উপর আবির্ভূত হইয়া আমাকে দিয়াছিলেন বলিয়াছি, সেই মন্ত্রটি পুনরায় আমার কর্ণকুহরে উচ্চারণ করিয়া উপদেশ করিলেন। কিন্তু এই মন্ত্র সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া দিলেন যে “ইহার জপ করিতে হইবে না, ইহা কালক্রমে আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিবে ; ইহার জপ আপনা হইতেই হয়, করিতে হয় না।” আমার দীক্ষার পর আমার স্ত্রীকেও দীক্ষা দিলেন, কিন্তু আমার উভয় মন্ত্র হইতে তাঁহার মন্ত্র পৃথক্। আমার সাক্ষাতেই তাঁহার দীক্ষা হইল। এইরূপে আমরা স্বামী স্ত্রী উভয়ে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের কৃপালাভ করিয়াছি।

ইহা ১৩০১ বাঙ্গালা সালের ভাদ্র মাসের জন্মাষ্টমী তিথিতে। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের চরিত্র মাহাত্ম্য ইহা দ্বারা অনেক পরিমাণে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমার নিজ জীবন সম্বন্ধে এতগুলি কথা এইস্থলে উল্লেখ করিলাম।

জন্মাষ্টমী হইতে তৃতীয় দিবসে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ব্রজের বন-পরিক্রমায় আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া গমন করিলেন। শ্রীযুক্ত পুষ্করদাস, এবং কল্যাণদাস এই দুইজন সাধুও এবং পূর্ব্বোক্ত গঙ্গা নাম্নী গাভীটি আশ্রম হইতে বাবাজী মহারাজের সঙ্গে চলিলেন। সেইবার ব্রজধামে অতিশয় বৃষ্টি হইয়াছিল; প্রায় প্রতিদিনই খুব বৃষ্টি হইত। রাস্তায় জল এবং পাঁক প্রায় অধিকাংশ স্থানেই ছিল। একটি স্থানে আমার মনে আছে, কিছুদূর পর্য্যন্ত চলিবার সময় হাঁটু পর্য্যন্ত পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া যাইত। আমাদের ব্যবহারের জন্য শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একটি ছোট তাঁবু দিয়াছিলেন। আমরা প্রত্যেক দিনের গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া খোঁটা পুঁতিয়া তাঁবু টাঙ্গাইতাম এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের থাকিবার জন্য তাঁহার বড় ছাতা মাটিতে বসাইয়া দিতাম। ঐ তাঁবুর ও ছাতের চতুর্দ্দিকে প্রায় তিন পোয়া হাত গভীর করিয়া খালের মতন খাদ খনন করিয়া লইতাম; নতুবা বৃষ্টির জল বাহির হইতে আসিয়া তাঁবু ও ছাতার ভিতর প্রবেশ করিত এবং সমস্ত স্থান কাদাময় হইয়া যাইত। আমরা যে কয়জন কলিকাতা হইতে গিয়াছিলাম বলিয়াছি, তাহারা তাঁবুর ভিতরে এক এক জন এক এক চাটাই ও এক একখানা কম্বল বিছাইয়া আপন আপন আসন

করিতাম। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজেরও আসন বড় ছাতার নীচে স্থাপিত হইত। পুষ্করদাস এবং কল্যাণদাস অপর ছোট একটি ছাতার নীচে আসন লাগাইত।

কোন দিন তিন ক্রোশ, কোন দিন চারি ক্রোশ, কোন দিন পাঁচ ক্রোশ পথ চলিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে, তথায় প্রথমে ঐ সকল তাঁবু প্রভৃতি টাঙ্গাইতে হইত। একখানা গরুর গাড়ী আমাদের সঙ্গে ছিল। সেই গাড়ীতে আমাদের সমস্ত জিনিস-পত্র থাকিত। তাহাতেই তাহা বোঝাই হইয়া গিয়াছিল। তিনটি বয়েল তাহা টানিত; কিন্তু রাস্তা অতিশয় পঙ্কিল থাকায় এই তিনটি বয়েলের পক্ষেও গাড়ী টানিয়া নেওয়া কষ্টকর হইত। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে আমরা তাঁবু প্রভৃতি স্থাপিত করিবার পর শুষ্ক কাষ্ঠ অন্বেষণে সাধুরা যাইতেন। তাঁহারা যে গাছে শুষ্ক কাষ্ঠ দেখিতেন সেই গাছ হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ কুঠার দ্বারা কাটিয়া লইয়া আসিতেন; এবং কাণ্ডা (বড় বড় ঘুঁটে) গ্রামবাসীর ঘর হইতে লইয়া আসিতেন।

এই ব্রজ-পরিক্রমার একটি বিশেষ রীতি এই স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। এই রীতি শ্রীযুক্ত নাগাজী মহারাজের সময় হইতে ব্রজধামে প্রচলিত হইয়াছে। ব্রজের অন্তর্গত 'পায়গাম' নামক স্থান শ্রীযুক্ত নাগাজী মহারাজের জন্মস্থান। তিনি সাধু হইয়া বর্ষাণার নিকটবর্ত্তী তিনদিকে উচ্চ পাহাড় শ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত এক সমতল উপত্যকায় থাকিয়া অতি কঠোর সাধন অবলম্বন করেন। ঐ উপত্যকার নাম 'কদম খণ্ডী'। নাগাজীর

সময় হইতে ইহা 'নাগাজীর কদম খণ্ডী' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই কদম খণ্ডীতে বহু বৎসর কঠোর সাধন করিলেও যখন তিনি ভগবৎ দর্শন লাভ করিতে পারিলেন না, তখন অভিমান করিয়া ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন মনস্থে এক হস্তে আপন কমণ্ডলু ও অন্য হস্তে আপন চিম্‌টা লইয়া তিনি প্রস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদের স্বভাবতঃ সখ্যভাব, এবং নাগাজীরও তাঁহার প্রতি সেই ভাবই ছিল। সুতরাং বহুদিন তপস্যার পরও যখন ভগবৎদর্শন লাভ হইল না, তখন তিনি এইরূপ মনে করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই ভূমিতে সিদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং এই ভূমিতে অপর কাহাকেও সিদ্ধ হইতে দিবে না। অতএব "আমি তাঁহার ধাম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া তপস্যা করিব। দেখি সে আমাকে অন্যত্র কিরূপে বাধা দেয়।" সখার প্রতি এইরূপ অভিমান করিয়া নাগাজী চিম্‌টা ও কমণ্ডলু হস্তে কয়েক পদ গমন করিলে এক কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষের নিম্নদেশ দিয়া যাইবার সময় তাঁহার বৃহৎ জটা সকল সেই কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষের কণ্টকে চতুর্দ্দিক হইতে এমন ভাবে আবদ্ধ হইল যে তাহাতে তাঁহার গতি রুদ্ধ হইল। তিনি তাহাতে আরও অভিমান করিয়া ভাবিলেন "ইহা সেই শঠেরই চাতুরী! আমি এই স্থান হইতে যাইতেছি, তাহাতেও সে কণ্টকের দ্বারা আমার জটাসকল বিদ্ধ করিয়া আমার গতিরোধ করিল। আচ্ছা, আমি এই কণ্টকবিদ্ধাবস্থায়ই থাকিব। দেখি সে আমাকে কি করিতে পারে।" এইরূপে অভিমানে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া শ্রীমান্ নাগাজী চিম্‌টা কমণ্ডলু হস্তে

সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই অবস্থায় একদিনের পর অপর দিন করিয়া তিন দিন তিন রাত্রি তাহার সেই স্থানে অতিবাহিত হইল। পরে চতুর্থ দিবসে ভক্তবৎসল ভগবান্ চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দুই হস্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং অপর দুই হস্তে কণ্টকজাল হইতে তাঁহার জটাসকলকে উদ্ধার করিলেন; বলিলেন "নাগাজী, তুমি এই স্থানে থাক। তুমি সিদ্ধ হইয়াছ। আমি তোমার সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করিব।" শ্রীমান্ নাগাজী ভগবৎদর্শন ও আলিঙ্গন লাভ করিয়া বিগতশোকমোহ হইলেন, এবং ভগবানের বহুবিধ স্তুতি করিলেন। তখন ভগবান্ পুনরায় তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে নাগাজী বলিলেন "তুমি যদি নিতান্তই আমাকে বর দিবে, তবে এই ব্রজধামের 'আধা পুত (পুত্র) আধা দুধ' আমাকে অর্পণ কর। অর্থাৎ ব্রজের লোকের ঘরে যে সকল পুত্র জন্মিবে তাহাদের বংশ রক্ষার্থ অর্দ্ধেক গৃহস্থ থাকিবে, অবশিষ্ট অর্দ্ধেক সাধু হইয়া নাগাজীর সমাজ (সাধু সমাজ) বৃদ্ধি করিবে; এবং ব্রজের গৃহে গৃহে যে দুগ্ধ প্রত্যহ গাভী সকল ক্ষরণ করিবে, তাহার অর্দ্ধভাগ সাধুদিগের স্বত্ব হইবে। এই অর্দ্ধভাগ সাধুগণ যদৃচ্ছাক্রমে লইয়া উদর পরিতৃপ্ত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ভজন করিবে।" নাগাজী এই বর প্রার্থনা করিলে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে তাহাই অর্পণ করিলেন। পরে নাগাজী বলিলেন "তুমি যে আমাকে এইরূপ বর দান করিলে তাহা লোকে বিশ্বাস করিবে কেন?" তাহাতে ভগবান্ বলিলেন "আমি স্বয়ং তোমার বর প্রতিফলিত করিব। তুমি ব্রজের গ্রামে

গ্রামে বিচরণ করিতে থাক, আমি তোমার চেলা হইয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইব এবং সর্ব্বত্র তোমার এই বর প্রচার করিয়া অর্দ্ধেক দুধ লুটিয়া আনিয়া দিব।” তখন গুরু নাগাজী এবং চেলা ভগবান্ ব্রজের গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চেলা সর্ব্বত্রই নাগাজীর এই বর প্রচার করিতে লাগিলেন এবং যদৃচ্ছাক্রমে গৃহস্থদিগের গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া অর্দ্ধেক দুধ কাড়িয়া লইতে লাগিলেন। যাহারা দুধ লইতে বিশেষ বাধা দিল, তাহাদের সমস্ত দুধ তৎক্ষণাৎ পোকাময় হইয়া যাইতে লাগিল এবং কাহারো বা গরু, অথবা মহিষ, অথবা বাছুর তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাইতে লাগিল। ব্রজবাসিগণ এই সকল ঘটনা দেখিয়া এবং গুরু চেলা উভয়ের তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নাগাজীর বর যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিল; এবং আনন্দের সহিত আপনাদিগের পুত্র সকলের মধ্যে অর্দ্ধেক সংখ্যক লইয়া শ্রীমান্ নাগাজীকে চেলারূপে অর্পণ করিতে লাগিল। এইরূপে অল্পকাল মধ্যেই নাগাজীর বর ব্রজমণ্ডলে প্রচার করিয়া ভগবান্ নাগাজীকে কৃতার্থ করতঃ অন্তর্হিত হইলেন। নাগাজীর বহু চেলা হইল এবং ব্রজধামে সাধুশ্রেণীর দ্বারা পরিশোভিত হইল। অদ্যাপি ব্রজধামে নাগাজীর এই বরের প্রভাব তিরোহিত হয় নাই। অদ্যাপি দুইটি পুত্র জন্মিলে ব্রজের পিতা মাতা অনেক স্থলে একটিকে বালক কালেই স্বয়ং আনিয়া কোন না কোন সাধুর চেলা করিয়া দেন; না দিলে বালক অনেক সময় আপনা হইতেই পলায়ন করিয়া গিয়া সাধুর চেলা হয়। দুধ সম্বন্ধেও নাগাজীর বরের মাহাত্ম্য এযাবৎ

লুপ্ত হয় নাই। পরিক্রমার সময় আমরা দেখিয়াছি সাধু সকল কেহ কমণ্ডলু, কেহ ঘটি, কেহ কলসী, কেহ বৃহৎ পিতলের চপটা (ডেক্‌চি) ইত্যাদি লইয়া রাস্তায় চলিতে চলিতে যে সকল গ্রাম পাওয়া যায় তাহার কোন গ্রামে একদল অপর গ্রামে অপর দল প্রবিষ্ট হইয়া ব্রজবাসীর ঘর হইতে স্বহস্তে দুগ্ধ-ভাণ্ডের দুধ ঢালিয়া লইয়া আসেন। কিরূপে এই দুধ লুটের লীলা তাঁহারা করিয়া থাকেন, তাহা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

নাগা সাধু একটি হাঁড়ি হস্তে এক গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। গৃহের উঠানে একটি নিমগাছ তলায় (ব্রজের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই নিম গাছ আছে) এক খাটিয়ার উপরে বসিয়া গুড়গুড়িতে গৃহস্বামী তামাক খাইতেছেন। দুগ্ধ লইবার ভাণ্ড হস্তে নাগা সাধুকে আসিতে দেখিয়া গৃহস্বামী হাসিয়া উচ্চৈঃস্বরে গৃহাভ্যন্তরস্থ তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন "নাগা দুধ লুটিতে আসিয়াছে।" অমনি গৃহস্বামিনী কোমরে আচল বাঁধিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। নাগা কোন একটি বাক্য ব্যয় না করিয়া তখনই গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং প্রবেশ করিয়াই দুগ্ধ-ভাণ্ড হস্ত দ্বারা ধারণ করিলেন। ব্রজ গোপী অমনি তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন এবং উভয়ে পরস্পরের বল পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। গৃহস্বামী উঠানে খাটের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছেন এবং হাসিতে হাসিতে দেখিতেছেন, কাহার জিত কাহার হার হয়। অবশেষে সাধু জয়ী হইলে তিনি গোপীকে হটাইয়া দিয়া জোর করিয়া দুগ্ধ-ভাণ্ডের অর্দ্ধেক দুধ

নিজ হাঁড়িতে ঢালিয়া লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নাগা জিনিয়াছে দেখিয়া গৃহস্বামী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন "বাহা নাগা, তোমরা লেঙ্গোটা সাচ্চা হ্যায়। দুধ লেকের খুব পিও।" নাগা সাধুরা প্রায় এইরূপ স্থলে জয়লাভই করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহারা যথার্থই এ যাবৎ অধিকাংশই বীর্য্যধারণক্ষম, এবং মৈথুন ব্যাপার হইতে বিরত, সুতরাং শক্তিশালী। কিন্তু ব্রজে বহু পালোয়ান স্ত্রীলোকও আছেন। তাঁহারা বড় বড় পালোয়ানের বল ধারণ করেন। এইরূপ স্থলে নাগারা কখন কখন হারিয়াও যান। যে স্থানে এইরূপ স্ত্রীলোক আছে জানেন, সেই স্থানে সাধুদিগের মধ্যেও যাঁহারা খুব পালোয়ান তাঁহারাও গিয়া থাকেন। আমি কোন কোন প্রাচীন সাধুদিগের মুখে শুনিয়াছি যে এক গ্রামে পূর্ব্বে এক গোপী এত বলিষ্ঠা ছিলেন যে কোন পালোয়ান তাঁহাকে কুস্তীতে হটাইতে পারিত না। সেই পালোয়ানী গোপীর বাড়ীতে কেবল শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ নিজে গিয়া তাঁহাকে হটাইয়া দুধ লুটিয়া আনিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি গেলেই আর সে বাধা দিত না। পরিচিত যথার্থ সাধু গেলে ব্রজ গোপীরা কোন সময় আমোদ করিয়া কুস্তী বাধাইত, নতুবা বিনা বাধায় তাহাদিগকে দুধ লইয়া যাইতে দিত। একজন অৰ্দ্ধেক দুধ লইয়া যাইবার পর অধর্ম্ম পূর্ব্বক অপর একজন পুনরায় দুধ লইতে উদ্যত হইলে এবং কোন কোন স্থলে প্রথম নিবারণ সময়েই যথার্থ ঝগড়াও উপস্থিত হইত সন্দেহ নাই। ঘরে শিশু অথবা রুগ্নের নিমিত্ত দুধের বিশেষ প্রয়োজন থাকিলে গোপীরা তাহা

উল্লেখ করিয়া সাধুদিগকে বারণ করিলে না মানিয়া সাধু দুধ লুটিতে চাহিলে সত্য সত্যই ঝগড়া ও মারামারি অনেক স্থলে হইত। কিন্তু সাধারণতঃ দুধ লুটের লীলা এইরূপেই হইতে আমরা প্রথম বৎসর দেখিয়াছি। পরে অনেকবার শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গে এইরূপ পরিক্রমায় গিয়াছি। মধ্যে এক বৎসর বাদ দিয়া অপর বৎসর সস্ত্রীক আমি পরিক্রমায় যাইতাম। এইরূপ বহুবার পরিক্রমায় গিয়াছি। কিন্তু প্রথম দুই একবার যেরূপ সাধু মেল ও আনন্দ দেখিয়াছি, পরবর্ত্তী সময়ে ক্রমশঃই তাহার হীনতা দর্শন করিয়াছি। ব্রজের সাধুদিগের দুধ লুটের ব্যাপার বর্ণনা করিলাম। পরিক্রমার সময় প্রত্যেক দিন নির্দ্দিষ্ট বিশ্রাম স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁবু প্রভৃতি স্থাপন করিতে করিতেই সাধুসকল দুধ লইয়া উপস্থিত হইতেন এবং আমরা সকলে দুধ খাইয়া লইতাম। কখন বা রাস্তায় চলিতে চলিতেই কোন সাধু দুধ লুটিয়া আনিয়া খাওয়াইয়া দিতেন। প্রথম দুই একবার পরিক্রমাতে এইরূপ হয়। তৎপরে আর দুধ এইরূপ সর্ব্বদা পাওয়া যাইত না। ব্রজে অকাল পড়াও ইহার একটি কারণ।

আমাদের প্রথম বারের পরিক্রমার দুই একটি বিশেষ ঘটনাও এই স্থলে উল্লেখ করিতেছি। তদ্দারাও শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের চরিত্র কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বর্ষাণার অনেক দূরে কদমখণ্ডী নামক স্থানে শ্রীমন্ নাগাজী মহারাজ ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়া সিদ্ধমনোরথ হয়েন, সেই কদমখণ্ডী এইক্ষণে নাগাজীর কদমখণ্ডী

নামে বিখ্যাত। শ্রীমন্ নাগাজী মহারাজ মানবলীলা সম্বরণ করিলে এই স্থানেই তাঁহার দেহের সমাধি হয়। জন্মাষ্টমীর পর শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে ঐ কদমখণ্ডীতে সমস্ত সাধুমণ্ডলী আসন স্থাপন করেন, এবং ব্রজমণ্ডল হইতে ব্রজবাসিগণ সমাগত হয়েন; সেই দিবস সেইখানে বৃহৎ মেলা হয়, এবং রাসধারিগণ আসিয়া রাসলীলা করিয়া থাকেন। ব্রজবাসিগণ সেইস্থানে মালপোওয়ার ভোগ সেই দিন দিয়া থাকেন, এবং সাধুগণ মাল-পোওয়ার প্রসাদ পাইয়া থাকেন, সেই দিবসটি নৃত্য গীত ও আনন্দে কাটিয়া যায়। পর দিবস তথা হইতে সাধুমণ্ডলীর আসন উঠিয়া যায়, এবং তিন ক্রোশ ব্যবধানে কাম্যক্বনের গয়াকুণ্ড নামক কুণ্ডের উপরে গিয়া সকলে অবস্থান করেন। কদমখণ্ডী ও কামবনের (কাম্যক্বনের) মধ্যবর্ত্তী স্থানে নিম্ন-ভূমি আছে। এই স্থানে প্রায় প্রতিবৎসর কিছু জল কাদা আমরা পাইয়াছি। আমাদের প্রথম পরিক্রমার বৎসর অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে সেই স্থানে এত অধিক জল হইয়াছিল যে আমা-দের শকট লইয়া সেই স্থান অতিক্রম করিয়া যাওয়া অসাধ্য বলিয়া সকলে অবধারণ করিলাম, অতএব শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন যে তিনি ঐ রাস্তায় যাইবেন না, এবং গয়াকুণ্ড ও মোহরাণার রাস্তায় না গিয়া বিঠোরা ও খটাবটের রাস্তায় গিয়া জমাতের সঙ্গে মিলিবেন। আর ইহা অবধারিত হইল যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সাধক চেলা মহন্ত শ্রীযুক্ত তিলকদাসজীর সঙ্গে সাধু জমাত গয়াকুণ্ডে যাইবেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিমিত্ত রসুই শ্রীযুক্ত পুষ্করদাসজী

করিতেন, কিন্তু তিনি বলিলেন যে তিলকদাসজীর সঙ্গে তিনি গয়াকুণ্ডে যাইবেন। আমি ভাবিলাম যে পুষ্করদাসজী চলিয়া গেলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের রসুইয়ের কষ্ট হইবে। এইজন্য মেলা ভাঙ্গিয়া যাইবার পর সায়ংকালীন আরতি হইয়া গেলে আমি শ্রীযুক্ত অভয় বাবু ও পুষ্করদাসজীকে সঙ্গে লইয়া সাধুদিগের জমাত হইতে কিঞ্চিৎ দূরে এক পাহাড়ের মধ্যে এক নিভৃত স্থানে গমন করিয়া পুষ্করদাসজীকে নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলাম যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ন্যায় মহাপুরুষের সেবা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অন্যত্র যাওয়া উচিত নহে। তিনি বলিলেন, "তিনি প্রায় বিশ বৎসর কাল যাবৎ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গে আছেন, তিনি এই পর্য্যন্ত তাঁহার সিদ্ধাই দেখিয়াছেন ও জানেন যে তিনি কামজিৎ পুরুষ, কামরিপুকে তিনি সম্যক্ জয় করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ক্রোধ এবং ধনলোভ মিটে নাই, এই উভয়টিই তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে আছে।" আমি বলিলাম "আচ্ছা, আপনি বলিতেছেন তাঁহার খুব ক্রোধ আছে, এবং সর্ব্বদা সকলের সঙ্গে ঝগড়া করেন; কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ক্রোধী ব্যক্তির লক্ষণ কি? আপনি বলুন। যদি কাহার প্রতি আপনার ক্রোধ হয় ও কাহার সহিত ঝগড়া করেন তবে ঝগড়ার পর তাহার প্রতি আপনার কিরূপ বুদ্ধি থাকে? তাহার প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি অন্ততঃ কিছুকাল পর্য্যন্ত থাকে না কি? ঝগড়ার পরেই তাহার সহিত পূর্ব্ববৎ সরলভাবে মিশিতে ও হাস্য কৌতুক করিতে পারেন কি?" তিনি বলিলেন "না, অন্ততঃ

কিছুকাল পর্য্যন্ত তাহার প্রতি মনোমালিন্য থাকে।” তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “আচ্ছা, আপনি বিশ বৎসর বাবাজী মহারাজের সঙ্গ করিয়াছেন, আপনি সত্য বলিয়া বলুন ঝগড়ার পরেও কাহার প্রতি তাঁহার এইরূপ মনোমালিন্য থাকা দেখিয়াছেন কি-না ?” তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন “ভাই ! আমি তাঁহার প্রতি মিথ্যা কথা বলিব না, আমি এইরূপ কখন দেখি নাই ; এই মুহূর্ত্তে তিনি “মাকি *” “তেরি * * *” ইত্যাদি অশ্লীল বাক্য বলিয়া গালাগালি করিলেন, হয়ত লাঠি নিয়া তাহাকে মারিতে গেলেন, সে হয়ত তাঁহাকে গালাগালি করিল। আবার পরক্ষণেই বালকের মত তাহার সহিত বসিয়া হাস্য-কৌতুকাদি করিতে লাগিলেন এবং নানা গল্প বলিয়া আমোদ-প্রমোদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন প্রকার বিকারবুদ্ধি তাহার প্রতি রহিল না।” আমি বলিলাম তবে তাঁহার গালাগালি করা ও ঝগড়া করাকে ক্রোধ বলিয়া আপনি মনে করিতে পারেন না ; আপনি জানিবেন যে ইহা কেবল বাহিরের ফট্‌কার ও লীলামাত্র ; যাঁহারা ভগবদ্রূপ হইয়াছেন তাঁহাদিগের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন যে, তাঁহাদের কেহ বালকবৎ কেহ উন্মাদবৎ কেহ পিশাচবৎ থাকিয়া বাহ্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেইজন্য অজ্ঞান সাধারণ লোক সকল তাঁহাদের যথার্থ পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারে না এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে বঞ্চিত হয়।

আমি তখন তাঁহাকে আরও জিজ্ঞাসা করিলাম “আপনি বলিলেন, বাবাজী মহারাজ বড় লোভী, তাঁহার বলবতী ধন-

পিপাসা আছে; কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ধনলোভের লক্ষণ কি? যাহার ধনলোভ আছে, সেই ব্যক্তি যাহার নিকট তাহার ধনলাভ করিবার সম্ভাবনা আছে, তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করে?" পুষ্করদাসজী বলিলেন "তাহাকে সে আদর করে, যত্ন করে, তাহার পিছে পিছে ফিরে ইত্যাদি।" তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি বিশ বৎসর বাবাজী মহারাজের সঙ্গ করিয়াছেন, আপনি সত্য করিয়া বলুন ধনীলোকের সহিত তাঁহার কিরূপ ব্যবহার দেখিয়াছেন?" তিনি বলিলেন, বাবু, তুমি এই কথা যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, তৎসম্বন্ধে আমি নিশ্চয় করিয়া তোমাকে বলিতেছি যে ধনীলোকের প্রতি তাঁহার ব্যবহার অতিশয় কঠোর; আমরা সর্ব্বদাই এইজন্য তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হই। অন্য লোকের কথা কি বলিব; একবার বিজিনা-গ্রামের মহারাজা অমাত্যগণের সহিত তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন, আর তিনি অমনি যেন ভয়ানক চটিয়া এমন মানী-লোককে, যেমন দূর দূর করিয়া কুকুর তাড়ায় প্রায় তদ্রূপ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। একটু বসিতেও আদর করিলেন না। তুমি নিজে যে বার প্রথমে আশ্রমে আসিয়াছিলে, তোমার প্রতি কিরূপ কড়া ব্যবহার তিনি করিতেন, দেখিতে না কি? একদিনও ত আদর করিয়া তোমার সহিত একবার কথা কহেন নাই। এইবারও ত তোমাকে বিশেষ আদর করিয়া ব্যবহার করিতে দেখি না। আমি তখন হাসিয়া বলিলাম "যাহার ধনলোভ আছে, ধনীলোকের প্রতি কি তাহার এইরূপ ব্যবহার করা সম্ভব হয়?" তখন পুষ্করদাস একটু চুপ করিয়া থাকিয়া

বলিলেন, "বাবুজী! বাবাজীর লীলা-"পরম্পার", আমি বাবু কিছু বুঝিতে পারি না। ক্রোধ, লোভ ত সর্ব্বদাই দেখিতেছি। গালাগালি, ঝগড়া বিবাদ ত সর্ব্বদাই সকলের সহিত সমান ভাবে করিতেছেন; আর পয়সা, কড়ি, জিনিষপত্র ত এমন ভাবে সঙ্গে সঙ্গে রাখেন যে আমরা তাঁহার কাছে ঘেঁসিতেই পারি না। আচরণে দেখান যেন কেহ তাঁহার জিনিষ, পত্র, টাকা, পয়সা চুরি করিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া সর্ব্বদাই শঙ্কিত আছেন। গরীবদাস এমন মহাত্মা সাধু ছিল, প্রাণপণে নিষ্কপটভাবে তাঁহার সেবা করিত, গুরু ভিন্ন কিছু জানিত না, তথাপি তাহার প্রতি এইরূপই ব্যবহার করিতেন। আবার অন্য কেহ সত্য সত্য চুরি করিয়া তাঁহার কোন জিনিষ লইয়া গেল, কিন্তু তাহার প্রতিও পূর্ব্বে যে ভাব পরেও সেই ভাব।" একটি সাধুর নাম করিয়া বলিলেন "সে সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিত, তাঁহার সঙ্গে গাঁজা, চরস খাইত, এবং সময় পাইলে তাঁহার জিনিষ পত্র চুরি করিত; কতবার ধরা পড়িয়াছে। তাহাকে "বাইঞ্চৎ, এয়ছা করম করতা হ্যায়। তেরি মাকি * বহিন্ কি *" ইত্যাদি বলিয়া খুব গালাগালি করিলেন। আবার তাহার সহিত পূর্ব্ববৎই ব্যবহার করিলেন। আপনা হইতে ছাড়িয়া না গেলে কখন বলিবেন না তুই চলিয়া যা। কেহ একটি পয়সা দিলে কতবার তাহার প্রশংসা করেন, আর ধনী, রাজা কেহ ৺বৃন্দাবনে আসিতেছে শুনিয়া তখনই এমন ভাব দেখাবেন যে এইবার তাঁহার কত লাভ হইবে, সে তিন চারিজন সাধুর প্রত্যহ আহারের বন্দোবস্ত তাঁহার করিয়া দিবে, আর কত

টাকা পয়সা তিনি তাহা হইতে পাইবেন ; কিন্তু আসিলে একবার ফিরিয়াও তাকাইবেন না। কেহ যদি আসিয়া বলিল, "বাবাজী মহারাজ! একবার রাজার সহিত দেখা করিবেন না ?" অথবা বলিল "মহারাজ! রাজা এই দিকে আসিতেছে, অবশ্য আপনাকে আসিয়া দর্শন করিবে, এবং ভেট পূজা দিবে", অমনি যেন বাবাজী মহারাজ কোন পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করিয়া হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "শালা, হিঁয়া আওয়েগা তো এক চিম্‌টা লাগায় দেয়েঙ্গে, হাম্ ক্যা ইচ্‌কা নোকর হ্যায়, উস্‌কো মর্য্যাদ্ করেঙ্গে, হামারা সঙ্গ্ ইস্‌কা ক্যা মত্‌লব্, চলা যা অন্ত্‌মে, হামারি পিছে কেও পড়্‌তা হ্যায়।" এইরূপ উন্মাদবৎ হইয়া অসংলগ্ন অশ্লীল গালাগালি করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই সমস্ত কুব্যবহারে আমরা সকলেই অসন্তুষ্ট হইলাম। ধনীলোকের প্রতি তাঁহার এইরূপ কত ব্যবহার বলিব ?" আমি পুনরায় বলিলাম, যাহার ধনলোভ আছে সেকি কখন এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে ? পুষ্করদাস বলিল "তাহাত নহে, কিন্তু লোভ না থাকিলে টাকা, পয়সা, জিনিষপত্র তবে এমন করিয়া রাখেন কেন, এবং সাধারণ কথোপকথনে এইরূপ টাকা পয়সার প্রতি লোভ দেখান কেন ?" আমি বলিলাম "মহাপুরুষদিগের লীলা বোধগম্য করা সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে দুঃসাধ্য। লোকের চক্ষে নানাপ্রকার আবরণ দিয়া তাঁহারা আত্মগোপন করেন। অথচ যাহাকে কৃপা করিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহার নিকট সময় সময় আত্মপরিচয়ও দিয়া থাকেন। যাঁহারা বস্তুতঃ মহাপুরুষ

নহেন, অথচ মহাপুরুষ বলিয়া ভাণ করেন, তাঁহাদের চরিত্র অন্য প্রকার হয়, তাঁহারাও অপর লোকের সাক্ষাতে আত্মগোপন করেন, কিন্তু তাহা বিপরীত প্রকারের আত্মগোপন। তাঁহারা অপরের সাক্ষাতে নিজের অপূর্ণজ্ঞত্ব গোপন করিয়া আপনাদিগকে পূর্ণজ্ঞের ন্যায় দেখাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রকৃত মহাজনদিগের প্রকৃতি তদ্বিপরীত। তাঁহারা নিজের পূর্ণজ্ঞত্ব গোপন করিয়া অতি সাধারণ অপূর্ণজ্ঞ লোকের মত ব্যবহার করেন। দেখ, তোমাদের এই ব্রজভূমে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া অনেক অলৌকিক কার্য্যও সময় সময় করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তৎসমস্ত এইরূপ ভাবে করিয়াছেন, যাহাতে ব্রজের সাধারণ লোক তাঁহার যথার্থ পরিচয় প্রাপ্ত না হয়। ব্রজবাসিগণ তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিল। এবং কেহ সখ্য ভাবে, কেহ বাৎসল্য ভাবে কেহ কামুক উপপতি ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিল। কেবল দিব্যদর্শী ঋষিগণই তাঁহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। পূর্ণজ্ঞ ব্রহ্মর্ষিদিগের চরিত্র লীলা মাত্র। তাঁহাদিগের কেবল চরিত্র দর্শন করিয়া সাধারণ লোক তাঁহাদিগের তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না।”

এইরূপ বহু কথোপকথনের পর পুষ্করদাস বলিলেন “বাবু, আমি এত কথা বুঝিতে পারি না। আমার কামবনে গয়াকুণ্ডে যাইতে কিন্তু বড় ইচ্ছা হইতেছে। সুতরাং তিলকদাসজীর সঙ্গে আমি গয়াকুণ্ডে যাইব। তিন দিন পর, আবার তোমাদের সঙ্গে আসিয়া একত্রিত হইব। এই তিন দিন বাবাজী মহারাজের রসুইয়ের কার্য্য কোন প্রকারে চলিয়া যাইবে। পুষ্করদাসের

অবস্থা দেখিয়া আমি মনে মনে বলিলাম "ধন্য মহারাজ; এই ব্যক্তি সাধু, বিশ বৎসর তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছে অথচ তুমি ইঁহার নিকট এইরূপেই আত্মগোপন করিয়াছ যে, এই ব্যক্তি তোমার তত্ত্ব কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিল না। বুঝিলাম তুমি নিজে কৃপা করিয়া পরিচয় না দিলে তর্কবিচার দ্বারা কেহ তোমার স্বরূপ অবগত হইতে পারে না।"

অতঃপর আমরা তিনজন আপন আপন আসনে ফিরিয়া আসিলাম। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট অথবা অন্য কাহারও নিকট এ সকল কথোপকথনের কথা প্রকাশ করিলাম না। ক্রমশঃ সাধু সকল আপন আপন আসনে, কেহ শয়ন করিলেন, কেহ ভজন করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় একজন সাধু আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের চরণ সেবা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং গাঞ্জা খুলিয়া তাহাকে সাজিতে দিলেন। সেই সাধুটি গাঞ্জা সাজিতে সাজিতে বলিল "মহারাজ, তোমার রসুইয়া পুষ্করদাস ত তিলক দাসের সঙ্গে গয়াকুণ্ডে যাইবে বলিতেছে। তোমার রসুই কে করিবে?" তিনি বলিলেন "হাঁ, পুষ্করদাস বৃদ্ধকে ছাড়িয়া তিলকদাসজীর সঙ্গে যাইবে; আরও সে বাবুর নিকট বলিয়াছে আমি বড় ক্রোধী, আমি বড় লোভী; তা ভাই! আমি বৃদ্ধ কি করিব? আমি যখন অসহায়, বৃদ্ধ, তখন ভগবান্ আমার জন্যও কোন না কোন বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।" আমি তাঁহার এই সকল কথা শুনিয়া অভয় বাবুকে বলিলাম

"শুন্‌ছেন? আমরা গোপনে পুষ্করদাসের সঙ্গে যে সকল কথা বলিয়াছি, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কিরূপে সেই সমস্ত অবগত হইয়াছেন।" পরে গাঞ্জা খাইয়া সাধুটি চলিয়া গেল। আমরা সকলে শয়ন করিলাম। পরদিন প্রাতে কদমখণ্ডী হইতে সাধুজমাত উঠিল, কিন্তু জমাতের প্রায় অর্দ্ধেক সাধু গয়াকুণ্ডে না গিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গেই চলিল এবং একটি অতি নিষ্ঠাবান্ উত্তম ব্রাহ্মণ সাধু উপস্থিত হইয়া আপনাকে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের রসুইয়ের কার্য্যে প্রেমের সহিত বরণ করিল। তিন দিবস পরে পুনরায় গেঁড়োই নামক পরিক্রমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে তিলকদাসজী জমাতের অপর ভাগ সঙ্গে লইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গে একত্রিত হইলেন। পুষ্করদাসও আসিয়া পুনরায় আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের তাহার প্রতি ব্যবহারে কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য আমরা লক্ষ্য করিতে পারিলাম না।

এই স্থলেই পুষ্করদাসের সম্বন্ধে আরও কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আমরা পরে অবগত হইয়াছিলাম যে পুষ্কর-দাস এই ঘটনার পূর্ব্বে দুইবার শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে শেঁকো বিষ (সাঙ্খিয়া) আহার্য্যের সহিত প্রদান করিয়াছিলেন। একবার ভাঙের সহিত সাঙ্খিয়া (arsenic) গোপনে মিশ্রিত করিয়া তাঁহাকে পান করিতে দিয়াছিলেন। অন্য তিনজন বড় মহন্তও ঐ ভাঙ্ লইয়া পান করিয়া অচেতন হইয়া পড়েন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বহু পরিমাণে ঐ ভাঙ্ খাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন প্রকার আমল হয় নাই। অপর

মহন্তেরা ঢলিয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া তিনি নিজ কমণ্ডলুর জলের দ্বারা তাঁহাদিগের চেতনা সঞ্চার করিলে তাঁহারা ঐ পুষ্করদাসকে ধরিয়া পুলিশের হস্তে অর্পণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন "এই ব্যক্তি আপন কর্ম্মের ফল আপনি ভোগ করিবে। তোমরা ত চেতনা লাভ করিয়াছ? তোমাদের ত কিছু অনিষ্ট হয় নি? তবে তোমরা কি নিমিত্ত সাধু হইয়া পুলিশের নিকট নালিশ করিতে যাইবে?" মহন্তেরা বলিলেন "এই ব্যক্তি হত্যাকারী। ইহাকে আমরা পুলিশের হস্তে অবশ্য অর্পণ করিব।" তাহাতে তিনি বলিলেন "তোমরা ইচ্ছা কর পুলিশের নিকট যাও, কিন্তু ইহার কিছু করিতে পারিবে না। আমি বলিব তোমরা যে ভাঙ্ খাইয়াছ সেই ভাঙ্ তোমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে আমিও খাইয়াছি। আমার ত কিছু হয় নি। সুতরাং তোমরা অভিযোগ করিলেও ইহার কিছু হইবে না। তোমরাই অপ্রস্তুত হইবে।" এই কথা শুনিয়া মহন্তেরা অগত্যা নিরস্ত হইলেন এবং পুষ্করদাস অব্যাহতি পাইল।

আর একবার পুষ্করদাস আহার্য্যের সহিত শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে ঐরূপ বিষ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু সেইবারও তিনি কাহাকেও না বলিয়া সেই বিষ হজম করিয়াছিলেন। পুষ্করদাসের ধারণা ছিল যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের কোমরে যে মোটা কাষ্ঠের আড়বন্ধ ছিল তাহার ভিতর ফাঁপা এবং তাহাতে

তিনি অনেক মোহর লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাকে বধ করিয়া সে ঐ সকল মোহরের সহিত ঐ আড়বন্ধ গ্রহণ করিবে। দুইবার বিষ প্রয়োগেও তাঁহার অনিষ্ট করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া, সে অন্য উপায় উদ্ভাবন করিল। আগরা পুষ্করদাসের জন্মস্থান ছিল। ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ আগ্রায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একবার উপস্থিত হইলে, পুষ্কর দাস কয়েকজন চোরের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাঁহার বধোপায় স্থির করিল। তিনি একদিন রাত্র দ্বিপ্রহরের পর এক উচ্চ মৃত্তিকার ঢিপির নিম্নভাগে আপন আসনে নিদ্রিত হইয়াছেন দেখিয়া, ঐ চোরদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া ঐ ঢিপির উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইয়া দুই মণের অধিক ভারী এক প্রস্তরখণ্ড দুই তিন জনে ধরাধরি করিয়া তাঁহার উপরে নিক্ষেপ করিল। ঐ প্রস্তর তাঁহার দক্ষিণ বাহুর উপরিভাগে পতিত হইলে তিনি অতিশয় যাতনা প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎই উঠিয়া বামহস্তে বৃহৎ লাঠি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। চোরেরা মনে করিল প্রস্তর তাঁহার উপরে পতিত হয় নাই, তিনি সুস্থকায় আছেন; এই মনে করিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎই পলায়ন করিল। কিন্তু পুষ্করদাস যেন কিছু জানে না এইরূপ ভাণ করিয়া তাঁহার সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। চোরদিগের সঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহাকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু যেন দেখেন নাই এইরূপ ভাণ করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়াই সেইস্থান তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া সে রাত্রেই স্থানান্তরে গমন করিলেন। প্রস্তরের আঘাতে তাঁহার

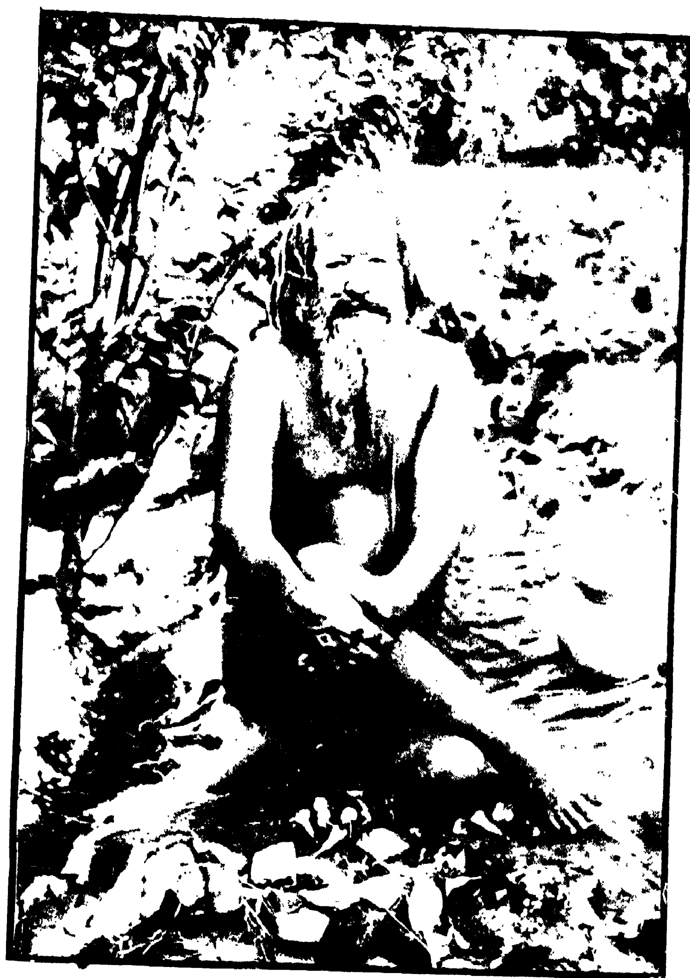
একটি শিরা কাটিয়া গিয়াছিল এবং তিনি অস্থিতেও অতিশয় আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কয়েকদিন কষ্ট পাইয়া তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন সত্য, কিন্তু পরে যতদিন দেহ ধারণ করিয়াছিলেন ততদিনই সেইস্থান এবং তৎসংলগ্ন অপর নালী সংযোগ স্থান সকলে সময় সময় ব্যথা অনুভব করিতেন। পুষ্কর-দাসের এই সকল ব্যবহার তিনি নিজমুখে আমাকে কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন।

পুষ্করদাস তাঁহার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলেও সময় সময় সেই তাঁহার রান্না করিত এবং সঙ্গে থাকিত। তাহাকে এই নিমিত্ত তিনি কখনও কিছু বলিতেন না। আমি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন "বাবা! কেহ কাহাকেও দুঃখ দিতে পারে না। আপন আপন কর্ম্মানু-সারে সকলেই সুখ দুঃখ ভোগ করে। যে অন্যায় কর্ম্ম করে সে তাহার ফল পায়। বিশেষ পুষ্করদাস আমার কি করিয়াছে? আমি ত এক অখণ্ড সর্ব্বদাই আছি। আমার সে কি করিতে পারে যে তাহাকে আমি বাহির করিয়া দিব, অথবা তিরস্কার করিব? বাবা! তোমাকে সত্য বলিতেছি আমার শরীরের সুখ দুঃখের কিছু খবর নাই।" আমি এই সকল কথা শুনিয়া "ধন্য মহারাজ" কেবল এইমাত্র মনে করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম।

আমাদের প্রথম বারের পরিক্রমার কয়েক বৎসর পরে আমাকে অপর এক ব্যক্তি একবার টেলিগ্রাফ্ করিয়া জানাইলেন

যে, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অতিশয় পীড়িত, আমাকে অবিলম্বে ৺বৃন্দাবনে যাইতে হইবে। আমি টেলিগ্রাফ্ পাইয়া সেই দিবসই শ্রীযুক্ত অভয় বাবুর সঙ্গে কলিকাতা হইতে ৺শ্রীবৃন্দাবনে রওয়ানা হইলাম। তথায় পৌঁছিয়া দেখিলাম শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ। কিছুমাত্র আহার করিতে পারেন না, ব্রজবাসীরা একজন ডাক্তার আনিয়া তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত করিয়াছে, তাঁহার কোমরের আড়বন্ধ করাত দ্বারা কাটিয়া খুলিয়া ফেলিয়াছে, এবং তিনি বস্ত্রের লেঙ্গটি পরিধান করিয়াছেন। জানিলাম পুষ্করদাস রুটীর সহিত দুই ভরি শেঁকো বিষ এইবার তাঁহাকে প্রদান করিয়াছে। সেই রুটী খাইয়া তিনি আচমন করিতে গেলে তাঁহার মস্তক নীচের দিকে হঠাৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিকটস্থ এক কাষ্ঠের খুঁটিতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎপর তিনি শয্যায় আসিয়া শয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু পেট ফাঁপিয়া উঠাতে ব্রজবাসিগণ আসিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া করাতের দ্বারা তাঁহার আড়বন্ধ কাটিয়া বাহির করিয়াছে। তাঁহার পেট ফাঁপা আমাদিগের পৌঁছিবার সময় কমিয়াছিল সত্য, কিন্তু আহারের রুচি একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। পুষ্করদাসের বিষ প্রয়োগ করার কথা তিনি তখনও কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। আমি কলিকাতায় টেলিগ্রাফ্ পাইয়া তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ অপর বন্ধুদিগের নিকট প্রকাশ করিলে শ্রীযুক্ত অভয় বাবুর প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের শরীর সিদ্ধ।

তাঁহার কোন রোগ হইবার সম্ভাবনা নাই; তবে কোন সাধু অবশ্য তাঁহাকে বিষ প্রদান করিয়াছে। নতুবা অন্য কোন কারণে তাঁহার অসুস্থতা হয় নাই। শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া আমি সেই কথা প্রকাশ করাতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ হাসিয়া বলিলেন "দেখো কলকাত্তামে বৈঠ্‌কের মহাত্মাকে কেয়সা হিয়াকা খবর মিল্ গিয়া। বাবা পুষ্করদাসনে ইস্‌বকত্ দো ভরি শাঙ্খিয়া হাম্‌কো রুটী কি সঙ্গ্ দে দিয়া। আব্ হামারা শরীর বৃদ্ধ হো গিয়া। ইস্‌বাস্তে শাঙ্খিয়া শরীরকো দুঃখ দিয়া।" আমি তাঁহার এই কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। দেখিলাম, পুষ্করদাস তখনও রসুইয়া রহিয়াছে, এবং তাঁহার নিমিত্ত যে কিছু আরারুট প্রভৃতি পথ্যের ব্যবস্থা ডাক্তার করিয়াছেন, তৎসমস্তও পুষ্করদাসই প্রস্তুত করিয়া দিতেছে। আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রীযুক্ত অভয় বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এক দিবস শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে বলিলাম "মহারাজ, এই পুষ্করদাস তিনবার তোমাকে বিষ প্রয়োগ করিয়াছে, তথাপি সে আশ্রমে থাকিয়া রসুই কার্য্য করিতেছে; ইহা আমাদের সহ্য হইতেছে না। ইহাকে আশ্রম হইতে বহিষ্কৃত করা উচিত।" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "বাবা! অব্ ইস্‌কা ভ্রম মিট্ গিয়া। ইস্‌কা মন্‌মে থা কি হমারা আড়বন্ধ্‌কা ভিতর বহোত আসরফি হ্যায়। হামকো মার্‌কের ওয়ে সব আসর্‌ফি লে লেয়েগা। অব্ আড়বন্ধ্ কাট্ গিয়া, ওস্‌কা ভ্রম্ বি মিট্ গিয়া। বাকী



শ্রীযুক্ত রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ।

(কাঠের কৌপীন কাটার পরের অবস্থা

তোমারি মর্জ্জি হোয় তো ইস্‌কো অবহি নিকাল দেও।" আমি মনে মনে ভাবিলাম পুষ্করদাস সাধু, আশ্রমে সর্ব্বদা থাকে, আমি আগন্তুকমাত্র হইয়া কিরূপে তাহাকে বলিব যে তুমি আশ্রম হইতে বাহির হইয়া যাও। আমি এইরূপ ভাবিতেছি ও ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন "আচ্ছা, আমিই ইহাকে যাইতে বলিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং ধুনীর ঘরে গিয়া পুষ্করদাসকে বলিলেন "তুম্‌সে রসই কুচ্ নহি বন্তা হায়। তুম্ সদা রসইমে জিয়াদা রামরস্ ডার্ দেতে হো; ঔর হামকে জহর বি তুম দে দিয়া। তুম স্থান্‌মে ঔর মৎ রহ। কালা মুড়া কর্‌কের অব্‌হি নিকল যাও।" পুষ্করদাস তখন কিছু না বলিয়া স্থান ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আমরা শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ঐ কথাগুলি চিন্তা করিয়া অবাক্ হইলাম। ব্যঞ্জনে অধিক লবণ দেওয়ার অপরাধ এবং রুটীতে বিষ মিশান অপরাধ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট তুল্য! উভয় কার্য্যকেই সমানভাবে উল্লেখ করিয়া তিনি পুষ্করদাসকে বলিলেন "চলিয়া যাও।" বিষ ও লবণ তাঁহার নিকট তুল্য!!

পুষ্করদাস চলিয়া গেলে মৌনিজী রসুই করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আহারের রুচি জন্মিল না। ডাক্তার বলিলেন "তিনি অনেক গাঞ্জা চরস্ পান করেন, সেইজন্য ঔষধের ক্রিয়া হয় না।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন

"তুমি যদি বল তবে গাঞ্জা চরস্ আমি এখনি ছাড়িয়া দিতে পারি।" ডাক্তার বলিলেন "হাঁ। তাহা হইলেই ভাল হয়।" তিনি বলিলেন "আচ্ছা! আমি তবে আর গাঞ্জা চরস্ খাইব না।" তিনি সেই অবধি গাঞ্জা চরস্ খাওয়া বন্ধ করিলেন। প্রায় শত বর্ষের অভ্যাস একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। এই গাঞ্জা ও চরস্ খাওয়ার অভ্যাস তাঁহার এত অধিক ছিল যে (আমি অপর সাধুদিগের মুখে শুনিয়াছি) অপর কোন সাধু এত গাঞ্জা চরস্ খাইতে পারিতেন না। দীপ-দানের উপলক্ষে গিরিরাজে মানসী গঙ্গার উপর সাধুদিগের জমাত পড়ে। আমি একবার তথায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গে থাকিয়া স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্র দশটা পর্য্যন্ত সমস্ত দিন এক চিল্‌মের পর অন্য চিল্‌ম এইরূপ করিয়া সমস্ত দিন গাঞ্জা এবং চরসের ধূমপান করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার নেত্রদ্বয়েরও কোন প্রকার বিকৃতাবস্থা হওয়া লক্ষ্য করিতে না পারিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে বলিয়াছিলাম "মহারাজ! তুমি সমস্ত দিন ধরিয়া অদ্য কেবল ধূমই পান করিতেছ, কিন্তু তোমার নেত্রের কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য আমি দেখিতেছি না কেন? অপর সাধু যাহারা দুই চার চিল্‌ম মাত্র তোমার সঙ্গে খাইয়াছে, তাহাদের সকলেরই নেত্র আরক্তিম হইয়া ঢুলু ঢুলু করিতেছে, কিন্তু তোমার নেত্রদ্বয় প্রাতে যেরূপ ছিল, এত ধূম-পানের পর এখনও তদ্রূপই আছে!! তোমার কি নেশা হয় না?" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ হাসিয়া বলিয়াছিলেন

"বাবা! যিস্‌কো ভগবৎকা আমল্ মিল্ গিয়া, উস্‌কা উপর্ ঔর্ কোই তরে কা আমল্ চড়তা নেই।"

যাহা হউক সারা জীবনের অভ্যস্ত এই ধূমপান তিনি ডাক্তারের এক কথায় এইবার পরিত্যাগ করিলেন। তামাক পর্য্যন্ত খাওয়া পরিত্যাগ করিলেন। আমরা দেখিয়া অবাক্ হইলাম এবং ব্রজবাসিগণও সকলে ধন্য ধন্য বলিতে লাগিল; বলিল, এতকালের অভ্যাস এইরূপ একেবারে পরিত্যাগ করিতে আর কাহারও সামর্থ্য নাই।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ধূমপান ছাড়িলেন কিন্তু তথাপি ঔষধ তাঁহার উপর বিশেষ ক্রিয়া করিতে পারিল না। আমরা অন্য ডাক্তার আনিলাম। তিনি বলিলেন "এত অভ্যস্ত ধূমপান একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত হয় নাই।" দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার তামাকের ধূমপান করা ভাল। সেই অবধি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রতিদিন বৈকালে একবার তামাক খাওয়া আরম্ভ করিলেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত এই অভ্যাসই রাখিয়াছিলেন। কয়েকদিন পরে আহারে তাঁহার কিঞ্চিৎ রুচি হইয়াছে দেখিয়া আমরা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

আর একবার পরিক্রমার সময় পায়গামে আর একটি ঘটনা হইয়াছিল, তাহারও এইস্থলে উল্লেখ করিতেছি। একবার সাধু-দিগের জমাত পায়গামে গিয়া আসন স্থাপন করিবার কিছুকাল পরেই একজন অতি প্রাচীন পরমহংস তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে তথায় আগত দেখিয়া তিলকদাস প্রভৃতি অনেক মহন্ত

সাধু তাঁহার প্রতি অতিশয় মর্য্যাদা প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন ইনি অতি সিদ্ধ মহাত্মা; ব্রজধামে এইরূপ মহাত্মা আর নাই। তাঁহার সম্বন্ধীয় আমাদের প্রশ্নে তাঁহারা বলিলেন যে ইনি কোন্ স্থানে থাকেন কেহ জানে না, হয়ত কোন জঙ্গলে থাকিতে পারেন, কখন কখন কৃপা করিয়া প্রকাশিত হয়েন এবং দর্শন দেন। তাঁহার অনেক অদ্ভুত এবং অলৌকিক কার্য্য সকলও তাঁহারা বর্ণনা করিলেন। তিনি পায়গামে আসিয়া সাধু জমাতের এক অন্তভাগে কুণ্ডের নিকটে স্বীয় আসন স্থাপন করিলে, শ্রীযুক্ত অভয় বাবু তাঁহার নিকট গিয়া বসিলেন এবং তাঁহার সহিত অনেক প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সেই বৎসর ব্রজে অতিশয় অনাবৃষ্টি হইয়াছিল এবং কুণ্ডের অধিকাংশ জল শুষ্ক হইয়া যাওয়াতে যে অল্প পরিমাণ জল অবশিষ্ট ছিল তাহাতে অনেক পোকা পড়িয়া জল অব্যবহার্য্য হইয়াছিল। কথা প্রসঙ্গে অভয় বাবু তাঁহাকে বলিলেন "মহারাজ! এই কুণ্ডের জল অতি পোকাময় হইয়া অপবিত্র ও অব্যবহার্য্য হইয়াছে।" তাহাতে পরমহংস বলিলেন "এখানে ত যমুনা বহিয়া যাইতেছেন, অপবিত্র জল কোথায়?" অভয় বাবু বলিলেন "আমার চক্ষে ত আমি অপবিত্র পোকাময় জলই এইস্থানে দেখিতেছি।" পরমহংস চুপ করিয়া রহিলেন। তৎপর অভয় বাবু কিছু জিলাবি খরিদ করিয়া আনিয়া পরমহংসকে আহারের নিমিত্ত অর্পণ করিলেন; পরমহংস নিজে কিছু রাখিলেন এবং কিছু অভয়বাবুকে খাইতে দিলেন; অভয়বাবু তাহা গ্রহণ করিয়া কুণ্ডের কিনারায় গিয়া বসিলেন এবং আহার করিতে করিতে

কুণ্ডের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন সেখানে কুণ্ড আর নাই, তৎস্থলে যমুনা কল কল রবে লহর তুলিয়া বাহিত হইতেছেন, নানাবিধ পক্ষী ইহার উপরিভাগে মন্দগতিতে উড্ডীন হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। তাঁহার ভ্রম হইয়াছে বিবেচনায় তিনি বারম্বার চক্ষুর্দ্বয় মুছিয়া কুণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার তৎস্থলে যমুনা দর্শন বহুক্ষণ ধরিয়া অবিচ্ছিন্ন রহিল। তাহাতে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ইহাকে পরমহংসেরই প্রভাব বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করিলেন। পরদিন অতি প্রত্যূষে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর আরতি হইতেছে এমন সময় দেখিলাম পরমহংস আমাদের তাঁবুর নিকট আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, এবং আরতি শেষ হইয়া গেলে দূর হইতে নীরবে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিলেন এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ হস্তের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে তাঁহার আশীর্ব্বাদ জানাইলেন। তখন অভয়বাবু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে বলিলেন "মহারাজ, এই পরমহংস বড় সিদ্ধ মহাত্মা. ইঁহাকে আপনার আসনের নিকটে ডাকিয়া আনিব কি ?" তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন "বাবা, পরমহংসকে ডাকিয়া আনিতে ত আমার কোনও প্রয়োজন নাই। উন্‌কা গুরু ব্রহ্মা আপ্‌নে আয়্‌জায় তব্‌বি হামারা আসন পর উন্‌কো হাম্‌ আপনেসে নেহি বোলাতে হেঁ। বাকি তোমারি প্রেম হোয় তো তুম্‌ উন্‌কো বোলায় লেও ; হিঁয়া তামাকু, গাঞ্জা, সুল্‌ফা, ভাঙ্‌ সব্‌ কুছ ধরা

হায়, যো পিয়ে উস্‌কো পিয়াও, ইস্‌মে হামারি কুচ্ছ মান নেহি।” অভয় বাবু এই কথা শুনিয়া আর কিছু বলিলেন না; পরমহংস দণ্ডবৎ করিয়া আপন আসনে চলিয়া গেলেন।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আচার ব্যবহার সমস্ত শাস্ত্রানুগত ছিল। শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন সাধুকে চলিতে দেখিলে তিনি মহন্ত-স্বরূপ তাহাকে অতিশয় শাসন করিতেন। তৎ-সম্বন্ধে একদিনের একটি ঘটনা এইস্থলে বর্ণনা করিতেছি। পায়গাম শ্রীযুক্ত নাগাজী মহারাজের জন্মস্থান, ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এইস্থানে ব্রজপরিক্রমার সময় সাধুদিগের জমাত দুই দিন অবস্থিতি করে। শ্রীমন্ নাগাজী পিতৃপক্ষের সপ্তমী তিথিতে স্বয়ং চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আপন জন্মস্থানবাসি-গণকে দর্শন দিয়াছিলেন, এবং অন্নপ্রসাদ সকলকে বিতরণ করিয়া-ছিলেন। তদবধি প্রতিবৎসর এই সপ্তমী তিথিতে ব্রজবাসি-গণের ঐ স্থানে এক বৃহৎ মেলা হয়। শ্রীমন্ নাগাজী মহারাজের মূর্ত্তিও এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মহাপ্রসাদের (ভাতের) ভোগ সেই দিবস নাগাজীকে অর্পণ করা হয়। সাধু সকল সেই প্রসাদ ভোজন করেন, এবং ব্রজবাসীরাও তাহা গ্রহণ করে। যেমন শ্রীজগন্নাথদেবের ক্ষেত্রে মহাপ্রসাদে উচ্ছিষ্টদোষ হয় না, তদ্রূপ ঐ তিথিতে শ্রীমন্ নাগাজী মহারাজের প্রসাদেও উচ্ছিষ্ট-দোষ গণ্য হয় না। ব্রজবাসিগণ কাড়াকাড়ি করিয়া সাধুদিগের উচ্ছিষ্টান্ন সেই দিবস ভোজন করিয়া থাকেন, কোন জাতি বিচার করে না। সেই দিবস ব্রজভূমির মল্লসকল নানাস্থান হইতে আগত হইয়া তথায় আপন যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন

করেন। ব্রজগোপীসকল দলে দলে একত্রিত হইয়া সেইস্থানে আগমন করেন, এবং স্বয়ং নৃত্য ও কৃষ্ণলীলা গান করিয়া আনন্দে দিনযাপন করেন। রাসধারিগণ আসিয়া ভগবৎলীলা প্রদর্শন করেন। এইরূপে সপ্তমীর দিবস তথায় আনন্দে কাটিয়া যায়। সাধুদিগের জমাত অষ্টমীর দিবসও তথায় অবস্থিতি করে। ঐ অষ্টমীর দিবস ব্রজবাসিগণ তাঁহাদিগকে আহারের নিমিত্ত আটা না দিয়া প্রায়শঃ দাল ও চাউলের ভেট প্রদান করেন। আমরা যে কয়জন বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গে সাধুদিগের জমাতে ছিলাম, তাহাদিগের জন্য আমরা একটি পৃথক্ স্থানে রান্না করি। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের জন্য একটি নিভৃত স্থানে বস্ত্রের দ্বারা চারিদিক বেষ্টিত করিয়া পৃথক্‌রূপে কোন ব্রাহ্মণ সাধু রসুই প্রস্তুত করেন। একবার আমাদের রসুই প্রস্তুত হইলে আমরা সকলে আহার করিলাম, এবং আহারান্তে থালা, বোগ্‌না প্রভৃতি পরিষ্কৃত করিয়া আমরা আমাদের তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম। বেলা তখন প্রায় দুইটা হইয়াছে। তখনও শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ও সাধুদিগের রসুই প্রস্তুত হয় নাই। সেই সময় আমি কোন কার্য্য উপলক্ষে যে স্থানে তাঁহাদের রসুই হইতেছিল সেইস্থানে গেলাম। তখন যে সকল বস্ত্রের পরদা দ্বারা রসুইয়ের স্থান পরিবেষ্টিত ছিল, সেই পরদাটি হঠাৎ আমার গায় লাগিল। অমনি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ চেঁচিয়ে বলিয়া উঠিলেন "আরে এই মূঢ় সমস্ত রসুই ভ্রষ্ট করিয়াছে, আমি এই সকল কিছু খাব না। এই সব ফেলে দাও।" তখন সাধুরা বলিল "কই বাবুজীত কিছু করেন নাই। পরদা ত

রসুইয়ের স্থান হইতে অনেক ব্যবধানে আছে। পরদায় তাঁহার শরীর লাগিয়াছে কিন্তু রসুইয়ের স্থান তিনি স্পর্শও করেন নাই।" তিনি বলিলেন, "না, আমি এই সকল খাব না। আমার জন্য পৃথক্ করিয়া রুটী করিয়া দাও। স্থান পরিষ্কার কর। তোমরা আমার ধর্ম্ম ভ্রষ্ট করিতে চাও।" সাধুগণ বলিলেন, আচ্ছা মহারাজ! আপনার জন্য পৃথক্ করিয়া রুটী করিয়া দিব। আমি তখন নীরবে অতি দুঃখিতান্তঃকরণে নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া সেই স্থান হইতে আস্তে আস্তে একটি দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া বসিলাম এবং মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া শোক করিতে লাগিলাম যে "একেত গুরুর আহারের পূর্ব্বেই আমরা আহার করিয়াছি। ইহাই ত মহৎ অপরাধ। এই অপরাধ নিত্যই করিতেছি, তাহার উপরে এখন এত বেলায় আবার তাঁহার রসুই নষ্ট করিয়া দিলাম, এখন পুনরায় সব পরিষ্কৃত হইবে তবে তাঁহার রুটী হইবে; তিনি আহার করিতে করিতে রাত্রের আগে আর হইবে না।" আমি এইরূপ শোক করিতেছি এমন সময় প্রস্রাব করিবার অছিলা করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং অতি প্রসন্ন বদনে আমাকে বলিলেন "বাবা তুমি কেন শোক করিতেছ? আমি ভাত খাই না তুমি জান; কারণ তাহাতে আমার শরীরে সেই চোরের চোটের বেদনা উপস্থিত হয়। সেইজন্য রুটী খাইবার কথা বলিয়াছি। এখনই রুটী প্রস্তুত হইবে, বিলম্ব হইবে না। তুমি শোক করিও না। তোমার আমার শরীর এক। তোমার স্পর্শে

আমার কিছু দোষ হইতে পারে না। তবে সাধুদিগকে আপন নিয়মে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য আমি এই সকল ব্যবহার বাহিরে করিয়া থাকি।” বাস্তবিক যে কোন ভেদবুদ্ধি তিনি রাখেন না তাহা যেন আমাকে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত পরে একদিন নির্জ্জনে আশ্রমে আহার করিবার সময় আহার করিতে করিতে আমাকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া আমার হাতে আমাকে স্পর্শ করিয়া রুটী প্রসাদ দিলেন এবং পরে নিজে আহার করিতে লাগিলেন, আর বলিলেন “দেখত তরকারীতে নুন অধিক দিয়াছে কিনা।” যেন এইটি আমার দ্বারা পরীক্ষা করাইবার জন্যই আমাকে ডাকিয়াছেন ও প্রসাদ দিয়াছেন এইরূপ বাহিরে ভাব দেখাইলেন।

আর একদিন ললিতা সখীর জন্মস্থান করেলা গ্রামে সাধুদিগের জমাত পড়িয়াছিল। তখন ব্রজগোপীগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহাদের সমক্ষে নৃত্যগীতাদি করিতে লাগিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহাদিগকে দেখাইয়া বলিলেন “দেখ, গোপী সকলের আনন্দ ও প্রেম দর্শন কর। এখানে ইহাদের এত আনন্দ দেখিতেছ, কিন্তু ঘরে গিয়া যদি অনুসন্ধান কর, তবে দেখিবে অনেকের ঘরে বৈকালের আহার্য্য পর্য্যন্ত সঞ্চিত নাই। বাবা, এই ব্রজভূমিতেই এইরূপ আনন্দ সম্ভব।” তিনি এইরূপ বলিলে অন্যান্য দেশের প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। প্রসঙ্গক্রমে পুরীধামের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন “বাবা, পুরীতে রঘুবর দাস নামে

এক বড় মহাত্মা সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। একবার রথের সময় আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। ৺জগন্নাথজী রথের উপরে বসিয়াছেন ; বহু যাত্রীক একত্রিত হইয়া তাঁহার রথ টানিতেছে, কিন্তু রথ কিছুতেই চলে না। তৎপর সাহেব আসিয়া রথ টানিবার নিমিত্ত হাতী নিযুক্ত করিল কিন্তু তাহাতেও রথ চলিল না, পরে সাহেব রঘুবর দাস-জীকে সেস্থানে দেখিয়া একটু ঠাট্টা করিয়া বলিল "হে রঘুবর দাসজী ! তোমরা ইষ্ট কেয়সা হ্যায় ? হাম্ হাতী তলক্ লাগায়া, তব্ বি উস্কা রথ চল্তাই নাই, অব্ হাম কেয়া করেঙ্গে ?" তখন রঘুবর দাসজী নীরবে রথের উপর চড়িলেন, এবং জগন্নাথজীর কাণে কি কথা বলিলেন, আর রথ অম্নি ঘড়্ ঘড়্ করিয়া চলিতে লাগিল। তখন সাহেব মাথার টুপী খুলিয়া রঘুবরদাসজীকে সেলাম করিলেন এবং বলিলেন "রঘুবরদাস ! তুম্ সাচ্চা হ্যায়, তোমরা ইষ্ট বি সাচ্চা হ্যায়।" রঘুবর দাস এমন মহাত্মা ছিলেন যে তিনি যে স্থানে থাকিতেন সেই স্থানে খোলা জায়গায় এক গামলায় মহাপ্রসাদ রাখিয়া দিতেন, আর তাহা হইতে কুকুর, কাক প্রভৃতি যে কোন জীব জন্তু প্রসাদ খাইয়া যাইত। তিনিও আবশ্যক মত তাহা হইতেই প্রসাদ লইয়া খাইতেন।" তখন শ্রীযুক্ত অভয়বাবু বলিলেন "মহারাজ তবে তুমি নিজে মহাত্মা হইয়াও আহার

সম্বন্ধে এত কড়াকড়ি নিয়ম কেন পালন কর? মাধব দাস নামে একজন পরমহংসও সেই স্থলে এই কথোপকথনের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজে পরমহংস বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আহারাদি বিষয়ে কোন নিয়ম পালন করিতেন না। তিনি অভয় বাবুর ঐ প্রশ্ন শুনিয়া বড় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন "বাহাঃ ইনিও দ্বিতীয় অর্জ্জুনের মত প্রশ্ন করিয়াছেন।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন "বাবা! হাম্‌কো তো ইসিমে রাম মিল্ গিয়া, ইস্‌মে নেই মিল্‌তা তব্ হাম্ বি উস্‌কা বৃত্তি লে লেতে। বাবা! উস্‌কা রাস্তা ঔর হ্যায়, হামারা রাস্তা ঔর হ্যায়।"

পরিক্রমার সময় ভগবল্লীলা স্থানসকল দর্শন করিতে করিতে সাধু জমাত বর্ষাণার পিরীপুকুরে আসিয়া তিন দিবস অবস্থিতি করে; একাদশী তিথির দিবস পিরীপুকুরে উপস্থিত হয়, দ্বাদশীতে প্রেমসরোবরে নৌকালীলা হয়, এবং ত্রয়োদশী তিথির দিবস বর্ষাণার গহভরবন নামক স্থানে দধিলোটের লীলা হয়, এই সকল লীলা দর্শন করিয়া চতুর্দ্দশীর দিন প্রাতে পিরীপুকুর হইতে উঠিয়া সাধুগণ নাগাজীর কদমখণ্ডীতে প্রস্থান করেন। বর্ষাণায় এক উচ্চ পাহাড়ের উপর প্রিয়াজীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ পাহাড়ের নিম্নদেশ ঘেসিয়া কদমখণ্ডী যাইবার রাস্তা। একবার পরিক্রমার সময় পিরীপুকুরের অবস্থান কালে প্রিয়াজীর মন্দিরে গিয়া তাহা দর্শন করিতে আমি অবসর প্রাপ্ত হইলাম না। শেষ দিবসও প্রিয়াজীকে দর্শন করিতে অবকাশ না পাইয়া আমি মনে মনে স্থির করিলাম যে পরদিবস প্রাতে যখন

এইস্থান হইতে সকলে কদমখণ্ডী যাত্রা করিবেন, তখন তাড়াতাড়ি পাহাড়ে উঠিয়া প্রিয়াজীকে দর্শন ও দণ্ডবৎ করিয়া যাইব। কিন্তু পরদিবস গরুর গাড়ীতে জিনিষপত্র উঠাইয়া আমি যাত্রা করিবার সময় দেখিলাম যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের গঙ্গা নাম্নী গাভীটি রহিয়া গিয়াছে, তাহাকে সঙ্গে করিয়া কেহ নেয় নাই, এবং তাহার রক্ষক সাধু সকলই চলিয়া গিয়াছে ; সুতরাং আমি নিজেই তাহাকে লইয়া পরিচালন করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম। প্রিয়াজীর মন্দিরের পাহাড়ের নিম্নভাগে আসিলে, তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইবার ইচ্ছা আমার খুব বলবতী হইল, কিন্তু গাভীটিকে ছাড়িয়া পাহাড়ের উপর চড়িয়া গেলে গাভীটি অন্যস্থানে পলায়ন করিয়া যাইতে পারে আশঙ্কায় পাহাড়ে চড়িতে সাহস হইল না। তখন মনে মনে নানাপ্রকার আন্দোলন করিয়া স্থির করিলাম যে প্রিয়াজীকে দর্শন করিতে আমি এই-ক্ষণে যাইতে পারিব না। কারণ গাভীটিকে ছাড়িয়া যাওয়া উচিত নহে, আর এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে ভগবান্‌কে লাভ করাতেই প্রিয়াজীর মাহাত্ম্য হইয়াছে, আমার গুরুদেবও যখন ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে দর্শন করিলেই আমার প্রিয়াজীর দর্শন হইবে, অতএব গাভীর সহিত শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া গিয়া তাঁহাকেই দর্শন করিব। আমি এইরূপ নিশ্চিতবুদ্ধি হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই, অপর সাধুসকল আসিয়া গাভীটাকে আমার রক্ষণ হইতে লইয়া গেলেন, এবং আমি এককই চলিতে লাগিলাম। আমি আরও অল্পদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে আমার কিয়দ্দূর অগ্রে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ

দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি অতি প্রসন্নবদনে "আও আও" বলিয়া আমাকে আহ্বান করিলেন, আমি তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিলাম, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম। তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিবার পর প্রথমেই তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "বাবা, প্রিয়াজীকা দর্শন ঔর সন্তন্ কি দর্শন একই হ্যায়, ইস্‌মে কুচ্ ভেদ নহি।" আমি এইরূপই পূর্ব্বে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম, সুতরাং তাঁহার ঐ বাক্যে আমি তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলাম। পরে চলিতে চলিতে অতিশয় স্নেহের সহিত আমাকে নানাবিধ প্রসঙ্গ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ উপদেশ করিতে লাগিলেন। গরীবদাসজীর সহিত তিনি কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাঁহার গুরুদেব তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন, এই সমস্ত কথা প্রসঙ্গক্রমে আমাকে বলিতে লাগিলেন। গরীবদাসজীর অনেক প্রশংসা করিয়া এবং তাঁহার গুরুনিষ্ঠাপ্রকাশক অনেক ঘটনা বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিলেন, "বাবা! গরীবদাসত যথার্থ শান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার ক্রোধ অভিমান প্রভৃতি মিটিয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য নানা সময়ে নানাপ্রকার ছল করিয়া তাহার প্রতি আমি অতি কঠোর ব্যবহার করিতাম। গরীবদাস অতি প্রেমের সহিত এবং অতি সন্তর্পণে আমার সেবা শুশ্রূষার কার্য্য করিত। আমি গোপনে গোপনে তাহার অসাক্ষাতে পাকের আয়োজনের

এবং অন্যান্য বস্তুসম্ভারের উলট পালট করিয়া ব্যতিক্রম করিয়া রাখিতাম, এবং গরীবদাস আসিলে তাহার প্রতি তৎসমস্তের দোষারোপ করিয়া সকলের সাক্ষাতে তাহাকে কঠোরভাষায় তিরস্কার করিতাম। কিন্তু গরীবদাস তাহাতে কখনও ধৈর্য্যচ্যুত হইত না, এবং আমার বাক্যের কোন প্রকার প্রত্যুত্তর না করিয়া নীরবে পুনরায় সমস্ত কার্য্য সংশোধন করিত। একদিবস তাহার শেষ পরীক্ষা করিব মনে করিয়া আমি উপযুক্ত সময় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তখন ব্রজপরিক্রমার সময় উপস্থিত হইল। নন্দগ্রাম হইতে কামই যাইতে সম্মুখে সূর্য্য করিয়া পূর্ব্বমুখে যাইতে হয়; কামই নন্দগ্রাম হইতে পাঁচক্রোশ ব্যবধান, এবং রাস্তাও অনেক সময় জল কাদায় পরিপূর্ণ থাকে। গরীবদাস আমার জিনিষপত্র স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতেন, এবং প্রায় ৪০।৫০ জন সাধুর রসুই করিয়া সকলকে আহার করাইতেন ও অবশেষে নিজে আহার করিতেন। একবার ঐ পরিক্রমার সময় নন্দগ্রাম হইতে কামই পৌঁছিতে আমাদিগের প্রায় বেলা দ্বিপ্রহর হইল। গরীবদাস কামই পৌঁছিয়া যথা-নিয়মে আমার ছাতা পুঁতিয়া আমার আসন বিছাইয়া দিল, এবং জিনিষপত্র যথাস্থানে স্থাপিত করিল। পরে ব্রজবাসিগণ আমাদের ভোজনের খাদ্যসামগ্রী উপস্থিত

করিলে গরীবদাস স্নান করিয়া রসুই করিতে গেল, এবং অপর সাধুদিগের নিমিত্ত মোটা রুটী এবং আমার জন্য পৃথক্‌রূপে পাতলা পাতলা করিয়া রুটী প্রস্তুত করিল। বহুলোকের নিমিত্ত রসুই করিতে বিলম্ব হইল। সন্ধ্যার পর রসুই প্রস্তুত হইলে যথানিয়মে ঠাকুরের ভোগ লাগাইয়া আমাকে প্রসাদ পাইবার নিমিত্ত আহ্বান করিল। আমি এই সময় গরীবদাসের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিলাম। ভাবিলাম প্রতিদিন ভারি মোট বহন করিয়া পরিক্রমার রাস্তা চলিতে চলিতে এবং প্রতিদিন অবেলায় এত-লোকের রসুই করিতে করিতে গরিবদাসের বায়ু ও পিত্ত অবশ্য অতিশয় কুপিত হইয়াছে, বিশেষতঃ অদ্য সম্মুখে রৌদ্র করিয়া সূর্য্যের শরৎকালীয় প্রচণ্ড উত্তাপে দুর্গমপথে এতদূর চলিয়া আসিয়া অনাহারে থাকিয়া এত দীর্ঘকাল রসুইয়ের নিমিত্ত অগ্নিসেবা করাতে গরীবদাসের মস্তিষ্ক এইক্ষণে অতিশয় উত্তপ্ত হইয়াছে ; এই সময়ই তাহার ধৈর্য্যপরীক্ষার উপযুক্ত সময়। এই ভাবিয়া আমি গরীবদাসের আহ্বানে প্রসাদ পাইতে গেলাম, এবং প্রসাদ পাইতে বসিয়া রুটীতে হাত দিয়া ছল ক্রোধ করিয়া সেই সমস্ত রুটী কাঁচা রহিয়াছে বলিয়া আমি গরীবদাসকে তিরস্কার করিতে করিতে রুটী সকল দূরে নিক্ষেপ

করিলাম, এবং এক লাঠি হাতে লইয়া তাহার মস্তকের উপর আঘাত করিলাম। লাঠির আঘাতে গরীবদাসের মস্তক হইতে রুধির নির্গত হইল, এবং গরীবদাস ভূমিতে পতিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই গরীবদাস-উত্থিত হইয়া করযোড়ে আমার চরণে পতিত হইল এবং বলিল "বাবাজী মহারাজ! আমার অপরাধ হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা করুন।" রুটী বাস্তবিক অতি উত্তমরূপে আদরের সহিত গরীবদাস প্রস্তুত করিয়াছিল, আমি মিথ্যা করিয়া তাহার উপর দোষারোপ করিয়াছিলাম। কিন্তু তথাপি গরীবদাস এইরূপ বিনয়পূর্ণ ব্যবহার করিলে আমি মুগ্ধ হইলাম, এবং গরীবদাস যে আমার লাঠির আঘাতে এরূপ কষ্ট পাইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া আমার এইরূপ কষ্ট হইল যে আমি দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত আহার করিতে পারিলাম না। গরীবদাস এই শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে আমি তাহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইলাম, এবং মনে করিলাম যে এইক্ষণে গুরুর নিকট হইতে গরীবদাসের বরলাভ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমি তাহাকে বর দান করিব। কিন্তু পরে ভাবিলাম যে সংসারে থাকিলেই কিছু না কিছু কষ্ট আছে। গরীবদাস যখন এইরূপ দৃঢ় শান্তিবৃত্তি লাভ করিয়াছে, তখন তাহাকে অতি শীঘ্র

বৈকুণ্ঠে পাঠান উচিত, এই মনে করিয়া তাহাকে অন্য আর বর দিলাম না।"

তাঁহার প্রতি তাঁহার গুরুদেবের ব্যবহার সম্বন্ধে নানাবিধ ঘটনার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আমাকে অবশেষে বলিলেন যে তাঁহার প্রতি তাঁহার গুরুদেবের প্রেম এত অধিক ছিল যে তিনি কখনই তাঁহাকে যথার্থ শান্তিমার্গে প্রেরণ করিতে ভুলিতেন না। ভাঙ্গি, চামার, "পেট্‌কি বাস্তে বৈরাগ লিয়া" ইত্যাদি বাক্য সর্ব্বদাই তাঁহার প্রতি ব্যবহার করিতেন। তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "মহারাজ! এইরূপ সর্ব্বদা গালাগালি করিতেন, তাহাতে প্রেম কিরূপ প্রকাশ পায় আমি বুঝিতে পাবিলাম না।" তাহাতে তিনি বলিলেন "বাবা! ইহাতেই ত ভারী প্রেম প্রকাশ পায়, আমাকে কেহ এইরূপ গালি দিলে যাহাতে আমার ক্রোধ অথবা অভিমান না হয়, তন্নিমিত্ত দয়াল গুরু নিজের উপর কঠোর ভাষিত্বের দোষ আনিয়া ও আমার চিত্ত নির্ম্মল করিবার নিমিত্ত—ক্রোধ, অভিমান দূর করিবার নিমিত্ত এইরূপ ব্যবহার করিতেন। বাবা, তাঁহার কোন মোহ ছিল না, নির্ম্মল প্রেম ছিল; প্রেম এবং মোহ এক বস্তু নহে।"

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তম অধ্যায়

উপদেশ ও অন্তর্দ্ধান

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সময় সময় বলিতেন,

"কর সদ্‌গুরুকি আশ
হোয় ঘট্‌মে প্রকাশ
হোয় তিমির কি নাশ।"

তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহারাজ! সদ্‌গুরুর কৃপা বিনা কি জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে না? অনেকে ভগবানের নাম গ্রন্থাদি হইতে শিক্ষা করিয়া অনেক প্রকার সাধন করিয়া থাকেন; তাহাতে কি কিছু ফল হয় না?" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "বাবা! ভগবানের নাম সাধনে অনেক ফল হয়, খুব নিষ্ঠাপূর্ব্বক করিতে করিতে অনেক প্রকার সিদ্ধিও লাভ হইতে পারে, কিন্তু মুক্তির সাধন ইহা দ্বারা হয় না, কেবল সদ্‌গুরুর কৃপাতেই জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে; তদ্ভিন্ন জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে না।"

বস্তুতঃ সদ্‌গুরুর কৃপা ভিন্ন যে প্রকৃত আস্তিক্যই জন্মে না, তাহা আমি নিজের জীবনে বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। একটি বালক আমার সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিলে আমি অনেক কুকর্ম্ম করিতে পারি না, এবং তাহার সাক্ষাতেও আমার কুপ্রবৃত্তি-সকল উদ্বোধিত হইতে পারে না, ইহা অনেক সময় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু নির্জ্জনে কেহ দেখিতে পায়

না বলিয়া সাহসের সহিত অনেক কুকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছি। অপরে দেখিতে পায় না বলিয়া মনে কুচিন্তার স্রোত অনেক সময় প্রবাহিত হইয়া থাকে ; কিন্তু অন্তর্দ্দর্শী কোন মহাপুরুষের সাক্ষাতে যখন যখন উপস্থিত হইয়াছি, তখনই অতি সন্তর্পণে কাল কাটাইয়াছি, এবং যাহাতে মনে কোন প্রকার কুচিন্তার উদয় তৎকালে না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছি। মহাপুরুষ মনের সমস্ত চিন্তা জানিতে পারেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার সমক্ষে সন্তর্পণে কাল কাটাইয়াছি, কিন্তু অন্য সময়ে মনে কুচিন্তার উদয় হইলে, আমি তন্নিমিত্ত তেমন ভীত হই নাই। ইহাতে কি আমার যথার্থ আস্তিক্য বুদ্ধিপ্রকাশ পায় ? আমি মুখে বলি অন্য এক ব্যক্তি নাস্তিক, আমি আস্তিক, এবং তন্নিমিত্ত হয়ত তাহার নিন্দা করিয়া থাকি ; কিন্তু সত্য সত্যই কি আমি আস্তিক ? আমি মুখে বলিতেছি যে ভগবান্ আছেন, কিন্তু তাঁহার অস্তিত্বে কি সত্য সত্যই আমার বিশ্বাস আছে ? যদি যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তবে আমি কি প্রকারে অন্যায় কর্ম্ম করিতে পারি, কি প্রকারেই বা কুচিন্তাকে মনে স্থান দিয়া অনুতাপ না করিয়া থাকিতে পারি ? ভগবান্ সর্ব্বান্তর্যামী এবং সর্ব্বব্যাপী, আমার প্রত্যেক কার্য্যের এবং প্রত্যেক চিন্তার সাক্ষী, ইহাই ত ভগবানের লক্ষণ। যদি তাঁহার অস্তিত্বে আমার সত্য সত্যই বিশ্বাস থাকে, তবে পাঁচ বৎসরের শিশুর সাক্ষাতে যে কুকর্ম্ম আমি করিতে না পারি, একজন মহাপুরুষ, আমার মানসিক চিন্তা অবগত হইতে সমর্থ থাকা বিশ্বাস থাকাতে তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া যে সকল কুচিন্তাকে মনে স্থান দিতে

না পারি, সেই সকল কুকার্য্য এবং কুচিন্তা, আমি স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাতে থাকিয়া কি প্রকারে সাধন ও পোষণ করিতে পারি? ভগবান্ বলিলেই ত সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বসাক্ষী এবং সর্ব্বব্যাপী হইয়া তিনি আছেন, বুঝা যায়। তিনি আমার সমক্ষে তবে নিত্যই বর্ত্তমান আছেন, আমার সমস্ত কার্য্য এবং সমস্ত চিন্তা দর্শন করিতেছেন; আমি যদি এই কথা যথার্থই বিশ্বাস করি, তবে আমার দ্বারা কি প্রকারে কুকার্য্য সাধিত হইতে পারে, এবং পাপ-চিন্তারই বা আমি কি প্রকারে মনে স্থান দিতে পারি? যখন আমি পাপকার্য্য এবং পাপচিন্তা হইতে বিরত হইতে পারিতেছি না, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে আমার আস্তিক্যের গর্ব্ব বৃথা, এবং আমার প্রকৃত আস্তিক্য জন্মে নাই।

দয়াল সদ্গুরু কি প্রকারে অনুগত শিষ্যের অন্তরে এই আস্তিক্য-বুদ্ধি অল্পে অল্পে প্রবিষ্ট করান, তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমার এবং আমার স্ত্রীর জীবনের কয়েকটি ঘটনা এই স্থলে উল্লেখ করিতেছি। আমি অনুমান করি যে আমার আভ্যন্তরিক নাস্তিক্য অতিশয় প্রবল, এইজন্য দয়াল গুরু কৃপা করিয়া নানা সময়ে তাঁহার অন্তর্য্যামিত্বের এবং সামর্থ্যের পরিচয় আমাকে দিয়াছেন; নতুবা আমার মত শুষ্ক তার্কিকের কিঞ্চিন্মাত্রও যথার্থ আস্তিক্য-বুদ্ধি পাওয়া কঠিন হইত। এই সকল ঘটনা দ্বারা শ্রীশ্রীমদ্ বাবাজী মহারাজের অপার করুণা প্রকাশ পাইবে; এই নিমিত্ত, এইস্থলে তাহা উল্লেখ করিতেছি :—

একবার কলিকাতায় আমার খুব জ্বর হইল। জ্বর ভোগ করিতে করিতে আমার মনে এইরূপ চিন্তা হইল যে, শ্রীযুক্ত গুরু

মহাঁরাজজী সর্ব্বদা গাঁজা খাইয়া থাকেন। আমি এক চিলিম গাঁজা আনাইয়া নিজে সাজিয়া তাঁহার ভোগ দিব, এবং তৎপর তাঁহার প্রসাদী গাঁজার ধূমপান করিব, তাহাতেই আমার এই জ্বর ও শরীরের ব্যথা সারিয়া যাইবে। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া নূতন একটি গাঁজার কল্কি ও কিছু গাঁজা বাজার হইতে আনাইলাম, এবং নিজের হাতে নিয়মিতরূপে গাঁজা সাজিয়া শ্রীযুক্ত গুরু মহারাজকে স্মরণ করিয়া তাঁহার পানার্থ ঐ গাঁজার চিলিম নিবেদন করিলাম। গাঁজা আপনা হইতে জ্বলিয়া, তাহা হইতে ধূম অল্প অল্প করিয়া বাহির হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ এই রূপে গত হইলে, আমার মনে ধারণা হইল, যে তিনি ইহার ধূম পান করিয়াছেন। তৎপর আমি ঐ কল্কিটি লইয়া অবশিষ্ট গাঁজার ধূমপান করিলাম। গাঁজা খাওয়া আমার কখনও অভ্যাস ছিল না, কিন্তু এই ধূম আমি যথেষ্ট পরিমাণে পান করিলেও তাহাতে আমার বুদ্ধিবৃত্তির কিছুমাত্র বিকৃতি ঘটিল না; পক্ষান্তরে ইহার পর অল্প সময়ের মধ্যেই আমার জ্বরত্যাগ হইল; এবং আমি সুস্থ হইলাম। এইরূপ আর একবারও জ্বর হইলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে স্মরণ করিয়া গাঁজার ভোগ দিয়া আমি প্রসাদ পান করিয়াছিলাম।

এই ঘটনার কয়েকমাস পর আমি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট আসিলাম। এইখানে আমি তাঁহার সঙ্গে কয়েক দিবস অবস্থিতি করিবার পর, যে দিবস কলিকাতায় ফিরিয়া যাই সেই দিবস কলিকাতায় যাত্রা করিবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কয়েকজন ব্রজবাসীর সঙ্গে

একত্র বসিয়া গাঁজা পান করিতেছিলেন, সেই সময় আমাকে অন্য ঘর হইতে তাঁহার নিকট ডাকাইয়া নিলেন, এবং নিজে যে চিলিমে গাঁজা পান করিতেছিলেন, তাহা আমাকে দিয়া বলিলেন, "তুমি এই প্রসাদী গাঁজার ধূম পান কর।" তখন একটি ব্রজবাসী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুও কি গাঁজা খায় ?" তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন, "না, বাবু গাঁজা খায় না ; তবে জ্বর হইলে কখন কখন বাবাকে স্মরণ করিয়া গাঁজার ভোগ দেয়, এবং সেই প্রসাদ গ্রহণ করে।" আমি তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় পুলকিত হইলাম এবং বুঝিলাম যে কলিকাতায় আমি তাঁহার উদ্দেশ্যে যে গাঁজার ভোগ দিয়াছিলাম, তাহা তিনি যথার্থই গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার বসতি শ্রীবৃন্দাবন হইতে অতিদূর স্থানে থাকিলেও আমার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি অপ্রতিহত থাকে।

একবার আমার ওকালতী ব্যবসায়ের কার্য্যোপলক্ষে আমি কলিকাতা ছাড়িয়া কয়েকদিনের জন্য মফঃস্বলে গিয়াছিলাম। আমি কলিকাতা ছাড়িয়া গেলে, কলিকাতায় খুব চোরের ভয় হইয়াছিল। দোতলার উপর বাহির হইতে চোর উঠিয়া জানালার দ্বারা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অনেক বাড়ী হইতে জিনিষপত্র চুরি করিয়া লইয়া যায় ; এই সংবাদ শুনিয়া আমাদের বাড়ীর সকলে অতিশয় ভীত হইয়াছিল। আমাদের বাড়ীর দোতলায় আমার স্ত্রী এবং তাঁহার একটি অল্পবয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভিন্ন আর কেহ তৎকালে থাকিত না। শয়নঘরের জানালা ও দরজা সকল রাত্রে খোলা রাখিয়াই সচরাচর আমার স্ত্রী শয়ন

করিতেন। আমি তৎকালে বাড়ীতে না থাকাতে চোরের ভয়ে ভীত হইয়া ঐ ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া তাঁহার শয়ন করিতে হইত; এবং চোরের ভয়ে তিনি এত অধিক ভীতা হইয়াছিলেন যে, রাত্রে নীচের তলায় পর্য্যন্ত একাকী যাইতে ভয় করিতেন। একদিন রাত্রে তাঁহার এত গরম বোধ হইল যে, অন্ততঃ কিছুকালের জন্য একটি জানালা খুলিয়া দিবেন মনে করিয়া সভয়ে একটি জানালা খুলিলেন। কিন্তু জানালা খুলিবামাত্র দেখিলেন যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ঐ জানালার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন, এবং তাঁহাকে সহাস্যবদনে বলিলেন, "মাই, তোমারা ডর্ কাহেকা, হাম্ ত তোমারি সঙ্গ্‌মে সদাই রয়তেহেঁ।" এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন, এবং আমার স্ত্রীর অন্তরে যে ভয় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা সমূলে উৎপাটন করিয়া তাহার স্থানে অসাধারণ সাহসিকতা তৎক্ষণাৎ স্থাপন করিয়া দিলেন। তখন স্ত্রী পূর্ব্ববৎ সমস্ত জানালা দরজা খুলিয়া দিয়া পরম প্রীতমনে শয়ন করিলেন। আমি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে আদ্যোপান্ত এই বৃত্তান্ত আমাকে তিনি শুনাইলেন।

একবার আমার স্ত্রীর জ্বর হইয়াছিল; তৎকালে অন্য কোন স্ত্রীলোক বাড়ীতে ছিল না। তিনি যে ঘরে শয়ন করিতেন, তাহার ঠিক পশ্চিম দিকে আর একটি ছোট ঘর; তাহার পশ্চিমের ঘরে আমি শয়ন করিতাম। তিনটি ঘরের মধ্যেরই দরজাগুলি খোলা থাকিত, সুতরাং রাত্রে পরস্পরের খবর লইতে কিছু অসুবিধা হইত না। একদিন মধ্যরাত্রে স্ত্রীর জ্বরের বেগ

অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, এবং গাত্রদাহ প্রভৃতি যাতনায় তিনি খুব কষ্ট পাইতে লাগিলেন ; কিন্তু পাছে আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহার যাতনা মুখে কোন প্রকার প্রকাশ না করিয়া, নিঃশব্দে সহ্য করিতে লাগিলেন। পরে যাতনা এত বাড়িয়া গেল যে তাহাতে তিনি অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। যখন এই যাতনা একেবারে অসহনীয় হইয়া পড়িল, তখন হঠাৎ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইলেন, এবং তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার যাতনা সমস্ত তখন তিরোহিত হইল, এবং তিনি অতিশয় আরাম বোধ করিতে লাগিলেন। সুস্থ বোধ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দণ্ডবৎ করিতে মনন করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। দণ্ডবৎ করিতে পারিলেন না বলিয়া স্ত্রী তখন অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

একবার আমি আমাদের দেশের বাড়ী হইতে এক হাতীর উপর চড়িয়া শ্বশুর বাড়ীতে যাইতেছিলাম। হাতীর উপর কেবল মাহুত ও আমি ছিলাম ; মাহুত হাতীর স্কন্ধের উপরে, এবং আমি পৃষ্ঠের উপরে বসা ছিলাম। শ্বশুর বাড়ীর অতি নিকটে এক কুচা রাস্তা দিয়া হাতী যখন চলিতেছিল, আমি তখন অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম। হঠাৎ দেখিলাম, ঠিক আমার মুখের সম্মুখে, মাহুত ও আমার মধ্যে একটি বৃক্ষের একটি বৃহৎ শাখা রহিয়াছে। মাহুত স্বীয় শির ও দেহ অবনত করিয়া হাতীর মাথার উপরে শুইয়া পড়িয়া ঐ ডালটি অতিক্রম করিয়াছে। ঐ

বৃহৎ ডালের চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট শাখা বাহির হইয়াছে ; তাহার দুই একটি আমার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে ; হাতীও বেগের সহিত চলিতেছে। এমন সময় নাই যে আমি শরীর ও মস্তক নত করিয়া হাতীর পৃষ্ঠের উপর মাহুতের ন্যায় শুইয়া পড়িয়া ঐ বৃহৎ ডালটি অতিক্রম করি। এই অবস্থায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কেবল চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিলাম, এবং মনে করিলাম যে এক্ষণে আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নাই ; ঐ ডালে আহত হইয়া অবিলম্বেই ভূমিতলে পতিত হইতে হইবে, এবং ঐ বৃহৎ ডাল হইতে শিকের মত যে ছোট ছোট শাখা বাহির হইয়াছে, তাহাতে ঘসা লাগিয়া আমার মুখের মাংস নানাস্থানে ছিন্ন হইয়া যাইবে। এই ভাবিয়া আমি অগত্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। কিন্তু অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ বৃহৎ ডাল দূরে থাকুক, ইহার একটি ক্ষুদ্র শাখাও আমার গায় লাগিল না। আমি ক্ষণকাল পরে চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম ঐ বৃহৎ ডালটি আমার পশ্চাৎদিকে রহিয়াছে, হাতী ইহা পার হইয়া আসিয়াছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার কিরূপে ঘটিল তাহা আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। এই বৃহৎ ডাল ভেদ না করিয়া কোন প্রকারেই ইহাকে অতিক্রম করিবার সম্ভাবনা ছিল না ; অথচ যেমন শূন্যস্থান দিয়া শরীর যায় তদ্রূপ ইহাকে অতিক্রম করিয়া আমি চলিয়া আসিয়াছি। ইহা কিরূপে ঘটিল, তাহা আমার বুদ্ধি দ্বারা কোন প্রকারেই মীমাংসা করিতে পারিলাম না। কিন্তু এই বিষয় কাহাকেও কিছু বলিলাম না, কারণ অপরকে ইহা বলা বৃথা। এই ঘটনার অল্প কয়েকদিবস

পরেই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট আসিলাম। এইখানে আসিলে তিনি নিজ হইতে বলিলেন "বাবা! ডাল তোমার কি করিতে পারে, ভগবান্ সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন, এবং তোমাকে রক্ষা করিতেছেন।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে আমার মনের জিজ্ঞাসা শান্ত হইল, এবং শ্রীগুরুদেবের দয়া এবং অপরিসীম শক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহার আশ্রয়লাভ করাতে আমি আপনাকে ধন্য বোধ করিতে লাগিলাম।

এইরূপ বহুবিধ ঘটনা আমার জীবনে শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে ঘটিয়াছে। এইস্থলে আর অধিক করিয়া এইরূপ ঘটনা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। আমার জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অভয় বাবুর বর্ণিত আর কয়েকটি ঘটনা এইস্থলে উল্লেখ করিতেছি ;—

শ্রীযুক্ত অভয় বাবু একবার একটি রেলওয়ে কর্ম্মচারীর সঙ্গে কয়েক দিন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিয়াছিলেন। সেই রেলওয়ে কর্ম্মচারীর বাসস্থান রেলওয়ে লাইনের নিকট এক অতি নিভৃতস্থানে ছিল, তাহার নিকটে দুই তিন ক্রোশ মধ্যে কোন গ্রাম ছিল না, চতুর্দ্দিকে কেবল পাহাড় ও জঙ্গল ছিল। সেই কর্ম্মচারীর রেলওয়ে পর্য্যবেক্ষণ করাই কর্ম্ম ছিল। এক দিবস তিনি তাঁহার কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে চলিয়া গেলে, তাঁহার চাকরটিরও বাড়ী যাওয়া প্রয়োজন জানাইয়া বৈকালে সে তথা হইতে চলিয়া গেল। তখন অতিশয় গ্রীষ্মের সময় ছিল। রাত্রে গৃহাভ্যন্তরে শয়ন করা অসম্ভব ছিল ; সুতরাং অভয় বাবু গৃহের সম্মুখস্থ একটি বৃক্ষতলে খাটিয়া পাতিয়া তদুপরি শয়ন

করিলেন। কিন্তু এই জনমানব শূন্য জঙ্গলাবৃত স্থানে অন্ধকার রাত্রে একক থাকিতে তাঁহার মনে ভীতির সঞ্চার হইল; এবং অতিশয় গ্রীষ্ম হেতু কষ্ট বোধও করিতে লাগিলেন। সেই সময় তিনি হঠাৎ বোধ করিলেন যে তাঁহার শিরোদেশের পার্শ্বে বসিয়া কেহ তাঁহাকে পাখা ব্যজন করিতেছে। তিনি তখন মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজই তথায় বসিয়া পাখা করিতেছেন। তিনি তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শয্যা হইতে উঠিবেন মনে করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপ সেই রাত্রিতে তিনবার তাঁহাকে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ পাখা ব্যজন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি দেখিবামাত্র অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিলেন। তৎপর তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে সেইস্থানে রক্ষা করিতেছেন; পরে তিনি নির্ভীক হইয়া আশ্বস্তচিত্তে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন; আর তাঁহার কোন উদ্বেগ হইল না।

কলিকাতায় কোম্পানীর কাগজের কারবারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া শ্রীযুক্ত অভয় বাবু বহু পরিমাণে ঋণী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাতে উত্তমর্ণগণ তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী বাহির করিবে বলিয়া কলিকাতা ছাড়িয়া, নানা তীর্থস্থানে গিয়া অল্প অল্প কালের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই অবস্থায় তিনি একবার অযোধ্যায় বাস করিতেছিলেন, এবং এই অবস্থায়ই, ইহার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করা কালে, তিনি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষা অযাচিতভাবে প্রাপ্ত হন।

অযোধ্যায় এইবার কয়েকদিবস বাস করিবার পর, তাঁহার মনে অতি হতাশের ভাব উপস্থিত হইল। তিনি মনে ভাবিলেন "আমি এইরূপে কতকাল অবস্থিতি করিব। ভগবান্‌কে কতই ডাকিলাম, তিনি যদি বাস্তবিক থাকিতেন, তবে অবশ্য আমি তাঁহার দর্শনলাভ করিতাম, এবং তিনি আমার দুঃখ বিমোচন করিতেন। আমার বোধ হইতেছে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্ত মিথ্যা। এই জীবন আমার পক্ষে অন্ধকারময় বলিয়াই বোধ হইতেছে, অতএব আমি স্থির করিলাম যে এই দেহ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর। অতএব আগামী কল্য সরযূ নদীর উপরে যে পুল আছে, সেই পুল হইতে ঝাঁপ দিয়া নদীতে পড়িয়া আমার সমস্ত কষ্টের শান্তি করিব।"

এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি আপন শয্যায় শয়ন করিলেন। তিনি শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার গৃহাভ্যন্তরে আবির্ভূত হইলেন, এবং তাঁহাকে ধমকাইয়া বলিলেন "এইরূপ শুইয়া শুইয়া থাকিয়া কাল কাটাইবে আর ভগবান্ তোমাকে দর্শন দিবেন !! আমি তোমাকে নাম বলিয়া দিয়াছি, তুমি কেন নাম কর না ; অম্‌নি কি ভগবান্‌কে পাওয়া যায় ?" এইরূপে ভৎর্সনা করিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। অভয় বাবু ভীত হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং নাম করিতে লাগিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরেই বিশ্বব্যাপী অমৃতময় ব্রহ্মজ্যোতিঃ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইল, এবং তিনি আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। কিছুকাল তাঁহার এইভাবে সর্ব্বত্র ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শন করিতে করিতে অতিবাহিত

হইল। তৎপরে এক দিবস হঠাৎ ইহা অন্তর্হিত হইয়া গেল, এবং তিনি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। ইহার কিয়দ্দিবস পর তিনি শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন, "কেমন, ভগবান্ আছেন বলিয়া ত এখন তোমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে? তোমার কোন চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই; তুমি আপন ঘরে থাক, অথবা অন্যত্র যেখানেই থাক, কেহ তোমাকে ঋণের জন্য উত্যক্ত করিবে না; তুমি নির্ভয়চিত্তে ঘরে গিয়া বাস করিতে পার।" অতঃপর অভয় বাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন ও দেখিলেন যে তাঁহার উত্তমর্ণসকল তাঁহার সহিত অতিশয় সদ্ব্যবহারই করিতে লাগিল।

একবার গয়াধামে বাস করা কালে শ্রীযুক্ত অভয় বাবুকে স্বপ্নাবস্থায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ দর্শন দিয়া একজন সাধুকে দর্শন করাইয়া বলিলেন, "ইনি মহাত্মা, তুমি ইঁহার সঙ্গে থাকিতে পার, ইঁহার সঙ্গ করিলে কল্যাণ হইবে।" এই স্বপ্ন দর্শনের পর, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া ঘটনাক্রমে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং স্বপ্নে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ যে মহাত্মাকে দেখাইয়াছিলেন, ইনিই সেই সাধু বলিয়া পরিচয় পাইয়া, তাঁহার সঙ্গে এক বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর একদিন যমুনাতটে বেড়াইতে বেড়াইতে, তিনি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন "গয়াধামে স্বপ্নে আপনার দর্শনলাভ

করিয়াছিলাম।” তিনি এই কথা বলিবামাত্র, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন “হাঁ, স্বপ্নে আমি তোমাকে দর্শন দিয়াছিলাম, এক্ষণে ত সেই স্বপ্ন তুমি সত্য বলিয়া জানিতে পারিয়াছ। সেই মহাত্মার সহিত ত এক্ষণে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি সাচ্চা সাধু, সাধু একেই বলে, ইঁহার সঙ্গে থাকিলে তোমার কল্যাণ হইবে। চল, আমিও তোমার সঙ্গে তাঁহার নিকট যাইব।” এই কথা বলিয়া শ্রীযুক্ত অভয় বাবুকে সঙ্গে করিয়া যাইয়া উক্ত গোস্বামী প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া উপবেশন করাইলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার দেশ কোথায়, আপনি এইখানে কতদিন হইল আসিয়াছেন, কিরূপে আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়—ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত অভয় বাবু তাঁহার তৎকালীন ব্যবহার দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এবং শ্রীযুক্ত গোস্বামী প্রভু বলিলেন, ইনি গর্গ নারদ যে শ্রেণীর লোক সেই শ্রেণীর ভক্ত। এইরূপে অন্যান্য শিষ্যদিগের মধ্যেও কাহাকে কাহাকে সময় সময় দর্শন দিয়া, তাঁহাদিগকে ভগবদ্-বিষয়ে চৈতন্য-সম্পন্ন করিয়াছেন।

অধিকন্তু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ মানবলীলা সম্বরণ করিবার পরেও আমাদিগকে সময় সময় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দর্শন দিয়া উৎসাহিত করিতে এবং তাঁহার স্মৃতি সর্ব্বদা জাগরূক রাখিতে ত্রুটি করিতেছেন না।

এই শ্রেণীর ঘটনা আর অধিক বর্ণনা করিয়া এই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক। এই স্থলে অধিকন্তু এই মাত্র বলিতেছি যে কেবল তাঁহার শিষ্য আমাদিগকে যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এইরূপ দর্শন দিতেন তাহা নহে। আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যেও কেহ কেহ তাঁহাকে এইরূপে দর্শন লাভ করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে একটি মাত্র ঘটনা এইস্থলে উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায় বিভাগ শেষ করা যাইতেছে।

আমি কলিকাতায় কম্বলীয়াটোলায় থাকা কালে বৈঠকখানা ঘরে যে স্থানে আমি সর্ব্বদা বসিতাম তাহার উপরে দেওয়ালের গায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের একখানি ছবি টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত বিহারী লাল চট্টোপাধ্যায় নামে আমার একজন ধর্ম্মবন্ধু ছিলেন। তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে অতি নিষ্ঠাসম্পন্ন সাত্ত্বিক স্বভাবের ভক্তিমান্ লোক ছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য অতিশয় খারাপ হওয়াতে তিনি সাঁওতাল পরগণার একস্থানে জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গমন করিয়া তথায় কিয়দ্দিবস বাস করেন। তৎপরই কলিকাতা আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ঐ কম্বলীয়াটোলার বাটীতে আসেন। তিনি বৈঠকখানা ঘরে প্রবিষ্ট হইয়াই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ঐ ছবিটি দর্শন করিয়া আমাকে একটু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এই মহাপুরুষের দর্শন কোথায় পাইলেন ?" আমি বলিলাম, "এইখানা আমার গুরুদেবের ছবি।" তিনি বলিলেন "আমি ইঁহাকে সাঁওতাল পরগণায় যে যে স্থানে ছিলাম, সেইস্থানে দর্শন করিয়া আসিয়াছি। আমি যে

বাড়ীতে ছিলাম তাহার নিকটে একটি অশ্বত্থ গাছতলায় তিনি তিন দিবস আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। আমি প্রতিদিন তাঁহার নিকট যাইয়া বসিতাম। তিনি আমাকে বড় স্নেহ ও আদর করিতেন।” বাস্তবিক তৎকালে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন। সুতরাং আমি বলিলাম যে “আমার শ্রীগুরুদেব ত এক্ষণে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছেন। তিনি সাঁওতাল পরগণায় এক্ষণে যাইবার ত কোন সম্ভাবনা নাই। আপনি তথায় কিরূপে তাঁহার দর্শন পাইলেন বুঝিতেছি না।” তিনি বলিলেন, “আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে ইঁহাকেই আমি সাঁওতাল পরগণায় সম্প্রতি তিন দিবস ক্রমান্বয়ে দর্শন করিয়াছি। এই বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।” আমি তাঁহার এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। পরে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া আমি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি হাসিয়া বলিলেন “বাবা! কখনও কখনও অন্যস্থানে অন্যলোকেও আমার দর্শন সময় সময় লাভ করিয়া থাকে; ইহার রহস্য এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না, পরে বুঝিবে।”

আমি দীক্ষা প্রাপ্ত হইবার পরে ক্রমশঃ বঙ্গদেশীয় অনেক লোক শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদিগের অধিকাংশই পল্লীগ্রামবাসী এবং সাধারণতঃ অশিক্ষিত। ইঁহাদিগের আচার ব্যবহার, এবং সাধারণতঃ বঙ্গদেশবাসীর আচার ব্যবহার অনেকস্থলে শাস্ত্র এবং সাধুদিগের পদ্ধতি বিরুদ্ধ। মৎস্যাহারী বলিয়া বঙ্গদেশের লোককে উত্তর পশ্চিম

অঞ্চলের অনেক স্থানের লোক যথেষ্ট ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এই সমস্ত কদাচারের বিষয় জানিয়াও অনেক উপায়হীন দরিদ্র বঙ্গবাসীকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় যে মৎস্যাহারের প্রথা আছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার অভিমত নিম্নলিখিত ঘটনায় প্রকাশ পাইবে।

এক দিবস শ্রীবৃন্দাবনের আশ্রমে সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এবং কয়েকজন ব্রজবাসী বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া ছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে বাঙ্গালীদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কথা উপস্থিত হইলে, একজন ব্রজবাসী বলিলেন যে অন্যান্য বিষয় যেমনই হউক, বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত মাছ খায়, ইহা অতি ঘৃণিত আচার। আমি তাহার উত্তরে বলিলাম, "আপনাদের দেশে ইহার ব্যবহার নাই, এইজন্য ইহাকে আপনারা এত ঘৃণা করিয়া থাকেন; কিন্তু আপনাদের দেশেও এমন অনেক আচার আছে, যাহা বাঙ্গালীর চক্ষে অতিশয় ঘৃণনীয়। আপনাদের দেশে চামড়ার মশকের জল ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু বাঙ্গালীরা ইহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকে। আপনাদের দেশে প্রস্রাব করিয়া ব্রাহ্মণেরা জলশৌচ করে না; চলিতে চলিতে একস্থানে বাহ্যে করিয়া দূর গ্রামে গিয়া জলশৌচ করে, এবং সেই একই পরিধানের কাপড় না কাচিয়া স্ত্রীলোকেরা বহুদিন পর্য্যন্ত ইহা ব্যবহার করে, তাহাতে দুর্গন্ধ পর্য্যন্ত হয়, তথাপি তাহা পরিবর্ত্তন করে না। বাঙ্গালীরা অনেকে এইরূপ আচারকে অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখেন। প্রত্যেক দেশেই

এইরূপ অনেক আচার আছে, যাহা অন্য দেশের লোকের নিকট ঘৃণনীয়।" সেই ব্রজবাসী তদুত্তরে আমাকে বলিলেন, "আমাদের দেশের এই সকল আচার কদাচার হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে ত কোন জীবহিংসা হয় না; কিন্তু তোমাদের দেশে যে মাছ খায়, ইহা জীবহিংসা, সুতরাং ইহাতে বহু পাপ জন্মে।" তদুত্তরে আমি বলিলাম, "জীবকেই জীবের আহারের নিমিত্ত ভগবান্ প্রায় সর্ব্বত্রই বিধান করিয়াছেন। উদ্ভিজ্জও জীব, ইহা স্পষ্টরূপেই হিন্দুশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, এবং কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট হইয়া পরীক্ষা করিলেও দেখা যায় যে ইহাদের আহার-বিহার, শ্বাস-প্রশ্বাস, নিদ্রা প্রভৃতি জীব ব্যাপার অন্য জীবের সহিত সমভাবেই আছে। ফলমূলাদির বীজ সমস্ত জীবময়। একটি গোধূম, যাহা আপনি আহার করেন তাহাকে ভূমিতে পুঁতিয়া রাখিলে বৃক্ষরূপ ধারণ করে, সুতরাং ইহাও জীব। জলে জীব আছে, বায়ুতে জীব আছে, চক্ষে দেখা যায় না বলিয়া যে এই সকলের মধ্যে জীব নাই তাহা নহে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সেই সকল জীব দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকল বায়বীয় জীব, আমাদের প্রত্যেক শ্বাসপ্রশ্বাসে বিনষ্ট হইতেছে। আমরা জল পান করিলে বহু জলীয় জীব বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং জীবহিংসা সম্যক্ পরিত্যাগ করা, মানুষের পক্ষে অসাধ্য। তবে শাস্ত্রের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জীবহিংসা করিলে অবশ্য তাহাতে পাতক জন্মে। কিন্তু মৎস্যাহার শাস্ত্রে একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই, বরং মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে কোন কোন মৎস্যাহারের ব্যবস্থা থাকা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বঙ্গদেশে

মৎস্যাহার আছে বলিয়াই যে বঙ্গদেশের আপনারা এত নিন্দা করেন, ইহা কিরূপে প্রশংসনীয় হইতে পারে?”

ব্রজবাসী তৎপর আর দুই একটি উত্তর প্রত্যুত্তর করিয়া একপ্রকার নিরস্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ চুপ করিয়া আমাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। ব্রজবাসী নিরস্ত হইলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিতে লাগিলেন,— “তোমাদের কথোপকথনের বিষয় সম্বন্ধে আমি একটি কাহিনী বলিতেছি শ্রবণ কর। এই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একজন অতি পণ্ডিত এবং সূর্য্যমন্ত্রে সিদ্ধ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নিকট অনেক বিদ্যার্থী বেদ ও দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত; তন্মধ্যে একটি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকুমারও ছিল। সেই ব্রাহ্মণকুমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন, গুরু-শুশ্রূষায় রত এবং গুরুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র ছিলেন। কালক্রমে সেই ব্রাহ্মণকুমার সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন, এবং তিনিও গুরুর ন্যায় সূর্য্য-মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিলেন। তৎপরে গুরুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি স্বীয় জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং পরিণীত হইয়া গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রতি গুরুর অতিশয় স্নেহ ছিল, সুতরাং গুরু কিয়দ্দিবস পরে শিষ্যকে দেখিতে মনন করিয়া বঙ্গদেশে গমন করিলেন। কিন্তু শিষ্য-গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তথায় মৎস্যাহারের ব্যবহার

প্রচলিত আছে। তদ্দর্শনে গুরু অতিশয় রুষ্ট হইয়া শিষ্যকে ভৎ র্সনা করিতে করিতে বলিলেন, "তুমি এই-রূপ কদাচারী হইবে জানিলে, আমি কখনই তোমাকে বিদ্যা অর্পণ করিতাম না। শিষ্য বিনীতভাবে বলিলেন "গুরুদেব! আমি জ্ঞাতসারে কোন অসদাচারে লিপ্ত হই নাই; আপনি আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইবেন না।" গুরু বলিলেন, "তোমার গৃহে মৎস্যাহার পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে দেখিতেছি; ইহা অপেক্ষা কদাচার আর কি হইতে পারে?" শিষ্য বলিলেন "মহারাজ! মৎস্যা-হারকে আপনি কদাচার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন কেন? আপনার কৃপায় শ্রীসূর্য্যনারায়ণ দেবের প্রসন্নতা আমি লাভ করিয়াছি। তিনি প্রতিদিন আমার গৃহে উপস্থিত হইয়া মৎস্যের ভোগ গ্রহণ করিয়া থাকেন; মৎস্যাহার যদি কদাচার হইত তবে তিনি কখনও মৎস্যের ভোগ গ্রহণ করিতেন না।"

শিষ্যের এই বাক্যে গুরু অনাস্থাসম্পন্ন হইয়া বলিলেন "তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। আচ্ছা তুমি যদি আমার সাক্ষাতে সূর্য্যনারায়ণকে আহ্বান করিয়া আমাকে দেখাইতে পার যে, সূর্য্য-নারায়ণ মৎস্যের ভোগ গ্রহণ করিতেছেন, তবে আমি পর্য্যন্ত ইহা গ্রহণ করিব।" গুরুর এই বাক্য শ্রবণে

শিষ্য অতিশয় প্রফুল্লমনে উত্তম উত্তম মৎস্য আনয়ন করিয়া তদ্দ্বারা নানাবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইলেন, এবং গুরুদেবকে আহ্বান করিয়া, তাঁহার সাক্ষাতে মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যনারায়ণ দেবতাকে আবাহন করিলেন। তখন গুরু, শিষ্য উভয়ের সাক্ষাতে দেবতা উপস্থিত হইলে, সেই সমস্ত ব্যঞ্জনাদি তাঁহার ভোগের নিমিত্ত শিষ্য নিবেদন করিলেন। তখন শ্রীসূর্য্যনারায়ণদেব সেই সমস্ত ভোগ অঙ্গীকার করিলে, গুরু তদ্দর্শনে অবাক হইয়া রহিলেন, এবং শিষ্যকে অকারণ তিরস্কার করিয়াছেন ভাবিয়া বলিলেন "বাবা! আমারই এই বিষয়ে ভুল হইয়াছে। আমাদের দেশের লোকে মৎস্যাহারকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখে; সুতরাং আমারও ধারণা ছিল যে, তোমাদের এই আচার অতি কদাচার; এক্ষণে আমি স্বচক্ষে দেখিলাম যে সূর্য্যনারায়ণ মৎস্যের উপহার গ্রহণ করিলেন। ইহা দেখিয়া আমার ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। আমি স্বয়ং ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিব।" তদবধি গুরুও মৎস্যাহার করিতে লাগিলেন। কিছুদিন মৎস্য ব্যবহার করিবার পর, তিনি ইহাকে সুস্বাদু বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন, এবং মনে করিলেন যে, নিজদেশে প্রত্যাগমন করিয়া মৎস্যাহারের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবেন। কিয়দ্দিবস পরে তিনি শিষ্যের নিকট বিদায়

গ্রহণ করিয়া নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং নিজ সমাজস্থ প্রধান প্রধান লোকসকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বাঙ্গালা দেশে মৎস্য ব্যবহার আছে বলিয়া যে আপনারা বাঙ্গালীদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন ইহা সঙ্গত নহে। মৎস্যাহারে বাস্তবিক কিছু দোষ নাই।" এই কথা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন যে "আপনি সুপণ্ডিত হইলেও বাঙ্গালী শিষ্যের প্রতি স্নেহবশতঃ তাহার সংসর্গে আপনার বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়াই আমরা বোধ করিতেছি ; নতুবা এমন কদর্য্য আহারকে আপনি নির্দ্দোষ বলিয়া কিরূপে বর্ণনা করিতেছেন ?" পণ্ডিতজী বলিলেন, "এই দেশে মৎস্যের ব্যবহার নাই বলিয়াই আপনাদের এইরূপ ধারণা হইয়াছে ; বস্তুতঃ গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা যে সূর্য্যনারায়ণ দেবতার উপাসনা আপনারা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে স্বয়ং মৎস্যের ভোগ গ্রহণ করিতে আমি দেখিয়াছি। ইহা অপবিত্র হইলে তিনি কখনই তাহা অঙ্গীকার করিতেন না।" তখন সামাজিক ব্রাহ্মণেরা বলিলেন যে "সূর্য্যনারায়ণ মৎস্যের ভোগ গ্রহণ করেন, ইহা যদি আপনি আমাদিগকে প্রত্যক্ষ করাইতে পারেন তবে আপনার কথা সত্য বলিয়া আমরা গ্রহণ করিব ; নতুবা কেবল আপনার কথা শুনিয়া আমরা এই কদর্য্য ব্যবহারকে কখনও

সঙ্গত ব্যবহার বলিয়া মনে করিতে পারি না।” পণ্ডিতজী বলিলেন, “আমি আগামী কল্যই এই স্থানে আপনাদের সাক্ষাতে সূর্য্যনারায়ণকে মৎস্যের ভোগ দিব, আপনারা দেখিবেন সূর্য্যনারায়ণ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহা গ্রহণ করিবেন।” পর দিবস মৎস্যের ভোগ প্রস্তুত করাইয়া গ্রামিক লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং নানাবিধ মৎস্যের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইয়া মন্ত্রের দ্বারা সকলের সাক্ষাতে সূর্য্যনারায়ণদেবকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু এইবার সূর্য্যনারায়ণ আসিলেন না। তখন সামাজিক লোকেরা তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতে করিতে আপন ভবনে গমন করিলেন। পণ্ডিতজী অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া অনশনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীসূর্য্যনারায়ণের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তৃতীয় দিবসে দেবতা তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিতজী তাঁহাকে যথাবিহিতরূপে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, “আপনার উদ্দেশ্যে আমি ভোগ উপস্থিত করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি উপস্থিত হইয়া তাহা অঙ্গীকার না করাতে আমি অতিশয় অপ্রস্তুত হইয়াছি, এবং সামাজিক লোক সকল আমাকে অতিশয় তিরস্কার করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে।” তখন দেবতা বলিলেন, “তোমার প্রদত্ত ভোগ অতিশয় অপবিত্র; আমি কিরূপে তাহা গ্রহণ করিতে পারি?” পণ্ডিতজী

বলিলেন, "বঙ্গদেশে আপনি আমার সাক্ষাতে মৎস্যের ভোগ গ্রহণ করিয়াছেন, এইখানে ইহাকে অপবিত্র বলিতেছেন কেন?" দেবতা বলিলেন, "বঙ্গদেশে মৎস্যাহার অপবিত্র নহে, এই নিমিত্ত প্রাচীন কাল হইতে মৎস্যাহার বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে; ইহা বঙ্গদেশে বিশেষ কোন অনিষ্ট উৎপাদন করে না, কিন্তু এইদেশে ইহা অনিষ্ট উৎপাদন করে; এই নিমিত্ত প্রাচীন কাল হইতে এই পর্য্যন্ত ইহা এতদ্দেশে বর্জ্জিত হইয়াছে। এই দেশের পক্ষে মৎস্যাহার অতি অপবিত্র বলিয়া জানিবে। অতএব এই দেশে তোমার প্রদত্ত মৎস্যের ভোগ আমি গ্রহণ করি নাই।" এই বাক্য শ্রবণে পণ্ডিতজীর সংশয় দূর হইল, এবং শ্রীসূর্য্যনারায়ণের কৃপায় তাঁহাকে সামাজিক লোকেরাও পুনরায় গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববৎ আদর করিতে লাগিলেন।

এই আখ্যায়িকাটি কীর্ত্তন করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন যে, "ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে খাদ্যাদি বিষয়ে যে সকল আচার প্রাচীন কাল হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেই সকল আচার তত্তৎপ্রদেশে অনুসরণ করাতে কোন দোষ ঘটে না। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সেই সকল আচার সেই সেই প্রদেশে প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে; তন্নিমিত্ত তাহারা নিন্দনীয় নহে।"

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের জনৈক বাঙ্গালী শিষ্য একবার আমার সাক্ষাতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তিনি মৎস্য মাংস ব্যবহার করিতে পারেন কিনা ? তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিয়াছিলেন যে "মাংস ব্যবহার না করাই শ্রেয়স্কর ; তবে মৎস্য ব্যবহার বাঙ্গালা দেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে, দেশাচার অনুসরণ করিতে তাঁহার বারণ নাই, তবে বৈষ্ণবের পক্ষে ইহার ব্যবহার না করাই প্রশংসনীয়। কিন্তু বঙ্গদেশে যেরূপই হউক তীর্থস্থানে মৎস্যের ব্যবহার সঙ্গত নহে।"

কোন কোন সময়ে এবং কোন কোন স্থলে বাহিরের লোকের সহিত শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ব্যবহার আমাদের চক্ষে প্রথম প্রথম কিছু কঠোর বলিয়া বোধ হইত ; কিন্তু পরে ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলাম যে তিনি আচার্য্য মহন্ত ছিলেন, সুতরাং অপর সাধুকে শাসন ও পরীক্ষা করিতে যোগ্য ; সুতরাং তাহাদের সহিত তাঁহার ব্যবহার অনেক সময়ে আত্মগোপনের এবং কখনও বা অপরের শাসনেরও পরীক্ষার নিমিত্ত হইত এবং সময় সময় বাহ্য কঠোরতার মধ্যে বাস্তবিক দয়াই লুক্কায়িত ভাবে থাকিত। যাঁহারা একটু উচ্চ সাধনসম্পন্ন অথচ পূর্ণ সাধনযোগ-প্রাপ্ত হয়েন নাই তাঁহাদের প্রতিই অধিকাংশ সময় কঠোর ব্যবহার করিতেন ; কিন্তু ইহা তাঁহাদের অভিমান দূর হইয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য। তাঁহার অপরের প্রতি বাহ্য ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

একদিন এক খ্যাতনামা সাধু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের

আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একটু তেজের সহিত বলিলেন, "তুমি কেন এখানে আসিয়াছ? এইখানে তুমি থাকিতে পারিবে না।" খ্যাতনামা সাধু হাত জোড় করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "মহারাজ, আমি এইখানে থাকিব না, কিছু ভাঙ্ আমি সঙ্গে করিয়া আনিআছি, আপনার শিল-লোড়ীতে ইহা পিষিয়া লইয়া যাইব।" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "ভাঙ্ পিষিতে হয় তুমি অন্যস্থানে যাও, এখানে আসিবার তোমার কোন প্রয়োজন নাই। যাও, এখনই তুমি আশ্রম হইতে বাহির হইয়া যাও।" এই বলিয়া শ্রীযুক্ত অভয় বাবুকে বলিলেন, "তুমি বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া দাও।" অভয় বাবু তাঁহাকে ভাল সাধু বলিয়া জানিতেন। তাঁহার প্রতি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া তিনি মনে মনে কিছু দুঃখিত হইলেন; এবং কিঞ্চিৎ অপ্রসন্নমনে কেবল তাঁহার আদেশ পালনের নিমিত্ত দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন বাবাজী মহারাজ অন্যদিক দিয়া শৌচে চলিয়া গেলেন। অভয় বাবু দরজা বন্ধ করিয়া দিলে, উক্ত সাধু দরজার নিকট বাহিরে বসিয়া গীতাপাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অভয় বাবু মনে মনে ভাবিলেন যে তিনি চলিয়া গিয়াছেন। কিছুকাল পরে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ শৌচ হইতে আসিয়া ঘরে গিয়া আপন আসনে বসিলেন, এবং অভয় বাবুর সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে হাসিয়া অভয় বাবুকে বলিলেন, "অভয়রাম!

সেই বৃদ্ধ সাধুটি, যাহাকে আমি আশ্রম হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলাম, সে চলিয়া যায় নাই; দরজার কাছে বাহিরে বসিয়া আছে। তুমি দরজা খুলিয়া দিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া আইস।” তখন অভয় বাবু উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই তিনি বাহিরে বসিয়া গীতা পাঠ করিতেছেন। অভয় বাবু তাঁহাকে বলিলেন যে, তাঁহাকে ভিতরে আসিতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ অনুমতি করিতেছেন। তখন সেই বৃদ্ধ সাধু ভিতরে আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দণ্ডবৎ করিলেন, এবং ভাঙ্ পিষিয়া নানা কথোপকথনের পর চলিয়া গেলেন।

আর এক দিবস এক খ্যাতনামা সাধু আশ্রমে আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে বলিলেন, “মহারাজ! আমার নিকট একটি সচ্চরিত্র বালক আছে; সে তোমার চেলা হইবার যোগ্য; আমি তাহাকে বলিয়াছি যে চারিশত বৎসর বয়সের সাধু তাহাকে দেখাইব। তুমি যদি অনুমতি কর, তবে তাহাকে এই-খানে আনিয়া তোমাকে দেখাইতে ইচ্ছা করি।” এই কথা শুনিবা-মাত্র শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সতেজে তাঁহাকে ধমকাইয়া বলিলেন, “তুমি মিথ্যা কথা না বলিয়া, যদি মেগে খেতে না পার, নিজের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিয়া মেগে খাও গিয়া। আমার উপর এই মিথ্যা কথা কেন লাগাইতেছ? আমার চারিশত বৎসর বয়স তোমাকে কে বলিয়াছে? আমার উপর তুমি মিথ্যা কথা বলিতে যাও কেন? তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, তথাপি তোমার মিথ্যা কথার অভ্যাস

ছাড়ে না, ইত্যাদি।" তিনি এই সকল কথা এত জোরের সহিত বলিলেন যে ঐ সাধু আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহস না করিয়া, ধীরে ধীরে ম্লানমুখে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিলেন এবং আমাদিগকে বলিলেন, "সাধুদিগের মধ্যে প্রকৃতির অনেক ভেদ আছে, আমি ত বাবাজীর বড়াই করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহাতে প্রীত না হইয়া একেবারে নরসিংহ-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।" এই কথা বলিয়াই তিনি আশ্রম হইতে চলিয়া গেলেন।

একবার শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কলিকাতায় গিয়াছিলেন, এবং কৃপা করিয়া আমাদের বাটীতেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেই সময়ে খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত ভোলাগিরি মহাশয়ও কলিকাতায় ছিলেন। এক দিবস সন্ধ্যার পর আমরা অনেকে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট বসিয়া আছি, এবং তিনি বসিয়া থাকিয়া আমাদের সহিত কথোপকথন করিতেছেন ; এমন সময় দুইটি ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত ভোলাগিরি মহাশয় আসিয়াছেন। তিনি বাড়ীর বাহিরের দরজায় দণ্ডায়মান আছেন। ইঁহারা দুইজনই শ্রীযুক্ত ভোলাগিরি মহাশয়ের শিষ্য বলিয়া আমরা অবধারণ করিলাম, এবং আমরা কেহ কেহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার নিমিত্ত আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইলাম। কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এই কথা শুনিয়া, "আচ্ছা," এই মাত্র বলিয়া আর উপবিষ্ট না থাকিয়া, বিছানায় গৃহদ্বারের বিপরীত দিকে মুখ করিয়া শয়ন করিলেন। শ্রীযুক্ত

ভোলাগিরি মহাশয় তৎপরে তাঁহার শয্যার নিকটে আসিয়া, তাঁহাকে বিপরীত দিকে মুখ করিয়া শয়ান থাকিতে দেখিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়াই হাতযোড় করিয়া স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন। আমরা সকলে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া দেখিতে লাগিলাম। এইরূপ মিনিট দুই অতিবাহিত হইলে, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ উঠিয়া বসিলেন, এবং গিরি মহারাজকে আদর করিয়া নিকটে বসাইলেন। আমাদের বাটীতে তখন অনেক স্ত্রীলোক আসিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেকে আসিয়া গিরি মহারাজকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে তিনি পাঁচ ছয় পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের প্রণাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আমার একটি শালী ছিল; তাহাকে শ্রীযুক্ত ভোলাগিরি মহারাজ কয়েকটি উপদেশ বলিয়া দিতে লাগিলেন। যেমন "কাহারও সহিত কলহ করিও না," ইত্যাদি। তিনি উপদেশ করিতে করিতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "উপদেশ করিবার কি ফল ? এই সকল উপদেশ কি এক্ষণে কার্য্যকারী হইবে ?" অতঃপর স্ত্রীলোকদিগকে সম্ভাষণ করিয়া শ্রীযুক্ত গিরি মহারাজ পুনরায় আসিয়া পূর্ব্বস্থানে উপবিষ্ট হইলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ আমাদের সহিত কথোপকথনের পর, তিনি স্বস্থানে গমন করিলেন। তিনি যাইবার সময় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার স্কন্ধদেশের উপর আপন বাহু রাখিয়া তাঁহার সহিত বয়স্যের ন্যায় ব্যবহার করিলেন। পরে একদিন আমি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শ্রীযুক্ত ভোলাগিরি মহারাজ আপনাকে দর্শন করিতে অসিয়াছিলেন,

আপনিও একবার তাঁহার বাসস্থানে কি যাইবেন না ?" শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ উত্তর করিলেন, "ইনি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী হইয়াও যখন মান অপমান বোধ ত্যাগ করিয়া আমাকে দর্শন দিতে আসিয়াছিলেন, তখন একবার আমিও তাঁহাকে দর্শন দিতে তাঁহার স্থানে যাইতে পারি।"

একদিন শ্রীবৃন্দাবনে কুম্ভের মেলার সময় অনেকগুলি নিমন্ত্রণের চিঠি (টিকেট) একজন ধনাঢ্য লোকের কর্ম্মচারী আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের হাতে দিল। নিমন্ত্রণে যাইবার অভিপ্রায়ে অন্যান্য অনেক সাধু আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে যাচ্ঞা করিয়া এক এক জন এক একখানা টিকেট লইয়া যাইতে লাগিল। কিছুকাল পরে একজন পরমহংস আসিয়া একখানা টিকেটের জন্য প্রার্থী হইল। তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ খুব তেজের সহিত তাহাকে বলিলেন, "আমি কি চিঠি বিক্রয় করিতে বসিয়াছি ? তুমি যাও এখান হইতে, চিঠি পাইবে না ; আমার নিকট চিঠি নাই, কেবল রোজগারের চিন্তায় ত তুমি টিকিট টিকিট করিয়া ফিরিতেছ।" এই সকল তীব্র কথা শুনিয়া পরমহংসটি কিছু বলিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিছুকাল পরে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রসন্নভাবে তাহাকে একখানা চিঠি দিয়া দিলেন। শ্রীযুক্ত অভয় বাবু ও আমি সেই সময় উপস্থিত ছিলাম। পরমহংসটি চলিয়া গেলে, আমরা শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহারাজ ! আপনার নিকট ত অনেকগুলি টিকিট ছিল, যাহারা চাহিয়াছে তাহাদের সকল-

কেই টিকিট দিয়াছেন ; তবে এই পরমহংসটির সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলেন কেন ?” তিনি হাসিয়া বলিলেন, “বাবা, এই পরমহংসটি ভাল লোক, এই ব্যক্তি অপরের অবজ্ঞা ও তিরস্কার অক্ষুণ্ণভাবে সহ্য করিতে কি পরিমাণে আয়ত্ত করিয়াছে তাহা দেখিবার নিমিত্ত আমি ইহার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিয়াছি ; তোমরা বালক, তোমরা ইহা বুঝিতে পারিবে না।”

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আশ্রমে শ্রীশ্রীশ্রীরাধাবিহারীজী ঠাকুর প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইবার সময়ে, নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত বহুলোক প্রসাদ পাইয়াছিল। কিন্তু পঙ্গৎ হইয়া যাইবার পরেও বহু প্রসাদ ভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল ; সুতরাং দুই তিন দিন ধরিয়া তাহা বিতরিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একদিবস ক্রমশঃ অনেক সাধু, আহারার্থ উপস্থিত হইতে লাগিল, কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদের অনেককেই একে একে তাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। ভাণ্ডারে অনেক লাড্ডু, কচুরী প্রভৃতি প্রসাদ সঞ্চিত থাকিলেও শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সাধুদিগকে বিমুখ করিয়া তাড়াইয়া দিতেছেন দেখিয়া শ্রীযুক্ত অভয় বাবু মনে মনে কিছু বিরক্ত হইতে লাগিলেন, কিন্তু বাহিরে কিছু প্রকাশ করিলেন না। কিছুকাল পরে, ধুনীর ঘরে আমরা উভয়ে বসিয়া আছি, এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজও বসিয়া তামাক খাইতেছেন, এমন সময় হঠাৎ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, “অভয়রাম, তুমি বলিতেছ, আমি কেন এই সকল সাধুকে খাইতে না দিয়া তাড়াইয়া দিতেছি ;

বাবা! তুমি বালক! কিছু বুঝিতে পার না। ইহারা কেহই বাস্তবিক সাধু নহে। ইহারা সাধুবেশধারী ভণ্ড মাত্র। ইহার কেহ ক্ষুধার্ত্তও নহে। সকলেই ঘরে খাইয়াছে; কেবল রোজগারের নিমিত্ত ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। আমি ক্ষুধার্ত্ত সাধুকে তাড়াইয়া দেই নাই; তুমি দেখিতে পাইবে, এখনই একটি যথার্থ ক্ষুধার্ত্ত সাধু আসিবে; তাহাকে বেশ করিয়া ভোজন করাও।" এই কথাবার্ত্তা হইবার দুই তিন মিনিট পরেই, আশ্রমের একটি সাধু আসিয়া সংবাদ দিল যে আর একটি সাধু ভোজনার্থী হইয়া আসিয়াছে। এবং তাহাকে ভোজন করাইবে কি না তদ্বিষয়ে সে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের অভিমত জানিতে ইচ্ছা করিল। তখন তিনি অভয় বাবুকে বলিলেন, "অভয়রাম! এইটি বাস্তবিক সাধু, তুমি ইহাকে ডাকিয়া ইহার পরিচয় লও, তবেই বুঝিতে পারিবে।" তখন সেই আগন্তুক সাধুটি আপনা হইতেই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট আসিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার গুরুদ্বারা কোথায়?" সে বলিল, "আমার গুরু-দ্বারা ডাকোরজী।" তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "অভয়রাম! দেখ, এইটি যথার্থ সাধু কিনা; এইটি ভাল স্থানের চেলা, ইহাকে অন্যান্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবে এই ব্যক্তি ভণ্ড ও কেবল সাধুবেশধারী নহে। যাও, ইহাকে উত্তমরূপে ভোজন করাও।"

একবার ব্রজ পরিক্রমার সময় গিরিরাজবাসী একটি অতি দরিদ্র অসহায় ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গে গিয়াছিল। সে অতিশয় পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সহিত পরিক্রমা কালে তাঁহার সেবা করিত। তাহার হাঁপানি রোগ ছিল। কিন্তু এই রোগ থাকা সত্ত্বেও সে অপরাপেক্ষা শারীরিক অধিক পরিশ্রম করিত। পরিক্রমায় প্রায় দেড় মাস অতিবাহিত হয়। পরিক্রমায় যাইবার পূর্ব্বেও সে কিছুদিন আশ্রমে থাকিয়া আশ্রমের কার্য্যকর্ম্ম পরিশ্রমের সহিত করিয়াছিল। পরিক্রমার পরেও সে আশ্রমে আসিয়া থাকিতে লাগিল; কিন্তু পরিক্রমার পর হইতে তাহার হাঁপানি রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহাতে সে কার্য্যকর্ম্ম করিতে একেবারে অসমর্থ হইল। একদিবস সে ধুনীর নিকট বসিয়া আছে, এমন সময় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে অতিশয় ধম্‌কাইতে লাগিলেন, বলিলেন, "তুই কেন এইখানে পড়িয়া আছিস্? কোন কাজ করিস্‌না, কেবল বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া সাধুর অন্ন ভোজন করিস্; যা, এখনই আশ্রম হইতে বাহির হইয়া যা; ইত্যাদি।" সেই ব্রাহ্মণটি তখন নিরুপায় হইয়া আশ্রম হইতে বাহির হইয়া গেল। আমি এবং শ্রীযুক্ত অভয় বাবু তৎকালে উপস্থিত ছিলাম। এই ঘটনা দেখিয়া শ্রীযুক্ত অভয় বাবুর মনে অতিশয় বিরক্তি আসিল। তিনি ভাবিলেন যে ইহার প্রতি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ব্যবহার বড় নিষ্ঠুর হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণটির একটি পয়সাও হাতে নাই। সে যতদিন পারিয়াছে কঠিন পরিশ্রমের সহিত

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের কার্য্যকর্ম্ম করিয়াছে। এক্ষণে হাঁপানিরোগে সে একেবারে অসমর্থ হইয়াছে ; এই অবস্থায় তাহাকে আশ্রম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া বড় নিষ্ঠুরের কর্ম্ম। তিনি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ধূনীর ঘর হইতে উঠিয়া আশ্রমের স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। তথায় এই বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "অভয়রাম ! তুমি কিছু বুঝিতে পার না, বালক ; এই গিরিরাজবাসী ব্রাহ্মণ সজ্জন লোক। এই ব্যক্তি অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, আহারেরও কোন সংস্থান ইহার ছিল না, কিন্তু সর্ব্বদা ভগবানের নাম স্মরণ করিত। আমি তাহাকে আনিয়া আশ্রমে আশ্রয় দেই ; কিন্তু এইখানে অতিরিক্ত ভোজন পাইয়া এক্ষণে সে ভজন করা একেবারে ভুলিয়াছে। আশ্রমে থাকিলে আর তাহার ভজন সহজে ঘটিবে না। এইখান হইতে তাড়িত হইয়া নিরাশ্রয় বিবেচনা করিয়া সে এক্ষণে পুনরায় ভজনে মন দিবে। তাহার আহারের অভাব হইবে না। তাহা ভগবৎ কৃপায় জুটিয়াই যাইবে, কিন্তু তথাপি নিরাশ্রয় ভাবিয়া সে প্রাণপণে পুনরায় ভজন করিবে ; এই নিমিত্ত আমি এইখান হইতে তাহাকে বাহির হইয়া যাইতে বলিয়াছি। লোকের প্রকৃত উপকার কিসে করা হয় তাহা তুমি জান না।"

এই কথা শুনিয়া অভয় বাবুর সংশয় ও বিরক্তি দূর হইল।

একদিন কথা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "পরোপকারকি-বাস্তে শান্তন্ ধরে শরীর্" (পরের উপকারের নিমিত্তই শান্ত ও মহাত্মা সকল জীবনধারণ করেন)। কেমারবনে দাবানল কুণ্ডের উপরে একটি সাধুদিগের আশ্রম আছে, তথাকার প্রাচীন মহন্ত কল্যাণদাসজী অনেক সাধু অতিথির সৎকার করিতেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের পূর্ব্বোক্ত কথা শুনিয়া আমাদের মধ্যে কোন একজন এই কল্যাণদাসজীর নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, ইনি খুব পরোপকারী সাধু, অনেক অভ্যাগত সাধু শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া তাঁহার নিকট আশ্রয় পায়। এই কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "আমি এইরূপ উপকারের কথা বলিতেছি না। এই উপকার অতি সামান্য উপকার; ইহার ফল উপকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে অতি যৎসামান্য; তাহার অতি অল্প দুঃখই ইহার দ্বারা মোচন হয়, কিন্তু ইহার ফলে কর্ম্মকর্ত্তার পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তিনি হয় ত রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পশ্চাতে সিপাহী পাহারা প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে চলে। তাঁহার অনেক রথ, হাতী, ঘোড়া ঐশ্বর্য্য হয়। কিন্তু প্রকৃত মহাত্মারা কর্ম্মে লিপ্ত হয়েন না, এবং তাঁহাদের কৃত উপকার এই প্রকারের উপকার নহে। তাঁহারা জীবের দুঃখ তাপের মূল বিনাশ করিয়া উপকার সাধন

করেন। সুতরাং তাঁহাদের কর্ম্ম প্রণালীর যথার্থ ভাব সাধারণ লোকের বোধগম্য হয় না।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আপনাকে কিরূপে অন্যের বাহ্য-ব্যবহারে গোপন করিতেন, তাহারও একটি দৃষ্টান্ত এইস্থলে উল্লেখ করিতেছি ঃ—

একবার আমি শ্রীবৃন্দাবনে থাকা কালে শ্রীহট্টস্থ করিমগঞ্জ মহকুমার মোক্তারী-ব্যবসায়ী একটি ভদ্রলোক তাঁহার দর্শনাভিলাষে আশ্রমে উপস্থিত হইল। আমি তখন আশ্রমে উপস্থিত ছিলাম। সেই ভদ্রলোকটি আশ্রমে আসিয়া প্রথমে আমাকে প্রণাম করিল; আমি তখন ঘরের বাহিরে বসিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তখনই "উঁ, আঁা" করিয়া শারীরিক কষ্টপ্রকাশ করিতে করিতে গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, এবং যেন অতিশয় কষ্টবোধ করিতেছেন এইরূপ প্রকাশ করিয়া এমনভাবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন যে সেই ভদ্রলোকটি তাঁহাকে প্রণাম করিতে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া তাঁহার কষ্টের যাহাতে উপশম হয় এমন দু'টি একটি ঔষধ বলিয়া মিনিট পাঁচ সাত পরেই আশ্রম হইতে বিদায় হইয়া গেল। ভদ্রলোকটি বিদায় হইয়া যাইবার পরেই তিনি হাসিয়া আমাদের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন, কোন প্রকার কষ্ট যাতনা তাঁহার থাকা আমরা দেখিলাম না। ইহা দেখিয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম যে এই ব্যক্তি এমনই হতভাগ্য যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলি লইবার পর্য্যন্ত অধিকার তিনি তাহাকে দিলেন না। বাস্তবিক এইরূপ ব্যবহার তাঁহার

একপ্রকার নিত্য অভ্যস্ত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অপরাপর অনেক সাধকের নিকট আগন্তুক লোক উপস্থিত হইলে, বরং তাঁহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিক গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের ব্যবহার সর্ব্বদাই ইহার বিপরীত ছিল। নিজের চেলাই হউক, অথবা অপর লোকই হউক, সর্ব্বদাই তাঁহাদের সাক্ষাতে তিনি সম্পূর্ণ-রূপে আত্মগোপন করিয়া অতি সাধারণ অজ্ঞ সাংসারিক লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। এইরূপ ব্যবহার যেন তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল। তাঁহার শিষ্যগণ এবং অপর লোকেও নানা-বিধ বস্ত্র তাঁহাকে উপহারস্বরূপ সময় সময় প্রদান করিতেন। সেই সকল বস্ত্র তিনি বাঁধিয়া রাখিয়া দিতেন, আশ্রমস্থ সাধু-দিগকে তাহা দিতেন না। তাঁহাদের অভাব হইলেও প্রায় কখনও দিতেন না, বরং আমাদের গৃহস্থ শিষ্যদিগের মধ্যে কাহাকেও কখন কখন দুই একখানা ভাল বস্ত্র দিতেন। এই সকল বস্ত্র আলমারিতে থাকিয়া অনেক সময় নষ্ট হইয়া যাইত। আমি তাঁহার এইরূপ ব্যবহারের অভিপ্রায় প্রথমে কিছু বুঝিতে পারি-তাম না। পরে কালক্রমে ইহার অভিপ্রায় কিছু কিছু বুঝিতে লাগিলাম। আমি প্রায় কোন বিষয় তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া প্রশ্ন করিতাম না; কারণ আমার দীক্ষার পরেই আমাকে বলিয়াছিলেন যে, মুখে কথা কহিয়া আমাকে উপদেশ দিবেন না, ভিতর হইতে অন্তরে অন্তরে প্রেরণা করিবেন। এই আভ্যন্তরিক প্রেরণায়ই আমি পরে বুঝিলাম যে, যে সকল সাধু তাঁহার নিকট তাঁহার আশ্রমে বাস করিতেন, তাঁহারা তাঁহার

নিকটে উপহারস্বরূপে উপস্থিত বস্ত্রাদি এবং অপর ভোগ্যবস্তুর প্রতি যাহাতে লোভযুক্ত না হন, এবং লোভযুক্ত হইয়া যাহাতে তাঁহারা সেবা ও ভজন বিষয়ে বহির্মুখী লোকের ন্যায় হইয়া না পড়েন, এবং আশ্রমকে ভোগবিলাসের স্থান করিয়া না ফেলেন ইহাই তাঁহার একটি আভ্যন্তরিক অভিপ্রায় ছিল। বাস্তবিক এক্ষণে অধিকাংশ দেবালয় ও সাধুদিগের স্থান অনেক স্থলে সাংসারিক লোকের অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে ভোগবিলাসের আবাসভূমি হইয়া পড়িয়াছে; ভজন সাধনের দিকে দৃষ্টি অতি অল্পস্থানেই আছে। কোন কোন স্থানে কিয়ৎপরিমাণে শাস্ত্রের চর্চ্চা আছে সত্য, কিন্তু আভ্যন্তরিক শুদ্ধি ও ভগবন্নিষ্ঠার দিকে বিশেষ লক্ষ্য অতি অল্প স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্থানবাসী লোকদিগের মধ্যে অনেকেই এইরূপ ভোগ-বিলাস করিয়া সময় যাপন করেন, এবং অধিকন্তু সাধারণ গৃহস্থ সকল তাঁহাদের এইরূপ ভোগবিলাসের উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী ও অর্থ যোগাইতে যেন ধর্ম্মতঃ বাধ্য আছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার নিজের আশ্রমটি যাহাতে এই অবস্থাপ্রাপ্ত না হয়, তদ্বিষয়ে স্বভাবতঃ যত্নশীল ছিলেন, এবং তাঁহার আশ্রমস্থ সাধুদিগের প্রতি তাঁহার ব্যবহার এই নিয়মেরই অধীন ছিল বলিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম। তিনি স্বয়ং অনেক সময় রাত্রে ভোরের সময় আহার করিতেন; সেই সময় তাঁহার ক্ষুধা হয় এইরূপ ভাণ করিয়া, মধ্যরাত্রে সকলকে জাগাইতেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া সেই সময় অপর সকলকে জাগরিত হইতে হইত; এবং স্নানাদি করিয়া কাহারও রসুই

কার্য্যে, কাহারও ঠাকুর সেবায়, কাহারও অপরাপর কার্য্যে বাধ্য হইয়া ব্যাপৃত হইতে হইত। অনেক সময়ে রাত্রে চোর আসিবে এই ভয় দেখাইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সকলকে মধ্য রাত্রে জাগরিত করিয়া সেবার কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন; সাধকদের সম্বন্ধে এক অহোরাত্রের মধ্যে দুই কি তিন ঘণ্টাকাল নিদ্রাই তিনি প্রচুর বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, এবং অন্নাহার দিবারাত্রির মধ্যে একবারই পছন্দ করিতেন। এইরূপ আহার ও নিদ্রার প্রণালী ক্রমশঃ অভ্যাস করিলে শরীর লঘু, আলস্যবর্জ্জিত ও ভজনোপযোগী হয় বলিয়া তাঁহার অভিমত ছিল।

কিন্তু অপরদিকে অধিক শারীরিক কষ্ট করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতেও তিনি পছন্দ করিতেন না। তিনি একবার একটি ঘটনা উপলক্ষে আমাকে বিশেষরূপে বলিয়াছিলেন যে, শরীরকে অধিক কষ্ট দিয়া যে ধর্ম্মোপার্জ্জন করা হয়, তাহা তামসধর্ম্ম, ইহাতে ভগবান্ প্রসন্ন হয়েন না। যে ঘটনা উপলক্ষে এইকথা বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে ঃ—

একবার ব্রজপরিক্রমার সময় প্রায় পাঁচ ক্রোশ চলিয়া গিয়া, "কোষী" নামক স্থানে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ও তাঁহার সঙ্গীয় আমরা ও সাধুবর্গ সকলে মধ্যাহ্নে আসন স্থাপন করিলে, বৈকালে কোন কোন সাধু প্রস্তাব করিলেন যে "কোষী" হইতে দুই কি আড়াই ক্রোশ ব্যবধানে "শেষ-শায়ী" নামক স্থান আছে, সেই-স্থানে আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তথায় স্থাপিত শেষ-শায়ী ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া আসিবেন। তাঁহাদের কথায় আমি যাইতে প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ

আমাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "এই পরিক্রমা করিতেছ, ইহাই যথেষ্ট, আবার দুই তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া যাতায়াত করিলে শরীর ক্লেশ পাইবে, ইহা তামসিক ধর্ম্ম, ইহাতে ভগবান্ প্রসন্ন হয়েন না।" তিনি নিষেধ করাতে আমার যাওয়া হইল না, এবং অপর যে কয়েকজন সাধু আমাকে লইয়া যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও নিবৃত্ত হইলেন।

বহুদিন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গলাভ করিবার পর ক্রমশঃ আমি এইরূপ অনুভব করিয়াছিলাম যে, তাঁহার চরিত্র মূর্ত্তিমান্ গীতার স্বরূপ ছিল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত আছে যে,

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

৫ম অঃ, ১৮।১৯

এবং ঐ পঞ্চম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে পুনরায় উক্ত হইয়াছে :—

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের কার্য্যকলাপ দেখিতে দেখিতে এই সকল গীতা বাক্যের মূর্ত্তিমান স্বরূপ বলিয়া তাঁহাকে আমার বোধ হইত। সাধু, অসাধু, ধনী, দরিদ্র সকলের সহিত তিনি ব্যবহারকালে তাহাদের সমভাব অবলম্বন করিতেন। দুই একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা এই বিষয়টি পরিষ্কার করা যাইতেছে :—

একদা জনৈক রাজা শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীশ্রীগোপীনাথ-জীউর মন্দিরের অনতিদূরে এক বাটীতে কয়েক দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের প্রতি বিশেষ ভক্তিযুক্ত হইয়া তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইলে, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে দর্শন দিবার নিমিত্ত স্বয়ং তাঁহার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিয়া অতি মূল্যবান্ আসনে উপবেশন করাইলেন; এবং যতক্ষণ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাঁহার বাটীতে ছিলেন, ততক্ষণ রাজা স্বয়ং কোন আসন গ্রহণ না করিয়া মৃত্তিকার উপর বসিয়া রহিলেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের প্রতি নানাপ্রকার মর্য্যাদাসূচক ব্যবহার করিলেন। পরে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ঐ বাটীর নিম্নতলে আসিয়া দরজার পার্শ্বে উপবিষ্ট দারোয়ানকে দেখিতে পাইলেন। ঐ লোকটি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দেখিয়া দণ্ডবৎ করিলে তিনি হাসিয়া তাহার পার্শ্ব-দেশে মৃত্তিকার উপর তাহার এক সঙ্গে বসিলেন এবং নিজের ঝুলি হইতে গাঁজা খুলিয়া এক ছিলিম গাঁজা সাজিয়া উভয়ে ধূমপান করিতে করিতে সমভাবে কথোপকথন করিতে লাগি-লেন; এবং কিয়ৎকাল পরে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। রাজার নিকট এত সম্মান ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া তখনই ঐ রাজারই বাড়ীতে তাহার দ্বারবানের সহিত সমভাবে বসিয়া তাহার সহিত যেরূপভাবে ব্যবহার করিয়া আসিলেন, ইহাতে রাজা কি মনে করিয়াছিলেন তিনিই জানেন; কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে

এইরূপ মান অপমানের তুল্য ব্যবহার সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

এক দিবস কেমারবনের দাবানল কুণ্ডের উপর যে সাধুস্থান আছে, তথাকার একটি নব্য বালক সাধু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আশ্রম হইতে একটি ডালিম গাছের পাতা ঔষধের নিমিত্ত লইতে আসিলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহাকে পাতা লইতে বারণ করিয়া বলিলেন, "আমার গাছ ছোট, আমি তোমাকে ইহার পাতা লইতে দিব না। তুমি অন্য স্থান হইতে পাতা লইতে পার।" এবং তাহার সহিত এমন সমভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, সেই সাধুটি তাঁহার বয়সের মর্য্যাদা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া ঠিক সমবয়স্কের ন্যায় তাঁহার সহিত ঐ পাতার জন্য বাদ বিসম্বাদ করিতে লাগিল; এবং অবশেষে তাঁহাকে নানা প্রকার গালাগালি করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন তিনিও ঠিক সমভাবে তাহার সহিত গালাগালি করিতে লাগিলেন। সে একবার গালি দিলে তিনি আরও অধিক করিয়া তাহাকে অশ্লীল কথা বলিয়া গালি দেন। পুনরায় সে গালি দেয়, এইরূপে কিছুক্ষণ গালাগালির পর সে চলিয়া গেল। আমি খুব সাবধান হইয়া তখন হাস্য-সম্বরণ করিলাম। সেই সাধুটি চলিয়া গেলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ঠিক বালকের ন্যায় হইয়া বলিলেন, "আমার গাছের পাতা নিতে আসিয়াছিল, কেমন গালি দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছি।"

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সঙ্গে একত্র আমি ও তাঁহার অপর ২।৩ জন শিষ্য একবার রেলগাড়ীতে একস্থানে যাইতেছিলাম।

তিনি গাড়ীর যে কামরায় বসিয়াছিলেন, তাহার ঠিক পার্শ্বস্থ কামরায় আমরা বসিয়াছিলাম, মধ্যে লৌহের রেলিং মাত্র ছিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের কামরায় পূর্ব্বে দুইজন মুসলমান বসিয়াছিল, তাহারা গাড়ী হইতে প্রয়োজন বশতঃ নামিয়া গিয়াছিল। ঐ কামরা খালি দেখিয়া তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে বসাইয়া আমরা পার্শ্ববর্ত্তী কামরায় বসিয়াছিলাম; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ মুসলমান দুইজন পুনরায় ঐ কামরায় উঠিয়া পড়িল এবং গাড়ী চলিতে লাগিল। ঐ মুসলমান উভয়ই আগরা নিবাসী দীর্ঘকায় বলবান্ মধ্যবয়সের লোক ছিল। তাহারা গাড়ীতে বসিয়াই শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সহিত ঝগড়া বাধাইতে আরম্ভ করিল। তিনি তখন তাহাদের সহিত ঠিক সমান হইয়া গেলেন এবং ঠিক সমভাবে ঝগড়া করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পরস্পর পরস্পরকে নানা অশ্লীল কথা বলিয়া গালাগালি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মুসলমান দুইজন অবশেষে গালাগালি দ্বারা তাঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া তাহাদের এক পোট্লা খুলিয়া কতকগুলি মাংস বাহির করিল। তাহারা মনে করিয়াছিল ঐ মাংস দেখিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ জব্দ হইবেন এবং তাহাদের কামরা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কামরায় যাইবেন; কিন্তু তাহাদের এই আশা ফলবতী হইল না। তাহারা মাংস খুলিলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন, "তোমাদের খাদ্য গোস্ত পশুর আহার, তোমরা খাও, তাহাতে আমার কি? আমিও আমার আহার্য্য খাইব।" এই বলিয়া পূর্ব্বে তাঁহার তৎকালের

আহারের নিমিত্ত আমরা যে কয়টি পেয়ারা মুসলমান দুইজন কামরায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে দিয়াছিলাম, সেই পেয়ারা সকল এক চাকুর দ্বারা কাটিয়া নিজে খাইতে লাগিলেন ও আমাদিগকে হাত বাড়াইয়া অন্য কামরায় প্রসাদ দিতে লাগিলেন। রেল গাড়ীতে চড়িয়া দূরস্থানে যাতায়াত করিতে শরীর-রক্ষার নিমিত্ত আপদ্ধর্ম্ম অবলম্বন করা দূষণীয় নহে বলিয়া তিনি পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলেন, এবং সময়ানুসারে আবশ্যক মত গাড়ীতে বসিয়া ফলমূলাদি তিনি আমাদের সঙ্গে গ্রহণ করিতেন। মুসলমান দুইজন তাঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল। কিছুকাল পরে মুসলমানগণ গাড়ী হইতে নামিয়া গেলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বালকের ন্যায় হাসিতে হাসিতে আমাদিগকে বলিলেন, "ইহারা মনে করিয়াছিল তাহাদের ভয়ে আমি আপন আসন ছাড়িয়া দিব ; কিন্তু আমি তাহাদিগকে ভয় করিব কেন ? আমি একলাই তাহাদের দুইজনকে শারীরিক বলে পরাভূত করিতে পারি। আমার গায়ে কি বল নাই যে তাহাদিগকে ভয় করিব ?" তাঁহার এই সময়ের ব্যবহার দেখিয়া খুব ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আমরা হাস্য সম্বরণ করিয়াছিলাম।

বাস্তবিক শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের এইরূপ বালকের ন্যায় ব্যবহার আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করিতাম। এক দিবস স্নানান্তে তিলকস্বরূপ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ একখানা সামান্য বস্ত্র পরিধান করিলে, শ্রীযুক্ত অভয়বাবু তাঁহার মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! এই কাপড়খানা পরাতে আপনাকে বড়

সুন্দর দেখাইতেছে।" এই কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তখনই খুব আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "আমার এক বনাতের "আল্‌ফি" আছে, তাহা যখন আমি পারি তখন আমি কেমন সুন্দর হই তাহা ত তুমি দেখ নাই! আমি "আল্‌ফি" পরিয়া তোমাকে দেখাইব, তখন আমাকে কেমন সুন্দর দেখায়, দেখিবে।" তাঁহার এই বালকের ন্যায় উত্তর শুনিয়া অভয় বাবু এবং আমরা অপর সকলে হাসিতে লাগিলাম।

এক দিন ত্রিপুরার মহারাজার অতি নিকট আত্মীয় এবং শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের শিষ্য একজন একখানা মণিপুরী ভাল তোয়ালের মত বস্ত্র শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে 'ভেট' করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমাদের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা নিজ-হাতে এই কাপড়খানা আপনার নিমিত্ত বুনিয়াছে; আপনি এই কাপড়খানা নিজে ব্যবহার করিলে আমরা সকলে বড় সন্তুষ্ট হই।" তিনি তখনই কাপড়খানা হাতে তুলিয়া লইলেন, এবং "রেপারের" মত করিয়া তাহা গায় দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ইহা বড় সুন্দর কাপড়, আমি ইহা ব্যবহার করিব এবং ইহা কেমন সুন্দর সকলকে দেখাইয়া আসিব।" এই বলিয়া আশ্রম হইতে প্রায় এক মাইল দূরস্থিত "লোই বাজারে" চলিয়া গেলেন, এবং সেইখানে যাহাকে তাহাকে ডাকিয়া গায়ের কাপড়খানা দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, কেমন সুন্দর কাপড়, আমাকে ত্রিপুরার রাজবাড়ীর স্ত্রীলোকেরা

বুনিয়া দিয়াছে।" এমন সরল ও মিষ্টভাবে কাপড়খানা দেখাইতে লাগিলেন, যে সকলে মুগ্ধ হইয়া যেন বাৎসল্যভাবে বলিতে লাগিল, "হাঁ মহারাজ! তোমার কাপড় বড় সুন্দর হইয়াছে।"

বিষয়ী লোকের সংসর্গে পতিত হইলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহাদের বিষয়ের কথা ঠিক সমানভাবে তাহাদের সহিত কহিতেন, এমন কি, চোর এবং লম্পট প্রভৃতি লোক আসিয়া সময় সময় মন খুলিয়া তাঁহার নিকট তাহাদের দুঃখ জানাইলে তাহাদের আপন আপন বিষয় সম্বন্ধে বিদ্বেষশূন্যভাবে তাহাদের সহিত আলাপ করিতেন, এবং ঠিক তত্তৎশ্রেণীর লোকের ন্যায় তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। একবার একটি অতি কামুক বাঙ্গালী স্ত্রীলোক আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সহিত কয়েক দিন সাক্ষাৎ করিল, এবং নানারূপ ভাবুকতার আলাপাদি করিতে লাগিল। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তৎপর এক দিবস কথা-প্রসঙ্গে তাহাকে এমন কাম-ভাবাপন্ন কথা বলিলেন, যে সে তাহাতে অতিশয় লজ্জা বোধ করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল, এবং আর তাঁহার নিকট আসিতে সাহস করিল না।

একদিকে সাংসারিক পাপী লোকদিগের সহিত যেমন সমভাবে ব্যবহার করিতেন, উচ্চ সাধনসম্পন্ন এবং সিদ্ধপুরুষদিগের সহিতও ঠিক্ তদ্রূপ নির্বিকারভাবে ব্যবহার করিতেন। অতি বিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ কেহ তাঁহার দর্শনার্থ আসিলেও কোন প্রকার সতর্কতার ভাব অবলম্বন করিতে আমি দেখি নাই। অপর সাধারণ লোকের সহিত ব্যবহার করিতে তাঁহার যেরূপ

সহজভাব লক্ষিত হইত, তাঁহাদের প্রতি ব্যবহারেও ঠিক তদ্রূপ সহজ ভাব লক্ষিত হইত। তাহার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে বিবৃত হইতেছে ঃ—

ব্রজধামে একজন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় সাধু ছিলেন। তিনি কখন কখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে আসিতেন। আমি তাঁহাকে অনেকবার দর্শন করিয়াছি। তাঁহাকে সকলে "কল্পান্তি" বলিতেন, অর্থাৎ এক কল্পকাল তাঁহার আয়ু হইয়াছে, ইহা সাধুসমাজে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু তিনি দর্শনার্থ আসিলে অপর গ্রাম্য লোকের সহিত যেমন সহজ ভাবে ব্যবহার করিতেন, তাঁহার সহিতও শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ঠিক্ তদ্রূপ ব্যবহার করিতেন। কোন প্রকার প্রভেদ আমি লক্ষ্য করিতে পারিতাম না।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু প্রথমবার শ্রীবৃন্দাবনে থাকা কালে, মধ্যে মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিতে আসিতেন। তিনি অনেক সময় আসিয়া দণ্ডবৎ করিয়া অপর সাধারণ লোকের ন্যায় নিকটে উপবেশন করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তূষ্ণীম্ভাবে থাকিয়া পরে পুনরায় দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া যাইতেন। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বহির্দৃষ্টিতে তাঁহার সহিত সেই সময় বিশেষ কোন আলাপ ব্যবহার করিতেন না, পক্ষান্তরে নিকটস্থ অপর লোকের সহিত কথোপকথন করিতে থাকিতেন। এক দিবস শ্রীযুক্ত অভয় বাবু ৺গোস্বামী প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকটে যান, কিন্তু কেবল চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, কোন আলাপ প্রসঙ্গ

করেন না কেন?" তাহাতে ৺গোস্বামী প্রভু উত্তর করিলেন, "আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া থাকি; তিনি ভিতরে ভিতরে আমার প্রশ্ন সকলের উত্তর প্রেরণা করেন।" শ্রীযুক্ত অভয় বাবু বলিলেন, "ভিতরে প্রেরণা করা কিরূপ, বুঝিতে পারিলাম না।" তিনি বলিলেন, "আপনারা মুখে যেরূপ কথা কহেন, তিনি ঠিক তদ্রূপ অন্তরে আমার সহিত কথা কহেন, আমি তাহা শুনিতে পাই।"

১৩০০ বাংলা সালের প্রয়াগের কুম্ভের মেলায় অনেক খ্যাত-নামা সিদ্ধ মহাপুরুষ সকল আসিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহ কেহ কখন কখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকটে যাইতেন, এবং কিঞ্চিৎ দূর হইতে তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া যাইতেন; কিন্তু অপর সাধারণ লোক দণ্ডবৎ করিলে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ যেমন সহজ ভাবে হস্তের দ্বারা তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেন, এই সকল মহাপুরুষদিগকেও ঠিক্ তদ্রূপ হস্তের দ্বারা আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেন। তাঁহার কোন প্রকার ভাবের বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইত না।

শ্রীবৃন্দাবনের আশ্রমে শ্রীশ্রীভগবদ্বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় এক দিবস শ্রীশ্রীবিহারীজীউ ঠাকুরকে শ্রীশ্রীরাধিকাজীউ সহকারে শ্রীবৃন্দাবন সহরে এক মিছিলের সহিত পরিভ্রমণের নিমিত্ত বাহির করা হয়। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ও আমরা অনেকে ঐ মিছিলের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনের গৌতমপাড়া নামক স্থানে আসিলে তথাকার গোপী সকল

দর্শনার্থ আসিয়া শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করতঃ নৃত্যগীত করিতে আরম্ভ করে। তৎকালে হঠাৎ আমি দেখিলাম যে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের সর্ব্বাঙ্গে প্রত্যেক লোমকূপ হইতে বর্ষার জলধারার ন্যায় অবিশ্রান্ত ঘর্ম্ম প্রবাহিত হইতেছে। এইরূপ ঘর্ম্মধারা আমি পূর্ব্বে আর কখনও দৃষ্টিগোচর করি নাই। ইহা দেখিয়া এক পাংখা হাতে করিয়া তাড়াতাড়ি যাইয়া আমি তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলাম। তখন শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ হাসিয়া আমাকে বলিলেন, "বাবা! এই ঘর্ম্ম গ্রীষ্মের নিমিত্ত ঘর্ম্ম নহে। ইহা পাংখা দ্বারা নিবারিত হইবে না। ইহা এক প্রকার প্রেমজ্বর। শ্রীশ্রীরাধিকার চতুর্দ্দিকে এই সকল গোপীদিগকে দর্শন করাতে এই এক প্রকার প্রেমজ্বর আমার উপস্থিত হইয়াছে। এই ঘর্ম্ম-ধারা তাহারই নিমিত্ত। এইরূপ প্রেমজ্বর পূর্ব্বেও আমার কখনও কখনও হইয়াছে; একবার একমাস কাল অবিচ্ছিন্ন ভাবে ছিল, কিন্তু তখন শরীর হইতে জল বিন্দুমাত্র নির্গত হয় নাই, সমস্ত শরীর অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত ছিল; শরীরের রোম এবং জটা তৎকালে অহর্নিশ কাঁটার ন্যায় খাড়া হইয়া থাকিত। তোমার পাংখা দ্বারা আমার এক্ষণকার ঘর্ম্ম কিছুতেই নিবারিত হইবে না।" এই কথাগুলি তিনি এমন নির্লিপ্তভাবে বলিলেন যে, তিনি যেন অপরের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার ঐ একমাসকাল স্থায়ী প্রেমজ্বরাবস্থার প্রকাশিত লক্ষণ সকল

আমি ইতিপূর্ব্বে আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা গরীবদাসজীর নিকটও শ্রবণ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ বাহিরের সঙ্গ যদ্রূপ হইত তদনুসারে তাঁহার বাহ্য ভাব ও ব্যবহার সকল নিয়োজিত হইত; কিন্তু নিজে সর্ব্বদা একরূপ অভিসন্ধিশূন্য বালকবৎ নির্লিপ্তভাবে থাকিতেন। তাঁহার বাহ্য ব্যবহার বিষয়ে কথা প্রসঙ্গে একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, "বাবা! হাতীকা দো দাঁত রয়তা হ্যায়, এক বাহার দেখানেকি, দোস্‌রা ভিতর আপনা খানেকি; ভিতর্‌কা দাঁত দুস্‌রাকো মালুম নাই পড়্‌তা হ্যায়। শাস্তনকাবি এয়্‌সা দো বৃত্তি রয়তা হ্যায়। এক বাহার দেখানেকি, দুস্‌রা আপনা ভিতরকি; উস্‌কা খবর কিসিকো নেহি মিল্‌তা হ্যায়।"

আমার দীক্ষার প্রায় দুই বৎসর পরে আশ্রমে নূতন মন্দির নির্ম্মিত হয় এবং উহাতে শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েন। শ্রীশ্রীঠাকুরজীর প্রতিষ্ঠার দুই একদিন পরে আমি আমার স্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত অভয়বাবুর সহিত আশ্রমের কোন একটি ঘরে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলাম। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তখন ধুনীর ঘরে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ তিনি উঠিয়া আসিয়া আমরা যে ঘরে বসিয়াছিলাম সেই ঘরের দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন এবং আমরাও তাঁহাকে দর্শন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং তিনি তখন আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাবু! তোমার এই ঠাকুরজীকে অতিশয় সামর্থী (কেরামতি) বলিয়া জানিবে। তুমি এই সময়

যাইয়া তোমার মনে যাহা যাহা ইচ্ছা হয় সেই সকল বরই মাগিয়া লও, ইহাতে সঙ্কোচ করিও না ; যাহা মনে উদিত হয়, তাহাই প্রার্থনা করিবে।" আমি করজোড়ে বলিলাম "বাবা, আপনার সন্তুষ্টিই আমার বাঞ্ছনীয়। আপনি সন্তুষ্ট হইলে আমার কোন বিষয়ে কি অভাব থাকিতে পারে ? আমি আর কি বর মাগিব ? তিনি বলিলেন "হাঁ, তোমার কথা সত্য, আমার প্রসন্নতাদ্বারাই তোমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে এবং তাহা হইবেও। কিন্তু কিছু পরীক্ষাও ত করা চাই। আমি বলিতেছি, তুমি যাও এবং অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" আমি অন্য কোন কথা না বলিয়া মন্দিরের দিকে চলিলাম। তখন তিনি অভয়বাবুকে ও আমার স্ত্রীকে বলিলেন "তোমরাও যাইয়া বর প্রার্থনা কর।" আমি শ্রীজীর মন্দিরে যাইয়া মনে মনে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিলে পর অভয়বাবু ও আমার স্ত্রী আসিয়া দণ্ডবৎ করিলেন। তাঁহারা কি বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা আমি জানি না। সেই সময় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ ধূনীর ঘরে গিয়া বসিয়াছিলেন। ইহার পর আমি যে ঘরে পূর্ব্বে বসিয়াছিলাম সেই ঘরে পুনরায় গিয়া বসিলাম। তখন তিনি পুনরায় ঐ ঘরের দরজায় গিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবু, তোমার এই হইবে, এই হইবে" (আমি যাহা যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম সেইগুলি আবৃত্তি করতঃ সেইগুলি পূর্ণ হইবে) বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন

এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য বর প্রদান করিয়া অবশেষে বলিলেন "তোমার যদি এই এই না হয়, তবে আমি যথার্থ সাধু নহি।" অভয়বাবু ও আমার স্ত্রীকেও ঐরূপ ভাবে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহাদের কি কি আশীর্ব্বাদ করিলেন তাহা আমার স্মরণ নাই। কারণ তাঁহারা কি কি বর চাহিয়াছিলেন তাহা আমি জানিতে চাহি নাই এবং আমার সহিত তাঁহাদের এ বিষয়ে কোন কথাবার্ত্তাও হয় নাই। কিন্তু বাবাজী মহারাজ অভয়বাবুকে যে যে বর দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটি আমার মনে আছে, তাহা এই "তোমার ভক্তি লাভ হইবে।"

একদিন আমার গুরুভাই শ্রীযুক্ত অভয়বাবু শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন—"বাবা, আপনি এরূপভাবে আত্মগোপন করেন যে, সাধারণ বিদ্যাহীন মনুষ্য আপনাকে কিছুমাত্র শক্তিশালী বলিয়া মনে করিতে পারে না এবং ইহা দ্বারা আমাদেরও কোন কোন সময় সন্দেহ জন্মায়। আপনি কেন এরূপ আত্মগোপন করেন?" এই কথায় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ কিছু উদাসভাবে বলিতে লাগিলেন— "অভয়রাম, তুমিও এরূপ কথা বলিতেছ? আচ্ছা তুমি যে কোন শক্তির কার্য্য দেখিতে চাও আমি তোমাকে তাহাই দেখাইয়া দিব। * * * * কিন্তু ইহার পর তুমি আর আমার দর্শন পাইবে না। সেই সময় আমি এখান হইতে অন্তর্হিত হইব।" শ্রীযুক্ত অভয়বাবু বলিলেন—

"আপনি এমন কেন বলিতেছেন? পুনরায় কেন আপনার দর্শন পাইব না?" তখন তিনি বলিলেন—"যদি আমি নিজ শক্তির কিছুমাত্র প্রকাশ করি তাহা হইলে অগ্নিকে দেখিয়া যেমন কীট-পতঙ্গাদি চারিদিক্ হইতে আসিয়া উহাতে পতিত হয়, সেইরূপ অসংখ্য মনুষ্য আমাকে ঘিরিয়া ফেলিবে। আমার মাংস পর্য্যন্ত টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে। আমার এখানে থাকা সম্ভব হইবে না। আমি যেখানে যাইব সেখানেই এইরূপ হইবে।" ইহা শুনিয়া অভয়বাবু যথার্থ কথা বুঝিতে পারিলেন এবং চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের বাহ্য আচার ব্যবহার দৃষ্টে তাঁহার আভ্যন্তরিক ভাব অবধারণ করা যে সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব ছিল, তাহা তাঁহার পূর্ব্বের লিখিত বাক্যে তিনি স্বয়ংই প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার বাহ্য আচরণ সম্বন্ধে আর অধিক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়া এই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক বোধ করিতেছি। অধিকন্তু তাঁহার কোন কোন কার্য্য সাধারণ বুদ্ধির এত অধিক অগম্য ছিল যে, যিনি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনি ভিন্ন অপর কেহ তাহাতে কোন প্রকারে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন না। অতএব তাহাও এই গ্রন্থে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। যে সকল ঘটনা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তৎসমস্তের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাও সকলের পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া বোধ করি না। অতএব

সাধকদিগের হিতার্থে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের আর কয়েকটি মাত্র উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া এই অংশ সমাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সাধারণ কল্যাণার্থী ব্যক্তির পক্ষে নিষ্কপটভাবে ও আলস্যবর্জ্জিত হইয়া নিষ্ঠাপূর্ব্বক শ্রীভগবদ্বিগ্রহ এবং মহাত্মা পুরুষদিগের সেবাকেই শ্রেয়স্কর বলিয়া প্রকাশ করিতেন। সাধারণতঃ শেষ রাত্রে দুই ঘণ্টা এবং সায়াহ্নে দুই ঘণ্টা কাল নাম জপ করা খুব প্রচুর বলিয়া তিনি উপদেশ করিয়াছেন। সেবা করিতে করিতে চিত্ত একাগ্র হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে ভজনের অধিকার জন্মে। সেবার ফলে চিত্ত নির্ম্মল হইতে থাকে, আলস্য দূর হয়, এবং ক্রমশঃ নিষ্ঠার বৃদ্ধির সহিত চিত্তের একাগ্রতার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। একবার আশ্রম সংক্রান্ত হাট বাজার করিবার কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে আমি তৎকালে বসিয়া নাম করিতেছিলাম বলিয়া ঐ কার্য্যে যাইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিতেছি দেখিয়া, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহাতে প্রসন্ন হইতেছেন না এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন। একদিন একটি ব্রজবাসী চাকর এক পদের উপর দণ্ডায়মান হইয়া কোন মন্ত্র জপ করিতেছিল। তাহা টের পাইয়া তাহাকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিবেন মনে করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি করিতেছ?" সে বলিল, "মহারাজ! আমি ভজন করিতেছি।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আরে! ভজন্‌কা ঘর বহোত্‌ দূর হ্যায়, ভজন্‌ আব্‌ তেরিসে নহি বনেগা, আব্‌ তু কাম্‌ কর্‌তা যা।"

এক দিবস আমি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের নিকট বিনীত-

ভাবে নিবেদন করিলাম,"মহারাজ! আমি ত ভজন্ কিছুই করিতে পারি না, বসিয়া নাম করিতেও অধিক সময় পাই না। আর করিতে গেলেও মন স্থির হয় না।" তিনি বলিলেন, "হাঁ তাহা জানি, তুমি এখন কি ভজন করিবে? ভজন করিতে এক্ষণে তোমার কোন সামর্থ্য নাই; তোমার ভজন ত আমিই করিতেছি।" আর একদিন আমার শরীরের অভ্যন্তরে আমার হৃদয়প্রদেশে কুণ্ডলী শক্তি পঁহুছিয়া তথায় আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া আমি শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজকে বলিলাম, "মহারাজ! আমার বুকের ভিতরে শক্তি বাধিয়া যাইতেছে।" তিনিবলিলেন,"হাঁ, হুঁয়া কমল হ্যায়, ওয়ে রোক্ দেতা হ্যায়।" আমি বলিলাম, "মহারাজ! এই বাধা আপনি অনুগ্রহ করিয়া ছাড়াইয়া দিন্।" তাহাতে তিনি আমাকে খুব ধম্কাইয়া বলিলেন, "আমি ছাড়াইয়া দিব না।" তাঁহার এইরূপ উত্তরের কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া আমি চুপ্ করিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আপনা হইতে বলিলেন, "এক্ষণে যদি তোমার হৃদয়ের এই গাঁট (গ্রন্থি) আমি ছাড়াইয়া দেই, তবে তোমার দ্বারা আর কোন কার্য্যই হইবে না; তোমার সংসারে অনেক কার্য্য করিতে হইবে। সময়ানুসারে ইহা ছাড়াইয়া দিব।"

ভগবৎপ্রাপ্তি বিষয়ে গৃহস্থাশ্রম এবং সন্ন্যাসাশ্রমের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই বলিয়া তিনি আমাকে উপদেশ করিয়াছেন। সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সাধনাদি করিলে তাহাতে নানাবিধ অলৌকিক শক্তি জন্মে এবং তদ্দারা জগতের লোকের

অনেক উপকার সাধন করিতে পারা যায় ; গৃহস্থাশ্রমে তৎসমস্ত শক্তি সচরাচর হয় না, এই মাত্র প্রভেদ। কেবল গুরু কৃপাতেই ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ হয় ; তৎসম্বন্ধে উভয় আশ্রমই তুল্য। সংসারে বিধি-বিহিত কার্য্যকর্ম্ম করিতে এবং অন্তরে সর্ব্বদা ভগবানের ভয় রাখিয়া চলিতে বলিতেন। ভগবান্ সর্ব্বদা সঙ্গে আছেন, এবং দেখিতেছেন, এই ধ্যান রাখিয়া কার্য্য করিলে জীব সহজে কল্যাণলাভ করে, ইহা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন।

চিত্ত নির্ম্মল হইলে ক্রমশঃ সাতটি সিদ্ধভূমি পর পর লাভ হয়। এই সকল সিদ্ধভূমির বিষয় শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ প্রায় প্রকাশ করিতেন না। আমি এক দিবস মাত্র তাঁহার নিকট এই সকল ভূমির তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটি ভূমি সাধারণতঃ গ্রন্থাদিতে প্রকাশিত আছে। পঞ্চভূমিও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন এমন পুরুষ যুগেযুগেই বিরল। অতএব কেবল এই প্রথম পাঁচটি ভূমিরই বিবরণ সংক্ষেপতঃ এইস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। এই সকল ভূমির বিষয় চিন্তা করিলে সাধারণ সাধকদিগের একদিকে সাধনাভিমান দূর হইতে পারে এবং অপর দিকে উচ্চভূমি সকলের আদর্শ স্মরণ হইলে সাধন বিষয়ে যত্ন ও নিষ্ঠা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে বিবেচনা করিয়া এই সকল ভূমির বিবরণ নিম্নে লেখা হইতেছে।

প্রথম ভূমি :—

এই ভূমির সাধকের অবস্থা এই যথা :—

"গুরু তীরথ অনুরাগ, বিষয় বিষ কর্ মান।
ইসিকো জান প্রথম ভূম্‌কা প্রমাণ ॥"

বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত ভাব এবং গুরুতে ও তাঁহাতে অনুরাগ স্বভাবতঃ এই ভূমিতে জন্মে। ইহা ক্ষণিক ভাব নহে। এই ভূমিপ্রাপ্ত সাধকের ইহা প্রকৃতিগত সর্ব্বদা স্থায়ী ভাব।

দ্বিতীয় ভূমি :—

"হম্‌মে কোন্, জগৎমে কোন্ ইস্‌কা ধ্যান্
দুস্‌রা ভূম্‌কা প্রমাণ।"

জগতের অনন্ত কার্য্যশৃঙ্খলার এবং জীবের ভাবনিচয়ের নিয়ামক ও প্রবর্ত্তককে নিয়ত তদ্বিষয়ক ধ্যান যাঁহার স্বভাবগত হইয়াছে তিনি দ্বিতীয় ভূমি লাভ করিয়াছেন। ইহা ক্ষণিক চিন্তা নহে, এই চিন্তা প্রকৃতিগত এবং সর্ব্বকাল স্থায়ী। পিপাসার্ত্ত পুরুষ যেমন পানীয় জল সর্ব্বত্র অন্বেষণ করেন এবং তাহা পান না করা পর্য্যন্ত যেমন কোন প্রকারে শান্তিলাভ করিতে পারেন না, এই দ্বিতীয় ভূমি প্রাপ্ত পুরুষও আপনার এবং জগতের নিয়ন্তার পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত অহর্নিশি তদ্বিষয়ে তৃষ্ণাতুর থাকেন।

তৃতীয় ভূমি :—

"এক ব্রহ্ম জগৎমে জীব্‌মে বসতা হায় ঔর্ সব্‌কি কারণ।
ইএ হ্যায় তিস্‌রা ভূমকা প্রমাণ॥"

তৃতীয় ভূমিলব্ধ সাধকের সর্ব্বগতব্রহ্মবোধ জন্মে, এক ব্রহ্ম-শক্তিকেই তিনি আপনার ও জগতের আধারভূত বলিয়া নিশ্চিত রূপে অবগত হয়েন। অনুমান দ্বারাও এই সিদ্ধান্তে অনেকে উপনীত হয়েন সন্দেহ নাই; কিন্তু এই অনুমান সিদ্ধ জ্ঞান কোন ভূমিরই লক্ষণ নহে। তৃতীয় ভূমিপ্রাপ্ত পুরুষের জ্ঞান

ক্ষণস্থায়ী আনুমানিক জ্ঞান নহে। সমস্ত জাগতিক ব্যাপার অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের চিত্ত অবস্থিত হওয়াতে জাগতিক সর্ববিধ সিদ্ধি তাঁহাদের করতলন্যস্ত হয়।

চতুর্থ ভূমি :—

"সর্ব্বত্র সমদর্শন ঔর্ অখণ্ড সন্তোষ
চৌথা ভূমিকা প্রমাণ ॥"

সর্ব্বত্র এক ব্রহ্মশক্তির কার্য্য এই ভূমিতে পরিস্ফুট হয়, সুতরাং ভেদবুদ্ধি সম্যক্ তিরোহিত হয়। এই চতুর্থ ভূমিলব্ধ পুরুষ অতি বিরল। সুখ দুঃখ, লাভ ক্ষতি প্রভৃতি কোন অবস্থান্তরই এই ভূমিপ্রাপ্ত পুরুষের সন্তোষের খর্ব্বতা জন্মাইতে সমর্থ হয় না।

পঞ্চম ভূমি :—

"নারদ ভক্তি প্রেম পঞ্চম ভূম্‌কা প্রমাণ ॥"

পঞ্চমভূমিতে অহেতুক প্রেম, যাহা পরা ভক্তি নামেও আখ্যাত হয়, তাহা সাধক লাভ করেন। নারদ ঋষি ভগবান্ হইতে বরস্বরূপে এই প্রেমময় ভূমি লাভ করিয়াছিলেন। তদবধি এই ভূমি নারদ ভূমি নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই ভূমিপ্রাপ্ত হইলে চিত্তের সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা হেতু সাধকের পতন আর সম্ভব হয় না। অতঃপর পরপর যে দুই ভূমি আছে, তাহা আপনা হইতে ক্রমশঃ লব্ধ হয়। এই সকল ভূমির স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা করিতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের অপ্রবৃত্তি স্মরণ করিয়া ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমির লক্ষণ এই স্থলে বর্ণনা করিতে নিবৃত্ত হইলাম। এই সাতটি ভূমির মধ্যে কোন্ খ্যাতনামা ঋষি

কোন্ ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আধুনিক মহাত্মাদিগের মধ্যে গুরু নানক, তুলসীদাস এবং শ্রীধর প্রভৃতি কে কোন ভূমি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ এই প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তৎসমুদায় প্রকাশিত করা অসঙ্গত বোধে এই স্থলে তাহা উল্লেখ করিলাম না। বাস্তবিক বাহিরের তর্ক প্রমাণের দ্বারা এই সকল মহাত্মাদিগের অবস্থা প্রকৃতরূপে নিরূপণ করা সম্ভবপর নহে। যাঁহাদের দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাঁহারাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই সকল অবস্থা নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়েন। সর্ব্বশেষ ভূমিপ্রাপ্ত মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে গুরু উপদেশানুসারে এই মাত্র বলিয়া এই গ্রন্থাংশ সমাপন করিতেছি যে, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ সমস্ত সাধারণ জীববুদ্ধির অগোচর। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে জীবের সর্ব্ববিধ বিচার ব্যর্থ ও নিষ্ফল। তাঁহারা অপরের উপাস্য ও ভজনীয় হয়েন।

অন্তর্দ্ধান

এইরূপ লীলা করিতে করিতে ১৩১৬ বাঙ্গালা সালের ৮ই মাঘ ভোর রাত্রে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ মানবলীলা সম্বরণ করেন। ঐ সনের কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে আমি শ্রীবৃন্দাবন হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবার সময় তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গেলে আমাকে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন,

"বাবা! আমার একটি কথা শোন; আমার শরীরের এইক্ষণ কিছু স্থিরতা নাই, কখন কি হয় বলা যায় না; তোমার নিকট তার প্রেরিত হইবে, তার পাইলে তুমি অবিলম্বে এখানে চলিয়া আসিবে।" আমি এই কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া বলিলাম "মহারাজজী! তুমি আমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলে যে নূতন মন্দির প্রস্তুত হইতেছে, সেই মন্দিরে তুমি গিয়া বসিবে এবং আমাকেও কার্য্য ছাড়াইয়া আনিয়া তোমার পার্শ্বে রাখিবে; কিন্তু মন্দির প্রস্তুতের কার্য্য শেষ হইতে ত আরও অনেক সময় লাগিবে, এবং তোমার সেই সকল কথা ত এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই; তবে এক্ষণে কিরূপে তুমি দেহ পরিত্যাগ করিতে পার? তোমার সেই সকল পূর্ব্বের কথা কি মিথ্যা হইবে? আমার এই কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বলিলেন "না, আমার কথা কখন মিথ্যা হইবে না; তবে এই কথা যাহা এক্ষণে বলিলাম তাহাও তুমি ভুলিয়া যাইও না।" এইরূপ আর দুই একটি কথার পর আমি কলিকাতায় রওয়ানা হইয়া আসিলাম। শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের শরীর তখন স্বাভাবিকই ছিল, তাঁহার বিশেষ কোন প্রকার অসুস্থতা তৎকালে আমি লক্ষ্য করিতে পারি নাই। কিন্তু কলিকাতায় আমি যাইবার কিঞ্চিদধিক দুইমাস কাল মধ্যেই মাঘ মাসের ৯ই তারিখ তারে সংবাদ পাইলাম যে, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ দেহরক্ষা করিয়াছেন। আমি সেই দিবসই রাত্রে ডাক গাড়ীতে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলাম এবং ১১ই তারিখ প্রাতে আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখিলাম যে, আশ্রমের গাভী সকলের



চক্ষু হইতে জলধারা বর্ষণ হইতেছে। জানিলাম, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের অন্তর্দ্ধানের পর হইতেই ইহারা এইরূপ অশ্রুমোচন করিতেছে। আর দেখিলাম যে, আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধিকা-জীউর মূর্ত্তির নেত্র হইতে মন্দ মন্দ ভাবে অশ্রুর ন্যায় একপ্রকার রস নির্গত হইতেছে, এবং উভয় ঠাকুর বিগ্রহের মুখশ্রী অতিশয় মলিন ও দেখিতে অতি ভীষণভাব ধারণ করিয়াছে, এবং আশ্রমটি একেবারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। জানিলাম, ৮ই তারিখ দিনের বেলায়ও শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ বেশ ভাল ছিলেন, কেবল বৈকালে নিয়মিত সময়ে সেই দিবস শৌচে যান নাই। মধ্যরাত্রের পর উঠিয়া তাঁহার গৃহে সুপ্ত সাধুস্বভাব রামফল নামক একটি পরিচারককে ডাকিয়া জল লইয়া পান করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন, "রামফল, লে ভাই! তেরা হাতকা জল বি অব্ পি লিয়া; অব তু শোয় যা, হাম বি অব্ যায়েঙ্গে।" রামফল তাঁহার এই সকল কথার যথার্থভাব তখন বিশেষরূপে অবধারণ করিতে পারে নাই, সুতরাং সে পুনরায় নিদ্রিত হইয়া পড়ে। পরে কিছুকাল পরে কাশীরাম নামক একটি ব্রজবাসী পাচক ব্রাহ্মণ এবং কাশীদাস নামক একটি সাধু উভয়ে হঠাৎ নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখিলেন আশ্রমের সমস্ত স্থান এক বৃহৎ জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। তদ্দর্শনে তাঁহারা উভয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তিনি আপন শয্যার উপর নিস্পন্দভাবে উপবিষ্ট হইয়া আছেন, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ। তখন তাঁহার শরীর স্পর্শ করিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, সমস্ত শরীর বরফের

ন্যায় শীতল ; কেবল ব্রহ্মরন্ধ্র উষ্ণ। এই অবস্থা দেখিয়া কেহ কেহ বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ সমাধিস্থ আছেন, কেহ কেহ বলিলেন যে, তিনি দেহ পরিত্যাগ করিতেছেন। যাহা হউক, কিছুকাল পরে প্রায় ভোরের সময় দেখা গেল যে ব্রহ্মরন্ধ্রের উষ্ণতাও দেহকে পরিত্যাগ করিয়াছে। অবশেষে ৯ই তারিখ প্রাতে সাধু ও ব্রজবাসিগণ একত্র হইয়া যমুনার তটে সমারোহের সহিত লইয়া গিয়া তাঁহার দেহের সৎকার করিয়াছেন।

আমি আশ্রমে উপস্থিত হইয়া এই সকল ঘটনা দেখিয়া ও শুনিয়া যমুনাতটে গিয়া দেখিলাম যে যমুনা স্বীয় কলেবর বৃদ্ধি করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের শ্মশান স্থানকে আপন গর্ভস্থ করিয়াছেন। তখন জলমধ্য হইতে তাঁহার অস্থি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আশ্রমে স্থাপন করিলাম এবং পরে নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় তথা হইতে ঐ অস্থি আনিয়া ঐ মন্দির বাটীর এক স্থানে রক্ষা করিয়াছি।

স্থানীয় প্রথানুসারে ত্রয়োদশ দিবসে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের উদ্দেশ্যে আশ্রমে ভাণ্ডারা করা হয়। সেই দিবস হইতে আশ্রমস্থ শ্রীরাধিকাজীর নেত্র হইতে অশ্রুর ন্যায় রসধারা প্রবাহিত হওয়া বন্ধ হয় এবং উভয় দেবমূর্ত্তির বদনের মলিনভাব অদৃশ্য হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকার রসধারা কয়েক দিবস ধরিয়া বিগলিত হওয়াতে শ্রীরাধিকাজীউর নেত্র কিঞ্চিৎ বিরূপ হইয়া যায়, তজ্জন্য তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য নেত্র বসাইতে আমরা বাধ্য হইয়াছিলাম।

বস্তুতঃ শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের মানবলীলা বিস্তার-বিষয়ক ঘটনাবলী যেমন সাধারণ মানব-বুদ্ধির অগোচর, তদ্রূপ সেই লীলা সংবরণ সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীও মানব-বুদ্ধির অগম্য। আমি শেষবার তাঁহার নিকট হইতে বিদায় হইয়া আসিবার সময় যে সকল কথা তিনি বলিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম আমি তৎকালে বোধগম্য করিতে পারি নাই, এবং তাঁহার বাক্য নিষ্ফল হইল বলিয়া তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এইক্ষণ আমাকে ব্যবসায়ের কার্য্য হইতে অবসর করিয়া আনিয়া নূতন আশ্রমে বসাইবার পর বুঝিতেছি যে, তাঁহার বাক্য নিষ্ফল ও ব্যর্থ হইবার নহে। বস্তুতঃ তাঁহার এই দেহত্যাগ কার্য্যও একটি লীলা মাত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি যখন অদ্যাপি কোন কোন শিষ্যকে পূর্ব্ববৎ সময় সময় দর্শন দিয়া বাক্যালাপ করিতেছেন, তখন তাঁহার যে মৃত্যু নাই এবং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যে অমরত্ব লাভ করেন বলিয়া শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই অমরত্ব যে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহের স্থল আর কি হইতে পারে? তিনি যখন জীবিতকালে একই সময় নানাস্থানে দর্শন দিয়া একই সময়ে বিবিধ ব্যবহার করিতেন, তখন তাঁহার কোন্ দেহের মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিতে হইবে? এই ভারতভূমি বস্তুতঃই ধন্যা; কারণ অদ্যাপি এবম্বিধ ব্রহ্মর্ষি এই ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া লীলা বিস্তার করতঃ এই ভূমিকে পবিত্র করিতেছেন। ইতি

ওঁ তৎ সৎ

পরিশিষ্ট

যে মহাপুরুষের চরিত্র এই গ্রন্থে কথঞ্চিৎ বিবৃত করা হইয়াছে, তিনি ভারতবর্ষে সাধুসমাজে শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী ব্রজবিদেহী মহন্ত নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব ও আচার্য্য ছিলেন। বঙ্গদেশে এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব অতি বিরল; অধিকাংশ লোকেই এই নামে যে একটি সম্প্রদায় আছে তাহা অবগত নহেন। অতএব অতি সংক্ষেপে এই সম্প্রদায়ের কিঞ্চিৎ বিবরণ এইস্থলে দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে।

এই সম্প্রদায়ের প্রথম উপদেষ্টা আচার্য্য শ্রীশ্রীহংস ভগবান্ স্বয়ং। শ্রীশ্রীহংস ভগবান্ ব্রহ্মপুত্র আজন্ম ব্রহ্মচারীব্রতে স্থিত সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার ঋষিকে পরমার্থ বিদ্যা প্রথমে উপদেশ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে মোক্ষপ্রদ যে পরম যোগের বিষয় শ্রীশ্রীহংস ভগবান্ তাঁহাদিগকে উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা বিশেষরূপে বিবৃত আছে। তথায় এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে সর্ব্বলোক পিতামহ কমলাসন ব্রহ্মার নিকট সনকাদিক ঋষি উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই সংসার জলধি অতিক্রম করিবার উপায় বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে কমলযোনি তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া ভগবদ্ধ্যানপরায়ণ হইলে ভগবান্ তখন হংস মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানপূর্ব্বক ঋষিগণকে পরম তত্ত্বের উপদেশ করেন। তৎপর সনকাদিক ভগবান্ মহর্ষি নারদকে এই পরাৎপর বিদ্যার উপদেশ প্রদান করেন।



মহর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে গুরুত্বে বরণ করিয়া প্রশ্ন করিলে ভগবান্ সনৎকুমার ঋষি যেরূপ পরম তত্ত্বের উপদেশ তাঁহাকে করিয়াছিলেন, তাহা সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদের ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে অতি বিশদরূপে বিবৃত আছে। মহর্ষি নারদেরই শিষ্য শ্রীভগবান্ নিম্বার্ক স্বামী। ইহার প্রকৃত নাম শ্রী১০৮ নিয়মানন্দ স্বামী; শ্রীভগবৎ চক্রাবতার বলিয়া তিনি সাধু সমাজে পরিচিত আছেন। কথিত আছে যে একদা বহুসংখ্যক যতি অতিথিরূপে দিবাবসানে আচার্য্যের আশ্রমে উপস্থিত হয়েন; তিনি যোগ-বলে তাঁহাদিগের আহার্য্যবস্তু সকল উপস্থিত করিলে তাঁহারা সূর্য্যাস্তের পর ভোজন করেন না বলিয়া জ্ঞাপন করাতে, তাঁহারা অভুক্ত থাকিবেন দেখিয়া আচার্য্যঋষি তাঁহার আশ্রমস্থ বৃহৎ নিম্ববৃক্ষের উপর আরোহণপূর্ব্বক তদুপরি আকাশে শ্রীভগবানের সুদর্শন চক্র আহ্বান করিয়া স্থাপিত করেন, এবং সেই চক্র সূর্য্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত হইয়া অতিথি যতিগণের নিকট সূর্য্য বলিয়াই প্রতিভাত হয়েন; তদ্দর্শনে তাঁহারা ভোজন-সামগ্রী গ্রহণ করিতে সম্মত হয়েন। পরন্তু তাঁহাদের ভোজন সমাপন হইলে, আচার্য্য সেই সুদর্শন চক্রকে প্রত্যাহার করিলে, অতিথি যতিগণ দেখিতে পান যে, তৎকালে রাত্রির চতুর্থাংশ অতীত হইয়াছে। এই অদ্ভুত ঘটনা হইতে আচার্য্যের নাম "নিম্বাদিত্য" হয়; নিম্ব বৃক্ষের উপরে আসীন হইয়া সূর্য্যকে ধারণ করিয়াছিলেন, এই অর্থে "নিম্বাদিত্য" অথবা "নিম্বার্ক" নামে তিনি প্রসিদ্ধ হয়েন।"

শ্রীনিম্বার্ক ভগবানের শিষ্যপরম্পরাক্রমে প্রবর্ত্তিত যে

বৈষ্ণব সম্প্রদায়, তাহারাই নিম্বার্ক সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধি হইয়াছে। এই সম্প্রদায়কে হংস সম্প্রদায়, এবং সন্ সম্প্রদায় নামেও পুরাণাদিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। হংস ভগবান্ হইতে প্রথম প্রবর্ত্তিত, এই নিমিত্ত নাম "হংস" সম্প্রদায় ; এবং সনকাদি চতুঃসন্ হইতে পরম্পরারূপে আগত বলিয়া নাম "সন্" সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় বিষ্ণু উপাসনা করেন। বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠাংশের চতুর্থাধ্যায়ের ৩৮ ও ৩৯ সংখ্যক শ্লোকে উপাস্য বিষ্ণুস্বরূপ এইরূপে উক্ত হইয়াছে, যথা,—

"প্রকৃতির্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়তে পরমাত্মনি ॥ ৩৮
পরমাত্মা চ সর্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ।
বিষ্ণুর্নাম্না স দেবেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে ॥ ৩৯

অস্যার্থ ঃ—ব্যক্ত-স্বরূপা (মহদাদি ক্ষিতি পর্য্যন্ত বিশ্বরূপা) এবং অব্যক্ত-স্বরূপা প্রকৃতি যাহার বিষয় আমি কীর্ত্তন করিলাম এবং পুরুষ এতদুভয়ই পরমাত্মাতে লয়প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৮ ॥

পরমাত্মা সকলের আধার (আশ্রয়), তিনিই পরমেশ্বর ; বেদ ও বেদান্তে তিনিই বিষ্ণুনামে খ্যাত ॥ ৩৯ ॥

এই বিষ্ণুই যাঁহাদের উপাস্য তাঁহারা বৈষ্ণব নামে খ্যাত। পরমাত্মা বিষ্ণুর চতুর্বিধ রূপ আছে ; তৎসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশের ৭ম অধ্যায়ে এইরূপ উক্তি আছে ঃ—

আশ্রয়শ্চেতসো ব্রহ্ম দ্বিধা তচ্চ স্বভাবতঃ।
ভূপ মূর্ত্তমমূর্ত্তঞ্চ পরঞ্চাপরমেব চ ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থ ঃ—হে ভূপ ! (বিষ্ণুপাসক পুরুষের) মনের আশ্রয়

(ধ্যাতব্য) ব্রহ্ম ; ব্রহ্মের স্বভাবতঃ দ্বিবিধ রূপ আছে ; (একদিকে) মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, (অপর দিকে) পর ও অপর।

এই শ্লোকের শ্রীধর স্বামীকৃত টীকা এইরূপ আছে, যথা,—

চেতস আশ্রয়ো ব্রহ্মৈব ; তচ্চ মন্দমধ্যমোত্তমাধিকারিণাং যথাযোগং মূর্ত্তামূর্ত্তপরাপরভেদেন চতুর্দ্ধাবস্থিতং............। মূর্ত্তং মূর্ত্তিমৎ। অমূর্ত্তং তদ্রহিতং। তৎপুনঃ প্রত্যেকং পরঞ্চাপরঞ্চেতি দ্বিধা। তত্র পরম মূর্ত্তং নির্গুণং ব্রহ্ম ; অপরঞ্চা মূর্ত্তং ষড়্গুণেশ্বর রূপং। পরং মূর্ত্তং পদ্মনাভাদি লীলাবিগ্রহরূপং। অপরং মূর্ত্তং হিরণ্যগর্ভাদি বিশ্বরূপং ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ—ব্রহ্মই মনের আশ্রয়। সাধকের মধ্যে উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে এই (ধ্যেয়) রূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, এবং পর ও অপর, এই চারি প্রকার হয়। মূর্ত্ত অর্থাৎ মূর্ত্তিমান ; অমূর্ত্ত অর্থাৎ তদ্রহিত। এই মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত পুনরায় প্রত্যেকে পর ও অপর এই দুই প্রকার। তন্মধ্যে পর অমূর্ত্ত রূপই নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হয়েন, আর অপর অমূর্ত্ত রূপ ষড়ৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট ঈশ্বররূপ। পদ্মনাভাদি লীলাবিগ্রহ রূপই পর মূর্ত্ত রূপ ; আর হিরণ্যগর্ভাদি বিশ্বরূপকে অপর মূর্ত্ত রূপ বলা যায়।

পূর্ব্বোক্ত পর ও অপর রূপের এবং অবিদ্যাশক্তির বর্ণনা ঐ অধ্যায়ের ৬০।৬১ ইত্যাদি শ্লোকে করা হইয়াছে, যথা—

এতৎ সর্ব্বমিদং বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
পরব্রহ্ম স্বরূপস্য বিষ্ণোঃ শক্তিসমন্বিতম্ ॥ ৬০ ॥

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ৬১ ॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যনুসন্ততান্ ॥ ৬২ ॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন লক্ষ্যতে ॥ ৬৩ ॥
অপ্রাণবৎসু স্বল্পাল্পা স্থাবরেষু ততোঽধিকা।
সরীসৃপেষু তেভ্যোঽন্যাপ্যতিশক্ত্যা পতত্রিষু ॥ ৬৪ ॥

* * * *

এতান্যশেষ রূপস্য তস্য রূপাণি পার্থিব ॥৬৭ ॥
যতস্তচ্ছক্তিযোগেন ব্যাপ্তানি নভসা যথা।
দ্বিতীয়ং বিষ্ণুসংজ্ঞস্য যোগিধ্যেয়ং মহামতে ॥ ৬৮

অস্যার্থ ঃ—সমস্ত বিশ্ব চরাচর সমস্তজগৎ পরব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুর শক্তির প্রকাশ (শক্তি-সমন্বিত হইয়া প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে)॥৬০

বিষ্ণুর তিন প্রকার শক্তি আছে ; তন্মধ্যে একটি শক্তিকে পরাশক্তি বলে ; তাঁহার ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তিকে অপরাশক্তি বলে, তদ্ভিন্ন তৃতীয় আর একটি শক্তি আছে, তাহাকে অবিদ্যা নাম্নী কর্ম্মশক্তি বলে ॥ ৬১ ॥

হে রাজন্! সর্ব্বগামিনী ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি (পুরুষ) এই কর্ম্মশক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকাতে নিরন্তর নানাবিধ সংসারতাপ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

হে ভূপাল ! এই কর্ম্মশক্তি দ্বারা প্রচ্ছন্নভাব প্রাপ্ত হওয়াতে

পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি ন্যূনাধিকরূপে (বিভিন্ন পদার্থে) প্রকাশিত হয়॥ ৬৩॥

প্রাণহীন পদার্থে ঐ শক্তি অতি অল্প মাত্রায় প্রকাশিত থাকে; স্থাবর উদ্ভিজ্জাদিতে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, সরীসৃপ সমূহে তদপেক্ষা অধিক, পক্ষিগণে তদপেক্ষা অধিক মাত্রায় প্রকাশিত হয়॥ ৬৪॥

* * * *

হে পার্থিব! এই সমস্ত রূপ অনন্তরূপী সেই বিষ্ণুরই রূপ॥ ৬৭

কারণ আকাশ দ্বারা যেমন সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত, তদ্রূপ বিষ্ণু শক্তিদ্বারা এতৎ সমস্ত ব্যাপ্ত। হে মহামতে! (সর্ব্বব্যাপক) বিষ্ণুর ইহাই দ্বিতীয় ধ্যেয় মূর্ত্তি॥ ৬৮॥

এইরূপ পশু, মনুষ্য, দেবতা হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত এই চিৎশক্তি ক্রমশঃ অধিক হইয়া বর্ত্তমান আছে, পরন্তু এতৎ সমস্তই পরব্রহ্ম বিষ্ণুরই শক্তির বিকাশ মাত্র।

পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তামূর্ত্তরূপ সম্বন্ধে ঐ অধ্যায়ের ৬৯ প্রভৃতি শ্লোকে এইরূপ বর্ণনা আছে, যথা :—

অমূর্ত্তং ব্রহ্মণোরূপং যৎসদিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতা নৃপ! যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ৬৯॥
তদ্বিশ্বরূপ-রূপং বৈ রূপমন্যদ্ধরের্মহৎ।
সমস্ত শক্তিরূপাণি তৎ করোতি জনেশ্বর॥ ৭০॥

অস্যার্থঃ—হে নৃপ! ব্রহ্মের যে অমূর্ত্তরূপ তাহাই সৎশব্দের দ্বারা কথিত হয়; সর্ব্বপ্রকার শক্তিই এই সৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে॥ ৬৯॥

হে রাজন্! তদ্ভিন্ন মহৎ যে বিশ্বরূপ মূর্ত্তি তাহা তাঁহার (হরির) অন্যতর রূপ; তাহাই সমস্ত বিশেষ বিশেষ শক্তি-সম্পন্নরূপ সকলকে প্রকাশিত করে ॥ ৭০ ॥

বৈষ্ণবগণ এবম্প্রকার বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া থাকেন। এই আরাধনায় যেরূপ বৈষ্ণবগণ প্রবৃত্ত হয়েন তৎসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে নিম্নলিখিত ক্রম বর্ণিত হইয়াছে, যথা :—

মূর্ত্তং ভগবতোরূপং সর্ব্বাপাশ্রয় নিস্পৃহম্।
এষা বৈ ধারণা জ্ঞেয়া যচ্চিত্তং তত্র ধার্য্যতে ॥ ৭৭ ॥
তচ্চ মূর্ত্তং হরেরূপং যাদৃক্ চিন্ত্যং নরাধিপ।
তৎশ্রূয়তামনাধারে ধারণা নোপপদ্যতে ॥ ৭৮ ॥
প্রসন্নচারুবদনং পদ্মপত্রোপমেক্ষণম্।
সুকপোলং সুবিস্তীর্ণললাটফলকোজ্জ্বলম্ ॥৭৯॥ ইত্যাদি।

* * * *

চিন্তয়েত্তন্মনা যোগী সমাধায়াত্মমানসম্।
তাবদ্যাবদ্দৃঢ়ীভূতা তত্রৈব নৃপধারণা ॥ ৮৪ ॥

অস্যার্থ :—অপর সর্ব্ববিধ বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া যখন (সাধকের) চিত্ত ভগবানের মূর্ত্তিমান্ রূপের ধারণা করে তখন তাহাকেই (প্রকৃত) ধারণা বলা যায় ॥ ৭৭ ॥

হে ভূপতে! অমূর্ত্তরূপে ধারণা হইতে পারে না; অতএব হরির যে মূর্ত্তিমানরূপে ধারণা করিতে হয় তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৭৮ ॥

যাঁহার বদন প্রসন্ন ও মনোহর, যাঁহার নেত্র পদ্মপত্রসদৃশ,

যাঁহার কপোলদেশ অতি রমণীয়, যাঁহার ললাটফলক সুবিস্তীর্ণ ও উজ্জ্বল ॥ ৭৯ ॥

* * * *

যোগী এইরূপ মূর্ত্তিকে একাগ্রচিত্তে তন্মনা হইয়া যে পর্য্যন্ত ধারণা দৃঢ়ীভূত না হয় তাবৎকাল চিন্তা করিবে ॥ ৮৪ ॥

তদ্রূপ-প্রত্যয়ায়ৈকা সন্ততিশ্চান্য নিস্পৃহা।
তদ্ধ্যানং প্রথমৈরঙ্গৈঃ ষড়্‌ভির্নিষ্পাদ্যতে নৃপ! ॥ ৮৯ ॥

অস্যার্থ :—(ধারণা সিদ্ধ হইলে) যখন অন্য কোন বিষয়ে চিত্ত ধাবিত না হয়, কেবল ধ্যেয় ভগবৎরূপে ধারণাস্রোত অবিচ্ছিন্নরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে ধ্যান বলে। ইহা (যমনিয়মাদি) ষড়ঙ্গযোগ অবলম্বনে নিষ্পাদিত হয় ॥ ৮৯ ॥

তস্যৈব কল্পনাহীনং স্বরূপগ্রহণং হি যৎ।
মনসা ধ্যাননিষ্পাদ্যঃ সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে ॥ ৯০ ॥
বিজ্ঞানং প্রাপকং প্রাপ্যে পরে ব্রহ্মণি পার্থিব।
প্রাপণীয়স্তথৈবাত্মা প্রক্ষীণাশেষ ভাবনঃ ॥ ৯১ ॥

অস্যার্থ :—(অতঃপর) যখন ধ্যাতা ধ্যান ও ধ্যেয় এই ত্রিবিধ কল্পনা বিরহিত হইয়া কেবল ধ্যেয়স্বরূপাকারে সাধকের চিত্ত অবস্থিতি করে, তখন তাহাকে সমাধি বলা যায়। মানসিক দৃঢ়রূপ ধ্যানদ্বারা ইহা নিষ্পন্ন হয়॥ ৯০ ॥

হে ভূপতি! (এই সমাধি হইতে উপাস্যের স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়; ইহাকেই বিজ্ঞান বলে)। এই

বিজ্ঞানই পরে (স্বভাবতঃ) পরব্রহ্মকে প্রাপ্তি করায়। সর্ব্বপ্রকার ভেদরহিত আত্মাই গন্তব্য (বলিয়া অবগত হও) ॥ ৯১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে বৈষ্ণব ভাগবতগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, উক্ত পুরাণের একাদশস্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণনা আছে, যথা ঃ—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ৪৫ ॥
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥৪৬॥
অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ ৪৭ ॥

*　　*　　*　　*

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ৫২ ॥
ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্ম-
স্থরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ
স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ—যিনি সর্ব্বভূতে সর্ব্বাত্মা ভগবানেরই অস্তিত্ব দর্শন করেন, এবং সর্ব্বভূতকে পরমাত্মা ভগবানে অবস্থিত দর্শন করেন, তিনিই ভাগবতপ্রধান জানিবে॥ ৪৫ ॥

আর যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ভক্তে মিত্রভাব, ও সাধারণ অজ্ঞজনে কৃপা, এবং ভগবান্ ও তদ্ভক্তে অথবা নিজের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ব্যক্তিতে উপেক্ষা-বুদ্ধি প্রদর্শন করেন, তিনি মধ্যম ভাগবত বলিয়া গণ্য হয়েন ॥ ৪৬ ॥

(শ্রীধর স্বামী টীকায় বলিয়াছেন যে, এবম্বিধ ভক্তকে মধ্যমাধিকারী এই নিমিত্ত বলা হইয়াছে যে, তাঁহার ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হয় নাই)।

যিনি কেবল প্রতিমাদিতে শ্রদ্ধাসহকারে ভগবানের নিমিত্ত পূজা করিয়া থাকেন, পরন্তু তাঁহার ভক্তে এবং অপরের (ভগবদ্ভাব বুঝিতে না পারিয়া) পূজার্হতা উপলব্ধি করেন না, তাঁহাকে প্রাকৃত অর্থাৎ ভক্তিমার্গে সাধারণভাবে প্রবিষ্ট ভক্ত বলিয়া অবগত হইবে ॥ ৪৭ ॥ (ইনি ক্রমশঃ উচ্চাধিকার লাভ করেন)।

* * * *

যাঁহার (ধনপুত্রাদি) বিত্তাদিতে এমন কি নিজদেহে পর্যান্ত আত্মপর বোধ নাই, যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী এবং প্রশান্ত তাঁহাকে ভাগবতোত্তম বলিয়া জানিবে ॥ ৫২ ॥

যিনি অজিতাত্মা (হরিগত প্রাণ) দেবতাপ্রভৃতিরও তুল্ল ভ ভগবৎপদারবিন্দ হইতে লব নিমেষার্দ্ধকালও চলচ্চিত্ত হন না, তাঁহাকেই অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া থাকেন, তিনিই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বলিয়া জানিবে ॥ ৫৩ ॥ ইত্যাদি।

উদ্ধবকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভাগবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠান কিরূপে করিতে

হয় তদ্বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ২৯শ অধ্যায়ে নিম্নলিখিতরূপে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন :—

শ্রীভগবানুবাচ :—

হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্ম্মান্ সুমঙ্গলান্।
যান্ শ্রদ্ধয়া চরন্মর্ত্ত্যো মৃত্যুং জয়তি দুর্জ্জয়ম্ ॥ ৮ ॥
কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্।
ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ ॥ ৯ ॥
দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতাম্।
দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তাচরিতানি চ ॥ ১০ ॥
পৃথক্ সত্রেণ বা মহ্যং পর্ব্বযাত্রামহোৎসবান্।
কারয়েন্নৃত্যগীতাদ্যৈর্মহারাজবিভূতিভিঃ ॥ ১১ ॥
মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতং।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ॥ ১২ ॥

*   *   *   *

নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ।
স্পর্দ্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি ॥ ১৫ ॥
বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্ ॥ ১৬ ॥
যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ ॥ ১৭ ॥

*   *   *   *

অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্‌কায়বৃত্তিভিঃ ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে উদ্ধব! মঙ্গলপ্রদ আমার যে সমস্ত ধর্ম্ম মর্ত্ত্য-মানব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আচরণ করতঃ দুর্জ্জয় মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন, আমি সেই ভাগবদ্ধর্ম্মসকল তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ৮ ॥

আমাতে মন ও চিত্ত অর্পণ করিয়া, এবং আমার ধর্ম্মযজনে মনের নিষ্ঠা স্থাপনপূর্ব্বক, আমাকে অসম্ভ্রান্ত চিত্তে স্মরণ করতঃ সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৯ ॥

আমার ভক্ত সাধু ব্যক্তিগণ যে সকল পুণ্যময় দেশে বাস করেন সেই সকল দেশকেই বাসের নিমিত্ত আশ্রয় করিবে, এবং দেবতা, অসুর ও মনুষ্য মধ্যে যাঁহারা আমার ভক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের আচরণই অনুসরণ করিবে ॥ ১০ ॥

একাকী অথবা আমার ভক্তের সহিত মিলিত হইয়া মহারাজোচিত উপচারের দ্বারা এবং নৃত্যগীতাদি সহকারে আমার উদ্দেশে পর্ব্বযাত্রা মহোৎসবাদি করিবে ও করাইবে ॥ ১১ ॥

এইরূপ করিতে করিতে নির্ম্মল হইয়া সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বব্যাপী আকাশের ন্যায় প্রকাশমান আমাকে এবং স্বীয় অন্তরেও আমাকে আত্মরূপে স্থিত দর্শন করিবে ॥ ১২ ॥

* * * *

যে ব্যক্তি মনুষ্যমাত্রেতেই নিরন্তর আমার বিদ্যমানতা দর্শন করিতে পারেন, অচিরকালমধ্যে তাঁহার অহঙ্কার ও অপরের প্রতি স্পর্দ্ধা, অসূয়া ও তিরস্কারবৃত্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ১৫ ॥

অপরের উপহাস ও মিত্রতার প্রতি উপেক্ষা করিয়া, আমি

উত্তম, উনি নীচ ইত্যাকার দৈহিক দৃষ্টি ও লজ্জাদি পরিহারপূর্ব্বক অশ্ব, চণ্ডাল, গো, গর্দ্দভ প্রভৃতি সকলকে ভূমিতে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে ॥ ১৬ ॥

যাবৎকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে আমার সত্তার উপলব্ধি না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে এই প্রকার উপাসনায় নিযুক্ত থাকিবে ॥ ১৭ ॥

কায়মনোবাক্যে সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাবের উপলব্ধি করাই আমার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ॥ ১৯ ॥

ভগবদ্ভক্তির কারণ সমূহ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া উদ্ধবের প্রশ্নে ভগবান্ যে সকল উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ১৯শ অধ্যায়ে নিম্নোক্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

ভক্তিযোগঃ পুরৈবোক্তঃ প্রীয়মাণায় তেঽনঘ ।
পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণং পরম্ ॥ ১৯ ॥
শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্ ।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥ ২০॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্ ।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥ ২১ ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্ ।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনং ॥ ২২ ॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতং তপঃ ॥ ২৩ ॥

এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ।২৪॥

অস্যার্থঃ—হে পবিত্রহৃদয় উদ্ধব! ভক্তিযোগের বিষয় পূর্ব্বেই আমি তোমার নিকট বর্ণন করিয়াছি। পরন্তু তোমার প্রীতির নিমিত্ত ভগবদ্ভক্তির শ্রেষ্ঠ কারণসকল পুনরায় বর্ণন করিতেছি ॥ ১৯ ॥

আমার অমৃতোপম কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা আমার গুণ-কীর্ত্তন, আমার পূজায় সম্যক্ নিষ্ঠা, নানাবিধ স্তুতি দ্বারা আমার স্তব করা, আমার পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গের সহিত আমাকে নমস্কার, এবং আমার ও আমার ভক্তের পূজা হইতেও শ্রেষ্ঠ সর্ব্বভূতে আমার সত্তা দর্শন ॥ ২০।২১ ॥

আমার সেবার নিমিত্তই সমস্ত দৈহিক কর্ম্মসম্পাদন, বাক্য দ্বারা আমারই গুণ বর্ণন, আমাতেই মনের সমাধান, অপর সর্ব্ববিধ কামনা বর্জ্জন ॥ ২২ ॥

আমার নিমিত্ত অর্থ, ভোগ ও সুখের পরিত্যাগ, আমার নিমিত্ত যাগ, দান, হোম, জপ ও তপশ্চরণ ॥ ২৩ ॥

হে উদ্ধব! আমাতে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক যে সকল মনুষ্য এই সকল ধর্ম্ম আচরণ করেন তাঁহাদিগের আমাতে ভক্তি সঞ্জাত হয়। তখন তাঁহাদিগের অন্য আর কিছু প্রাপ্তব্য থাকে না ॥ ২৪ ॥

শৌচাচার তপশ্চরণ প্রভৃতি শাস্ত্রোপদিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি বৈষ্ণবগণের অনাদর নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নানাস্থলে,

এবং অবশেষে ১৮শ অধ্যায়ের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোকে শ্রীভগবান্ তদ্বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা বৈষ্ণবগণ আদরের সহিত গ্রহণ করেন। পরন্তু তাঁহাদের আচরিত কর্ম্ম সমস্তই শ্রীভগবৎ-সেবার্থক, তদ্দ্বারা পুণ্যবিশেষ অর্জ্জন করা তাঁহাদের অভীপ্সিত নহে।

বৈষ্ণবদিগের পক্ষে শমদমাদি যোগাভ্যাস এবং দানাদি ধর্ম্মের সার কি, তদ্বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা ঐ ১৯শ অধ্যায়ে নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত হইয়াছে; ইহাই বৈষ্ণবগণের আদর্শ। তদ্‌যথা :—

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ ॥ ৩৬ ॥
দণ্ডন্যাসঃ পরং দানং কামত্যাগস্তপঃ স্মৃতঃ।
স্বভাববিজয়ঃ শৌর্য্যং সত্যঞ্চ সমদর্শনম্ ॥ ৩৭ ॥
অন্যচ্চ সুনৃতা বাণী কবিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা।
কর্ম্মস্বসঙ্গমঃ শৌচং ত্যাগঃ সন্ন্যাস উচ্যতে ॥ ৩৮ ॥

* * * *

শ্রীর্গুণা নৈরপেক্ষাদ্যাঃ সুখং দুঃখসুখাত্যয়ঃ।
দুঃখং কামসুখাপেক্ষা পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ ॥ ৪১ ॥

* * * *

দরিদ্রো যস্ত্বসন্তুষ্টঃ কৃপণো যোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
গুণেষ্বসক্তধীরীশো গুণসঙ্গো বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোষয়োঃ।
গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জিতঃ ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ—ঈশ্বররূপ আমাতে বুদ্ধির যে নিষ্ঠা (স্থিরতা) তাহাকে শম বলে, ইন্দ্রিয়সংযমের নাম দম, দুঃখ সহিষ্ণুতার (দুঃখের প্রতি উপেক্ষা বুদ্ধির) নাম তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপস্থ ইন্দ্রিয়ের বেগ ধারণের নাম ধৃতি ॥ ৩৬ ॥

সকল জীবের প্রতি বিদ্রোহাচরণ পরিত্যাগকেই দান বলে, কামনা ত্যাগের নামই তপস্যা, আপনার স্বভাবকে জয় করাই যথার্থ বীরত্ব, এবং সর্ব্বত্র সমদর্শনই সত্য ॥ ৩৭ ॥

পণ্ডিতগণ সুনৃতা বাণীকে (সত্যবাক্যকে) ঋত নামে আখ্যাত করেন, কর্ম্মে অনাসক্তির নামই শৌচ, আর সর্ব্বপ্রকার ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে ॥ ৩৮ ॥

* * * *

নিরপেক্ষতা প্রভৃতি গুণই পুরুষের শ্রী, সুখ দুঃখের প্রতি ঔদাসীন্যই যথার্থ সুখ। কামসুখাপেক্ষাই দুঃখ, বন্ধ ও মোক্ষের তত্ত্ব যিনি অবগত হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত ॥ ৪১ ॥

* * * *

যিনি অসন্তুষ্টচিত্ত, তিনিই দরিদ্র। অজিতেন্দ্রিয় পুরুষই কৃপণ। যিনি বিষয়ে অনাসক্তচিত্ত, তিনিই যথার্থ স্বাধীন, এবং যিনি বিষয়াসক্ত তিনিই যথার্থ পরাধীন ॥ ৪১ ॥

* * * *

গুণ ও দোষের বিশেষরূপে বর্ণনা আর অনাবশ্যক, এই

পর্য্যন্ত জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গুণ ও দোষ বলিয়া যে জ্ঞান তাহারই নাম দোষ এবং এতদুভয় বর্জ্জনের নামই গুণ ॥ ৪৫ ॥

মন যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ স্থির না হয়, সেই পর্য্যন্ত এবম্বিধ উপাসনারূপ কর্ম্মই বৈষ্ণবগণের অবলম্বনীয়। বস্তুতঃ নির্গুণ পরমাত্মরূপকে মন ধ্যেয়রূপে অবলম্বন করিতে পারে না; সুতরাং সগুণ পরব্রহ্মকেই বৈষ্ণবগণ উপাসনা করিয়া থাকেন। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্তরূপই ব্রহ্মের সগুণ রূপ; অতএব সকল রূপই ব্রহ্মবুদ্ধিতে বৈষ্ণবগণের ধ্যেয়। পরন্তু এতৎ সমস্ত রূপের মধ্যে ব্রহ্মের অবতার রূপের শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং অবতার রূপের ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র ফলপ্রদ ও সহজ। এই নিমিত্ত অবতার রূপের উপাসনাকেই মুখ্যরূপে বৈষ্ণবগণ সাধারণতঃ অবলম্বন করেন। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবান্‌ই নিম্বার্ক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ হইয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম বুদ্ধিতে তাঁহার ভজন ও তাঁহারই যাজন করেন এবং তাঁহাতেই আত্মনিবেদন করিয়া থাকেন। এইরূপ ভজন করিতে করিতে যখন চিত্ত তন্ময়তাপ্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহার গোলোকাধি-পতিরূপ এবং সর্ব্বময় ও সর্ব্বাতীত ঈশ্বর রূপ ও গুণাতীত গুণাশ্রয় অমূর্ত্ত পরব্রহ্মরূপ আপনা হইতেই তাঁহাদের স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন ঘটে (১)। এই ভগবদ্রূপের

(১) দৃষ্টতঃ মর্ত্ত্য মনুষ্য দেহধারী শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ গুণাতীত সনাতন ব্রহ্মরূপে ধ্যান করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে এইরূপ বিতর্ক যেন কাহারও অন্তরে উপস্থিত না হয়। দৃশ্যমান সমস্তই প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্ম; ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিছুই নাই এবং হইতে পারে না ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত।

ধ্যান এমনি মঙ্গলজনক যে, যে কোন ভাবের সহিত ইহা দৃঢ়রূপে অবলম্বন করা যায় না কেন, ইহা নিজ স্বতঃসিদ্ধ শক্তিতে সাধকের চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদন এবং অহংবুদ্ধিরূপ ক্ষুদ্রতা তাহা হইতে দূর করিয়া দেয়, এবং অনন্তরূপে ইহার প্রসারণ জন্মায়। তখন পরাভক্তি (অহেতুক স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ যন্নিমিত্ত ধ্রুবা ব্রহ্মস্মৃতি প্রাদুর্ভূত হয়, তাহা) চিত্তে আবির্ভূত হইয়া অবশেষে পরব্রহ্মে ইহার লয় সংঘটিত করে, এবং সাধক পর-ব্রহ্মের সহিত অচ্যুত একতা প্রাপ্ত হয়েন। এই বিগ্রহরূপ চিন্তনের মহিমা বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকার সপ্তম

মায়াবদ্ধ জীব ইহা ধারণা করিতে পারে না, তাহাতেই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন প্রাকৃত বস্তু বলিয়া বোধ করে ; পরন্তু অবিদ্যাবিরহিত হইলে এই ভ্রম দূর হয়। এবঞ্চ সদ্রূপ ব্রহ্ম যে অখণ্ড ও সর্ব্বদা পূর্ণ ইহা "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং" ইত্যাদি শ্রুতি পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন। বিশেষতঃ যে অবিদ্যাশক্তি-যুক্ত থাকাতে সাধারণ জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে, এবং যদ্ধেতু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া পরস্পরের নিকট প্রতীয়মান হয়, তাহা সর্ব্ববাদিমতে শ্রীকৃষ্ণে না থাকাতে, তাঁহাকে পূর্ণব্রহ্মরূপে ধ্যান করাই সঙ্গত ও সত্য, ইহা মিথ্যা কল্পনা নহে। পরন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে এই তাঁহার দৃষ্টতঃ মর্ত্ত্য মনুষ্যরূপের দর্শনই তাঁহার পূর্ণ-স্বরূপের দর্শন নহে, এই মূর্ত্তিতেই তিনি পূর্ণভাবে থাকিলেও তাঁহার পূর্ণরূপ সাধারণ দৃষ্টির গোচর হয় না। তিনি যখন কৃপা করিয়া কোনও জীবঘটে দিব্যদর্শনশক্তি প্রকাশিত করেন, তখনই ঐ দৃষ্টতঃ পরিচ্ছিন্ন মনুষ্যরূপের অন্তরালে যে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন রহিয়াছেন তাহা সেই জীব ধারণা করিতে সমর্থ হয়।

স্কন্ধের প্রথমাধ্যায়ের চতুর্দ্দশ সংখ্যক শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া বলিয়াছেন যে, চেদিপতি শিশুপাল আজন্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৈরতাচরণ করিয়া অবশেষে কৃষ্ণ নিন্দা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রেরিত চক্রের দ্বারা হতপ্রাণ হইলেও, তাহার শরীরাভ্যন্তর হইতে জীবাত্মা জ্যোতির্ম্ময়রূপে বিনির্গত হইয়া সকলের সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণদেহে বিলীন হইয়া যায়। তদ্দর্শনে যুধিষ্ঠির বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, চিরকাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বদ্ধবৈর-ভাবাপন্ন শিশুপাল মৃত্যুকালেও তাঁহার নিন্দা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া ঘোর নরকে পতিত না হইয়া কিরূপে একান্ত ভক্তগণেও দুর্ল্লভ বাসুদেবে সম্মিলিত হওয়া রূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন ? তখন দেবর্ষি নারদ বলিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অখিলাত্মা পরমেশ্বর, তিনি নিত্য অবিদ্যাজনিত দেহাত্মবুদ্ধি বিরহিত। অতএব শরীরের প্রতি নিন্দা প্রশংসা তিরস্কারাদি তাঁহার সকলি সমান, পরন্তু তাঁহার মূর্ত্তি স্বয়ং সিদ্ধ ; সুতরাং যে কোন ভাবেই হউক, এই মূর্ত্তির সহিত তন্ময়তা প্রাপ্ত হওয়াই জীবের মুখ্য লাভ বলিয়া গণ্য হয়। এই বলিয়া নারদ বলিলেন :—

তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্ব্বৈরেণ ভয়েন বা।
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্ ॥২৫॥
যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ২৬ ॥
কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্ ॥ ২৭ ॥

এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে।
বৈরেণ পূতপাপ্মানস্তমপুরনুচিন্তয়া ॥ ২৮ ॥
কামাদ্ দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্‌গতিং গতাঃ ॥ ২৯ ॥
গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ—অতএব বৈরভাব অথবা মিত্রভাব, ভয়, স্নেহ, অথবা কামাদি যে কোন ভাবে এই শ্রীকৃষ্ণে চিত্তকে সংলগ্ন করিবে, নিরন্তর তাঁহাকে (চিত্তে স্থাপিত করিয়া) দর্শন করিবে, অপর কিছু দর্শন করিবে না ॥ ২৫ ॥

বৈরভাবে মর্ত্ত্যমানব যত সহজে (ভগবানে) তন্ময়তা লাভ করিতে পারে, ভক্তিযোগ দ্বারা তত সহজে পারে না, ইহাই আমার নিশ্চয় মত ॥ ২৬ ॥

দেখ, ভ্রমর নিজ বাসগর্ত্তে অপর কীটকে লইয়া যখন রুদ্ধ করে, তখন ঐ কীট ভ্রমরের প্রতি দ্বেষবুদ্ধি হইয়া ভয়ের সহিত তাহার রূপ ধ্যান করাতে অচিরে ঐ ভ্রমররূপতা প্রাপ্ত হয় ॥২৭॥

এই প্রকার মায়াবিরচিত মনুষ্যদেহধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে বৈরভাবের সহিতও নিয়ত চিত্তসংলগ্ন করাতে, অনেকে নিষ্পাপ হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২৮ ॥

যেমন ভক্তি দ্বারা, তদ্রূপ কাম, দ্বেষ, অথবা ভয় দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বরে মন সংলগ্ন করাতে যে বহুলোক নিষ্পাপ হইয়া ভগবদগতি লাভ করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত অনেক আছে; দেখ, গোপীগণ কামবৃত্তিতে, কংস ভয়হেতু, শিশুপালাদি দ্বেষনিবন্ধন.

যাদবগণ নিকট কুটুম্বতা বশতঃ, তোমরা (পাণ্ডবগণ) স্নেহবশতঃ এবং আমরা (ঋষিগণ) ভক্তিবশে তাঁহাকে লাভ করিয়াছি ॥২৯৷৩০ ॥

চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে নির্ম্মলাত্মা সাধুদিগের ধ্যান যে একটি প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা পাতঞ্জল যোগসূত্রে "বীতরাগ বিষয়ং বা চিত্তম্" ("স্থিতি পদং লভতে") এই সূত্রেও স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সাধুসঙ্গে সাধুচিত্তের ধ্যান সহজেই হইয়া থাকে, সুতরাং নির্ম্মলতা অপেক্ষাকৃত অনায়াসলভ্য হয়। অতএব যে কোন ভাবেই হউক, হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির ধারণা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধুসঙ্গ ও সমধিক মঙ্গলপ্রদ তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কামার্ত্ত হইয়াও সর্ব্বদা তদ্রূপ চিন্তনে তন্ময়তা লাভ করিয়া অবশেষে সর্ব্বাত্মারূপে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে; যথা, ১১শ স্কন্ধের ১২শ অধ্যায়ে উক্ত আছে যে—

তানাবিদন্মযানুষঙ্গবদ্ধধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব
নামরূপে ॥ ১২ ॥

মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ—প্রণয় হেতু আমাতে গতপ্রাণ হইয়া গোপীগণ পতিপুত্রাদি স্বজনগণ, ইহ বা পরলোক, এমন কি আত্মদেহকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন; মুনিগণ যেমন সমাধি অবস্থায়

আত্মপর-বোধ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ধ্যেয়াকারে চিত্তকে পরিণত করেন, এবং নদীসকল যেমন নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রের সহিত একীভূত হয়, তদ্রূপ গোপিকাগণের চিত্তও আমার সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়াছিল॥ ১২ ॥

গোপিকারা অবলা নারী, আমার প্রকৃত স্বরূপ তাহারা অবগত ছিল না, (কিন্তু) রতিসুখপ্রদ উপপতিরূপেও আমার প্রতি কামযুক্ত হইয়াও আমার সৎসঙ্গবশতঃ শত সহস্র গোপিকা নিষ্পাপ হওতঃ পরব্রহ্মরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥

ভগবদ্রূপে উক্ত প্রকার প্রেম-নিবন্ধন সমাধিস্থ হইতে হইতে গোপিকাগণ অবশেষে সর্ব্বাত্মরূপ পরব্রহ্মেই মিলিত হইয়াছিলেন। ১০ম স্কন্ধের ৮২ অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবতকার বলিয়াছেন যে, গোপিকাগণ কুরুক্ষেত্রে বাসুদেবের যজ্ঞস্থলে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত শতবর্ষের পর পুনরায় মিলিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন ; যথা :—

হে গোপিকাগণ ! আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সুদীর্ঘকাল অন্যত্র অবস্থান করিয়াছি বলিয়া তোমরা আমার প্রতি বিরক্ত হইও না, আমি শত্রু-বিনাশন কার্য্যে এমন ব্যস্ত ছিলাম যে তোমাদের নিকট প্রত্যাগমন করিবার নিমিত্ত অবসর মাত্র আমার ছিল না। বাস্তবিক সমস্তই বিধির নির্ব্বন্ধ : ভূতভাবন ভগবান্ই জীবসকলকে একবার মিলিত এবং পুনরায় বিযুক্ত করেন। পরন্তু তন্নিমিত্ত তোমাদের কিছু ক্ষতি হয় নাই ; কারণ—

মযি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ—আমার প্রতি ভক্তিই জীবের অমৃতত্বলাভের হেতু; সুতরাং আমার প্রতি তোমাদের স্নেহ যখন সম্পূর্ণ বিদ্যমান আছে, তখন তোমাদের অবশ্য কল্যাণ হইবে এবং তোমরা আমাকে লাভ করিবে॥ ৩১ ॥

এই বলিয়া ভগবান নির্ম্মলহৃদয় গোপিকাগণকে নিজের স্বরূপ-তত্ত্বের উপদেশ করিলেন; যথা:—

অহং হি সর্ব্বভূতানামাদিরন্তোঽন্তরং বহিঃ।
ভৌতিকানাং যথা খং বার্ভুর্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ॥ ৩২ ॥
এবং হ্যেতানি ভূতানি ভূতেষ্বাত্মাত্মনা ততঃ।
উভয়ং ময্যর্থ পরে পশ্যতাভাতমক্ষরে॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ—হে অঙ্গনাগণ! ভৌতিক পদার্থ মাত্রই যেমন আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতাত্মক (পঞ্চ মহাভূতে বর্ত্তমান আছে) তদ্রূপ আমি সমস্ত জীবের (কারণরূপে) আদিতে, (দেহরূপে) বাহিরে, এবং (অন্তর্য্যামিরূপে) অন্তরে বিরাজিত আছি॥ ৩২ ॥

(ইহা কিরূপ তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর) আকাশাদি পঞ্চমহাভূত (উপাদানরূপে) সমস্ত দেহে বর্ত্তমান আছে, এবং আত্মা (জীবাত্মা) ভোক্তারূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন; পরন্তু এতদুভয় জড় ও চেতনকে (জীবাত্মা ও ভূতগ্রামকে) অক্ষর পরমাত্মরূপ আমাতেই প্রকাশিত বলিয়া তোমরা দর্শন কর॥ ৩৩ ॥

বহুবর্ষব্যাপী শ্রীকৃষ্ণ বিরহ যাতনা ভোগের দ্বারা গোপিকা-

দের সঞ্চিত কর্ম্ম সকল বিনষ্ট হইয়াছিল; সুতরাং তৎকালে নির্ম্মলহৃদয় হওয়াতে গোপিকাগণ সহজেই এই উপদেশ ধারণ করিলেন (১)। ভগবদ্ভক্ত শ্রীশুকদেব বলিতেছেন যে—

অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ।
তদনুস্মরণধ্বস্ত জীবকোষাস্তমধ্যগন্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ার্থঃ—এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপিকাগণ অধ্যাত্ম বিদ্যায় উপদিষ্ট হইয়া তাহা ধারণাপূর্ব্বক অন্নময়াদি জীবকোষ সকল অতিক্রম করিয়া (ক্ষরাক্ষররূপ ভূত ও চৈতন্যের প্রকাশক) উত্তমপুরুষ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামীকৃত ব্যাখ্যাও নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(১) বিচ্ছেদজনিত যাতনাও ক্লেশ, এবং সম্ভোগজনিত সুখও সুখ। পরন্তু ইহা সর্ব্ববিধ শাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত যে, দুঃখভোগ দ্বারা সঞ্চিত পাপরাশি, এবং সুখভোগ দ্বারা সঞ্চিত পুণ্যরাশি বিনষ্ট হয়। ব্রজগোপিকাদিগের শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে যে যাতনা ভোগ হইয়াছিল, তাহা দ্বারা যে তাঁহাদের সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতকার স্বয়ংই অন্য প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—১০ম স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ের ৯ম শ্লোকে উল্লিখিত আছে যে

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥৯॥

অন্বয়ার্থঃ—প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত দুঃসহ তীব্র যাতনা ভোগের দ্বারা সেই ব্রজাঙ্গনাগণের পাপসমূহ ধৌত হইয়াছিল; এবং ধ্যানযোগে তাঁহার সহিত আলিঙ্গনজনিত আনন্দানুভব দ্বারা তাঁহাদের পুণ্যরাশিও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অধ্যাত্মশিক্ষয়া স্বরূপোপদেশেন ; শিক্ষিতা বোধিতাঃ। তস্যানুস্মরণেন ধ্বস্তো জীবকোষো লিঙ্গং যাসাং তাঃ তমেবাধ্যগন্ প্রাপুঃ ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থ ঃ—"অধ্যাত্মশিক্ষয়া" পদের অর্থ স্বরূপোপদেশ দ্বারা। "শিক্ষিতা" পদের অর্থ প্রবোধিত হইয়া। তাহার অনুস্মরণ দ্বারা (চিন্তনের দ্বারা) জীবকোষ অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম কারণরূপ লিঙ্গদেহকে অতিক্রম করিয়া (এই সকল দেহে আত্মবুদ্ধি বিনষ্ট করিয়া, গোপিকাগণ) তাহাকে (উত্তমপুরুষ ভগবান্‌কে) "অধ্যগন্" প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইরূপেই বৈষ্ণবোপাসনার ক্রম বর্ণনা করিয়াছেন। যথা ঃ—(১৮শ অধ্যায়)

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততোবক্ষ্যামি তে হিতং॥ ৬৪ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫ ॥

অস্যার্থ ঃ—সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম (অর্থাৎ সকলের সার) আমার এই পরম বাক্য শ্রবণ কর ; তুমি আমার অতি প্রিয়, অতএব তোমার হিতজনক এই কথা কহিতেছি ॥ ৬৪ ॥

তুমি আমাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া আমাতে ভক্তি স্থাপন কর এবং আমার উপাসনায় রত হও এবং আমাতে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক আমাকে নমস্কার কর ; এইরূপ করিলে তুমি আমাকেই পাইবে ইহা তোমাকে প্রিয় জানিয়া, আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি ॥ ৬৫ ॥

আপন আপন স্বাভাবিক গুণানুসারে কর্ম্মাচরণ দ্বারা ভগবদর্চ্চনা করিয়া পরপর যে সকল অবস্থা ভগবদ্ভক্ত লাভ করেন তাহা এই ১৮শ অধ্যায়েই ভগবান পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছেন ; যথা—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থ ঃ—যাঁহা হইতে প্রাণিগণের কর্ম্মচেষ্টা হয়, যিনি এতৎ সমস্ত (বিশ্ব) ব্যাপিয়া আছেন, স্বীয় স্বীয় গুণানুরূপ কর্ম্মের দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া মানব সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

এই কর্ম্মযোগে সিদ্ধ হইলে তৎপর কিরূপ সাধন জ্ঞানী পুরুষ করিবে তাহার উপদেশ করিতে গিয়া ভগবান বলিয়াছেন ঃ—

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ার্থ ঃ—কর্ম্মের দ্বারা ভগবৎ সেবার্চ্চনা করিতে করিতে ভোগ বিষয়ে স্পৃহা থাকে না। সাধকের ইন্দ্রিয়গ্রাম বশীভূত হয় এবং তিনি সর্ব্বত্র আসক্তিশূন্য হয়েন, তখন সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগরূপ সন্ন্যাস দ্বারা সর্ব্ববিধ কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি বিরহিত হয়েন ॥ ৪৯ ॥

এইরূপ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি-প্রাপ্ত ব্যক্তি যেরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়েন, যাহা জ্ঞানের চরম সীমা তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥৫০॥

বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ ধারণা দ্বারা মনকে স্থির করিয়া রাগ-দ্বেষ পরিহারপূর্ব্বক শব্দাদি ভোগ্য বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন স্থান আশ্রয়পূর্ব্বক অল্পাহারী এবং বাক্য, শরীর ও মনকে সংযত করিয়া বৈরাগ্যাবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদা ব্রহ্মধ্যান-পরায়ণ হইয়া অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া সাধক আমি আমার ইত্যাকার অহংজ্ঞান বিবর্জ্জিত হয়েন এবং সর্ব্বদা শান্তস্বভাব হইয়া ব্রহ্মরূপ হইয়া যান ॥৫১।৫২।৫৩॥

ভক্তগণও যে সাধনভক্তি, যাহা পরিষ্কাররূপে শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ২৯শ অধ্যায়ের পূর্ব্বোদ্ধৃত ২২৬।২৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে, তদবলম্বনে এইরূপই অহংশূন্যভাব প্রাপ্ত হইবেন ইহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৪শ অধ্যায়ের ২৬শ প্রভৃতি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। যথা ঃ—

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

এইরূপে (ক্ষুদ্র অহংভাব পরিত্যাগান্তে) ব্যাপক ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলে তিনি সর্ব্বদা প্রসন্নাত্মা হয়েন, তাঁহার শোক দূর হইয়া যায়, কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, এবং সর্ব্বভূতে তাঁহার সমদর্শন উপজাত হয়। এই প্রকার নিম্মল অবস্থা লাভ হইলে তিনি (পরব্রহ্মরূপী) আমার প্রতি পরাভক্তি লাভ করেন ॥ ৫৪ ॥

এই পরাভক্তি প্রভাবে তত্ত্বের সহিত আমার স্বরূপ জ্ঞান তাঁহার উপজাত হয়। তত্ত্বের সহিত আমাকে জ্ঞাত হইয়া তিনি আমাতেই প্রবেশ করেন। (মৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েন) ৫৫॥

বৈষ্ণবদিগের ভজনপ্রণালী শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহিত উপরে প্রদর্শিত হইল। ভক্তিপূর্ব্বক ভগবৎ অর্চ্চনাই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এই ধর্ম্মেরই বিশেষ পক্ষপাতী। এই ভক্তি দুই প্রকার,—প্রথম সাধনরূপিকা ভক্তি, তদ্দারা ভগবদ্বিগ্রহের সেবা অর্চ্চনা ও সব্বত্র ভগবদ্ভাবের চিন্তন তাঁহারা করিয়া থাকেন, ইহা দ্বারা চিত্ত নিম্মল হইলে যখন সব্বত্র সমদর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন স্বভাবতঃ তাঁহারা পরাভক্তি লাভ করেন, এই পরাভক্তি বলে সমস্ত জগৎতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব তাঁহাদের অন্তরে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। অতঃপর গুণাতীত পরব্রহ্মরূপ স্বতঃ প্রকাশিত হইলে তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া তৎসহ একতা প্রাপ্ত হয়েন। এই বিশ্বসংসারকে নিম্বার্কীয় বৈষ্ণবগণ অলীক ও মিথ্যা গণ্য করেন না, এতৎ সমস্তই ভগবানের সগুণ রূপ বলিয়া তাঁহারা গ্রহণ করেন।

শ্রীনিম্বার্ক স্বামী স্বয়ং "বেদান্তকামধেনু" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,

"সর্ব্বংহি বিজ্ঞানমতো যথার্থকম্
শ্রুতি স্মৃতিভ্যো নিখিলস্য বস্তুনঃ
ব্রহ্মাত্মকত্বাদিতি বেদবিন্মতম্
ত্রিরূপতাঽপি শ্রুতি সূত্র সাধিতা ॥ ৭ ॥"

অস্যার্থ ঃ—এতৎ সমস্তই বিজ্ঞানময় অতএব যথার্থ, কারণ এই নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাত্মক বলিয়া শ্রুতি ও স্মৃতি সর্ব্বত্র প্রমাণিত করিয়াছেন, ইহাই বেদজ্ঞদিগের মত। আর ব্রহ্মের ত্রিরূপতাও (প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বরত্ব) শ্রুতিগণ স্থাপন করিয়াছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই নিম্বার্কীয় বৈষ্ণবদিগের গতি তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে ভগবান্ নিম্বার্ক স্বামী উক্ত গ্রন্থে বলিতেছেন ঃ—

"নান্যাগতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দাৎ
সংদৃশ্যতে ব্রহ্মশিবাদিবন্দিতাৎ।
ভক্তেচ্ছয়োপাত্তসুচিন্ত্য বিগ্রহা
দচিন্ত্য শক্তে রবিচিন্ত্যশাসয়াৎ ॥ ৮ ॥

অস্যার্থ ঃ—ভক্তগণের কল্যাণার্থ যিনি সুচিন্ত্যবিগ্রহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহার মহিমা অপার—যাঁহার শক্তির ইয়ত্তা নাই, সেই অচিন্ত্য জগৎশাস্তা শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মশিবাদির বন্দিত চরণ-কমল ভিন্ন জীবের আর অন্যগতি থাকা দৃষ্ট হয় না ॥ ৮ ॥ (১)

(১) কলির জীবের উপাসনার নিমিত্ত ঈশ্বর পরব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকাশিত হয়েন, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণও যথেষ্ট আছে, যথা ঃ—

তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীনিম্বার্ক স্বামী উক্ত "বেদান্তকামধেনু" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন :—

মহাভারতের বনপর্ব্বের ১৪৯ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে যখন মর্কটরূপী হনুমান্ ভীমসেনকে আত্মপরিচয় দিলে, তিনি সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া বলিলেন যে সমুদ্রলঙ্ঘন করিবার সময় তাঁহার যে রূপ হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে, সেই রূপ তিনি তাঁহাকে দর্শন করাইতে পারিলে, তিনি যে হনুমান্ তদ্বিষয়ে তাঁহার সম্যক্ প্রতীতি জন্মিতে পারে। তখন হনুমান্ বলিলেন যে, যুগসকলের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রূপও স্বভাবতঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; পরন্তু তিনি অবশ্য তাঁহার পূর্ব্বরূপ ধারণ করিতে সমর্থ আছেন; কিন্তু ঐ রূপ এত বিকট যে তাহা দর্শন করিতেও ভীমসেনের সামর্থ্য হইবে না। তখন যুগসকলের পরিবর্ত্তনে জগতের কি কি পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা বর্ণনা করিতে ভীমসেন প্রার্থনা করিলে, মহাবীর হনুমান্ তাহা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতি বৎসরে যেমন ছয় ঋতু ক্রমান্বয়ে পর পর ধারাবাহিকরূপে আগত হয়, তদ্রূপ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয় ক্রমাগত অলঙ্ঘ্য নিয়মে ঘূর্ণায়মান হইয়া থাকে। এই যুগচতুষ্টয়ব্যাপী কালের নাম মহাযুগ। প্রত্যেক মহাযুগে যুগচতুষ্টয়ের যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম ক্রমে উপস্থিত হয়, তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া হনুমান্ বলিলেন :—

কৃতং নাম যুগং তাত, যত্র ধর্ম্ম সনাতনঃ।
কৃতমেব ন কর্ত্তব্যং তস্মিন্ কালে যুগোত্তমে॥

* * *

ততঃ পরমেকং ব্রহ্ম সা গতির্যোগিনাং পরা।
আত্মা চ সর্ব্বভূতানাং শুক্লো নারায়ণস্তদা॥

কৃপাস্থ দৈন্যাদিযুজি প্রজায়তে
যয়া ভবেৎ প্রেমবিশেষ লক্ষণা।
ভক্তিৰ্হ্যানন্যাধিপতের্মহাত্মনঃ
সাচোত্তমা সাধনরূপিকাঽপরা॥

ত্রেতায়ামপি নিবোধ ত্বং যস্মিন্ সত্রং প্রবর্ত্ততে।
পাদেন হ্রসতে ধর্ম্মো **রক্ততাং যাতি চাচ্যুতঃ**॥

* * *

দ্বাপরে চ যুগে ধর্ম্মো দ্বিভাগোনঃ প্রবর্ত্ততে।
বিষ্ণুর্বৈ পীততাং যাতি চতুর্দ্ধা বেদ এব চ॥

* * *

পাদেনৈকেন কৌন্তেয় ধর্ম্ম কলিযুগে স্থিতঃ।
তামসং যুগমাসাদ্য **কৃষ্ণো ভবতি কেশবঃ**॥

অস্যার্থ ঃ—(হনুমান্ কহিলেন হে বৎস ভীমসেন!) যে সময়ে সনাতন ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহার নাম কৃত (সত্য) যুগ। সেই যুগোত্তমকালে অভীপ্সিত সকল কর্ম্মই কৃত হইত, অসম্পন্ন কোন কর্ম্ম থাকিত না।

যোগিদিগের পরমগতি এক পরব্রহ্মই তৎকালে উপাস্য ছিলেন। সর্ব্বভূতের আত্মা নারায়ণ **তখন শুক্লবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন**।

এক্ষণে যে যুগে যজ্ঞরূপ সাধন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল সেই ত্রেতাযুগের বিষয় শ্রবণ কর। তৎকালে ধর্ম্মের একপাদ হ্রাস হয় ও **অচ্যুত বিষ্ণু রক্তবর্ণ ধারণ করেন**।

দ্বাপর যুগে ধর্ম্মের দ্বিপাদ হানি হয়। **বিষ্ণু পীতবর্ণ হয়েন এবং বেদ** সকল চারিভাগে বিভক্ত হয়।

হে কৌন্তেয়! কলিযুগে ধর্ম্মের একপাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, এই তামসযুগ প্রাপ্ত হইয়া নারায়ণ কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়েন।

অস্যার্থঃ—দৈন্যাদিগুণযুক্তপুরুষে ইঁহার (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের) কৃপা উপজাত হয়; এই কৃপা হইতে সেই সর্বেশ্বর পরমাত্মাতে

যুগসকলের এই সকল এবং অপরাপর সাধারণ নিয়ম এইরূপে মহাবীর হনুমান্ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছিল। এই সংবাদ বর্ত্তমান মহাযুগেই হইয়াছিল। এই সকল সাধারণ নিয়মের কোনটির যদি কোন ব্যতিক্রম বর্ত্তমান মহাযুগে হইয়া থাকিত, তবে হনুমান্ অবশ্য তাহাও বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিতেন। কারণ, বর্ত্তমান যুগে হনুমানের রূপপরিবর্ত্তন উপলক্ষেই ভীমসেনের প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং কলিযুগমাত্রেই যে বিষ্ণুর স্বরূপের স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণপ্রাপ্তি হয়, তাহা এতদ্দ্বারা নিশ্চিতরূপে অবধারণ করা যায়। মহাভারত স্বয়ংই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ; পরন্তু পুরাণ সকলেও মহাভারতের এই উক্তির পোষকতা থাকা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা :—

বরাহপুরাণের তৃতীয়াধ্যায়ে উক্ত আছে :—

কৃতে সিতং, রক্ততনুং তথা চ
ত্রেতাযুগে, পীততনুং পুরাণম্
তথা হরিং দ্বাপরতঃ, কলৌ চ
কৃষ্ণীকৃতাত্মামথো নমামি ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থ :—যিনি সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে পীততনু গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কলিযুগে আপনাকে কৃষ্ণরূপ করিয়াছিলেন, সেই হরিকে আমি নমস্কার করি ॥ ১৮ ॥

পুনরায় ৬৮ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে :—

বিষ্ণুঃ কৃতযুগে শুক্লো রক্ত ত্রেতাযুগেঽচ্যুতঃ।
দ্বাপরে পিঙ্গলো বিষ্ণুঃ কলৌ কৃষ্ণবপুর্হরিঃ ॥ ৭ ॥

অস্যার্থ :—বিষ্ণু সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, দ্বাপরে পিঙ্গলবর্ণ এবং কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ হয়েন ॥ ৭ ॥

প্রেমবিশেষরূপ ভক্তি উপজাত হয়; এই ভক্তি দুই প্রকার এক সাধনরূপিকা অপরাভক্তি, অপর উত্তমা পরাভক্তি।

বরাহপুরাণের অন্যান্য স্থলে এবং অপরাপর পুরাণেও এইরূপই উক্তি-সকল আছে। এই সকল উক্তি সর্ব্বসাধারণ মহাযুগবিষয়ক; সুতরাং এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক মহাযুগেই বিষ্ণুস্বরূপের পরিবর্ত্তন স্বভাবতঃ উক্ত প্রকারে হইয়া থাকে। যাঁহার স্বরূপের এবম্বিধ পরিবর্ত্তন হয়, সেই বিষ্ণুই যে বর্ত্তমান কলিযুগে পৃথিবীমণ্ডলে বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণ-রূপে অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও স্পষ্টরূপেই সর্ব্বশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। যথা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৩৩৯ অধ্যায়ের ৯০ সংখ্যক শ্লোকে নারদ ঋষির প্রতি স্বয়ং নারায়ণের উক্তির মধ্যে উল্লিখিত আছে:—

দ্বাপরস্য কলেশ্চৈব সন্ধৌ পর্য্যবসানিকে।
প্রাদুর্ভাবো মথুরায়াং কংসহেতোর্ভবিষ্যতি॥

অর্থাৎ দ্বাপর এবং কলির **সন্ধিকালের পর্য্যবসান সময়ে কংসের** বিনাশার্থ মথুরায় ভগবানের প্রাদুর্ভাব হইবে।

ইহা ভবিষ্যৎবাণীরূপে উক্ত হইয়াছে। পরন্তু এই ভবিষ্যৎবাণীর অনুরূপ বস্তুতঃও যে ভগবৎলীলা সময়ে কলিকাল প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাহা মহাভারতের অপরাপর স্থলের বর্ণনা দ্বারাও নিশ্চিতরূপে জানা যায়। (বস্তুতঃ দুর্য্যোধন কলিরই অবতার ছিলেন বলিয়া ভারতে স্পষ্ট-রূপে উল্লিখিত আছে)। যথা গদাযুদ্ধে ভীমসেন পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে উরুদেশে গদাঘাত করিয়া দুর্য্যোধনকে ধরাশায়ী করিলে বলদেব ক্রোধান্বিত হইয়া ভীমসেনকে দণ্ডিত করিতে অগ্রসর হয়েন, তখন ভগবান্ তাহাকে সান্ত্বনা করিতে গিয়া যে যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, তৎকালে ঘোররূপী কলি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ভগবৎ বাক্য এই:—

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ২৯শ অধ্যায়ের পূর্ব্বোদ্ধৃত ৮হইতে ১৯ শ্লোক পর্য্যন্ত আর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের

"অরোষণো হি ধর্ম্মাত্মা সততং ধর্ম্মবৎসলঃ।
ভবান্ প্রখ্যায়তে লোকে তস্মাৎ সংশাম্য মা ক্রুধঃ ॥ ২১ ॥
প্রাপ্তং কলিযুগং বিদ্ধি প্রতিজ্ঞাং পাণ্ডবস্য চ।
আনৃণং যাতু বৈরস্য প্রতিজ্ঞায়াশ্চ পাণ্ডবঃ ॥ ২২ ॥

অর্থাৎ (ভগবান্ বলদেবকে বলিতেছেন) আপনি ধর্ম্মাত্মা, অক্রোধী ও ধর্ম্মবৎসল বলিয়াই লোকে প্রসিদ্ধ আছেন ; অতএব শান্তি অবলম্বন করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করা আপনার উচিত। এইক্ষণ কলিযুগ প্রাপ্ত হইয়াছে জানিবেন (অতএব পূর্ব্বযুগের যুদ্ধ নিয়ম আর এইক্ষণ নাই), এবং ইহাও জ্ঞাত হউন যে পূর্ব্বে ভীমসেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, (গদাঘাতে) দুর্য্যোধনের উরুদেশ ভগ্ন করিবেন। অতএব তিনি এই কার্য্যের দ্বারা স্বীয় প্রতিজ্ঞাপাশ এবং শত্রুতা হইতে মুক্তিলাভ করুন ; (তাহাতে আপনি বিরোধী হইবেন না)।

অতএব মহাভারতের বাক্যসকল আদ্যোপান্ত বিচার করিলে ইহা স্পষ্টরূপেই জানা যায় যে দ্বাপরের শেষ হইয়া বর্ত্তমান কলিযুগ প্রবর্ত্তিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রয়োদশাধ্যায়ের ৪৬ হইতে ৭৯ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত গর্গ কর্ত্তৃক নন্দরাজের নিকট বর্ণিত হইয়াছে ; তদুপলক্ষে গর্গও ঠিক পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের অনুরূপ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন :—

যুগে যুগে বর্ণভেদো নামভেদোঽস্য বল্লব।
শুক্লোরক্তস্তথা পীত **ইদানীং** কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৫৪
শুক্লবর্ণঃ সত্যযুগে সুতীব্রস্তেজসাবৃতঃ।

যে সকল শ্লোক উপরে উদ্ধৃত করা হইয়াছে তন্মধ্যে ৬৪।৬৫এবং ৪৬ হইতে ৫৩ শ্লোক পর্য্যন্ত সাধনরূপিকা অপরাভক্তি বর্ণিত

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽয়ং পীতোঽয়ং দ্বাপরে যুগে ॥ ৫৫ ॥
কৃষ্ণবর্ণঃ কলৌ শ্রীমান্ তেজসাং রাশিরেব চ।
পরিপূর্ণতমং ব্রহ্ম তেন কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৫৬ ॥

... ...

ইত্যেবং কথিতো নন্দ মহিমা তে সুতস্য চ ॥ ৭৪ ॥ ইত্যাদি।

অন্বার্থ :—হে বল্লব! যুগে যুগে ইঁহার বর্ণভেদ ও নামভেদ হইয়া থাকে; ইনি শুক্ল, রক্ত, পীত হইয়া **ইদানীং** কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন ॥ ৫৪ ॥ সত্যযুগে ইনি সুতীব্র তেজের দ্বারা আবৃত, শুক্লবর্ণ হইয়াছিলেন; ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ও **দ্বাপরযুগে পীতবর্ণ** (হইয়াছিলেন); পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম এই শ্রীমান্ কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ ও রাশীকৃত তেজস্বরূপ (রাশীকৃত তেজবৎ উজ্জ্বলপ্রভাযুক্ত) হয়েন; অতএব কৃষ্ণনামে (তখন) আখ্যাত হয়েন ॥ ৫৫। ৫৬ ॥......হে নন্দ! এই তোমার পুত্রের মহিমা বর্ণনা করিলাম ॥ ৭৪ ॥

এই বর্ণনা পাঠে কোন সন্দেহ থাকে না যে, পূর্ব্বোক্ত ৫৪ শ্লোকোক্ত ইদানীং শব্দে বর্ত্তমান কলিকাল বুঝায়, কারণ ঐ শ্লোকোক্ত "শুক্লোরক্তস্তথা পীতঃ" এই সাধারণ উক্তিতে পরবর্ত্তী ৫৫ শ্লোকে পরিষ্কার করিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, তিনি সত্যে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, এবং দ্বাপরে পীত হইয়াছিলেন; এবং অবশেষে ৫৬ শ্লোকে বলা হইল যে কলিতে তিনি কৃষ্ণবর্ণ হয়েন; সুতরাং ৫৪ শ্লোকোক্ত "ইদানীং" শব্দে যে বর্ত্তমান কলি-কাল বুঝায়, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইবার স্থল দেখা যাইতেছে না।

ভবিষ্যপুরাণের ৪র্থ খণ্ডের ৫ম অধ্যায়ের ২১, ২২, ২৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে কলিযুগের অবতার বলিয়া স্পষ্ট বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা :—

হইয়াছে, এবং ৫৪।৫৫ শ্লোকে উত্তমা পরাভক্তির বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে।

"শ্বেতরূপো হরিঃ সত্যে হংসাখ্যো ভগবান্ স্বয়ং।
ত্রেতায়াং রক্তরূপশ্চ যজ্ঞাখ্যো ভগবান্ স্বয়ং॥
দ্বাপরে পীতরূপশ্চ স্বর্ণগর্ভো হরিঃ স্বয়ং।
কলিকালে তু সংপ্রাপ্তে সন্ধ্যায়াং দ্বাপরে যুগে॥
কলা তু সকলা বিষ্ণোর্বামনস্য তথা কলা।
একীভূতা চ দেবক্যাং জাতো বিষ্ণুস্তদা স্বয়ং॥

(বোম্বাইএর ছাপা, ৩৩৫ পৃঃ)

অর্থাৎ সত্যযুগে ভগবান স্বয়ং হরি শ্বেতরূপী হইয়া হংস নাম ধারণ করেন; সেই ভগবান ত্রেতায় যজ্ঞ নাম ধারণ করিয়া রক্তবর্ণ হয়েন; দ্বাপরে তিনিই স্বর্ণগর্ভ হরি হইয়া পীতবর্ণ ধারণ করেন। কলিকাল প্রাপ্ত হইলে দ্বাপর যুগের সন্ধ্যার সময় বিষ্ণু এবং বামনদেবের সমস্ত কলা একত্রিত হইয়া দেবকীগর্ভে স্বয়ং বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন।

অন্যান্য পুরাণেও এইরূপ উক্তি আছে। পরন্তু কেহ কেহ বলেন যে, মৎস্যপুরাণের ৭১ অধ্যায়ের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান যুগে দ্বাপরের শেষভাগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন কলির প্রারম্ভ মোটেই হয় নাই। শ্লোকগুলি এই :—

তস্মাৎ রথান্তরাৎ কল্পাৎ ত্রয়োবিংশতিতমো যদা।
বারাহো ভবিতা কল্প স্তস্মিন্ মন্বন্তরে শুভে॥ ৫॥
বৈবস্বতাখ্যে সংপ্রাপ্তে সপ্তমে সপ্তলোকধৃক্।
দ্বাপরাখ্যং যুগং তস্মিন্ অষ্টাবিংশতিতমং যদা॥ ৬॥
তস্যান্তে চ মহাদেবো বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ।
ভারাবতারণার্থায় ত্রিধা বিষ্ণুর্ভবিষ্যতি॥ ৭॥

পরন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের উপাস্য হইলেও নিম্বার্ক বৈষ্ণবগণ তাঁহার সশক্তিক উপাসনাকেই সমধিক ফলপ্রদ

দ্বৈপায়নো মুনিস্তদ্বৎ রোহিণেয়োঽথ কেশবঃ।
কংসাদিদর্পমথনঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥ ৮॥ ৭১ অঃ।

কথায় কথায় এই শ্লোক সকলের অর্থ এই:—এই রথান্তর কল্প হইতে গণনা করিয়া যখন বরাহ নামক ত্রয়োবিংশতি কল্প হইবে, সেই কল্পে বৈবস্বত নামক শুভ সপ্তম মন্বন্তর আগমন করিলে, তাহাতে যে অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপর যুগ হইবে, সেই **দ্বাপরের অন্ত হইলে** (তস্যান্তে—তস্য দ্বাপরস্য অন্তে সতি) ভগবান জনার্দ্দন বাসুদেব যিনি সপ্তলোককে ধারণ করিয়া আছেন, তিনি ভূভার হরণার্থ দ্বৈপায়ন মুনি (বেদব্যাস), রোহিণীতনয় (বলদেব), এবং কেশব এই তিনরূপে প্রকাশিত হইবেন। সেই ক্লেশনাশন কেশব কংসাদির দর্প চূর্ণ করিবেন।

বিগত দ্বাপর যুগের অন্ত হইলে ভগবান্ আবির্ভূত হইবেন, ইহাই উপরোক্ত সপ্তম শ্লোকে উল্লিখিত আছে; দ্বাপর যুগকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার শেষভাগে আবির্ভূত হইবেন, এইরূপ ঐ শ্লোকে লিখিত হয় নাই। দ্বাপর যুগের অন্ত হইলে ঠিক কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইবেন ইহা এই সকল শ্লোকে বিশেষরূপে বর্ণিত হয় নাই; পরন্তু এই শ্লোকের ন্যায় ভবিষ্যৎবাণীরূপে মহাভারতের পূর্ব্বোদ্ধৃত শান্তিপর্ব্বের ৩৩৯ অধ্যায়ের ৯০শ্লোকে ইহা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে,দ্বাপরান্তে কলির সন্ধিসময়ের পর্য্যবসানকালে তিনি আবির্ভূত হইবেন। অতএব তাঁহার আবির্ভাব যে কলিযুগের প্রারম্ভে হইয়াছিল, তাহা মৎস্যপুরাণের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকদ্বারাও প্রমাণিত হয়; তৎসম্বন্ধে কোনপ্রকার শাস্ত্রবিরোধ নাই। পরন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, কলি পূর্ব্ব হইতে আবির্ভূত হইয়া থাকিলেও যাবৎকাল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

বলিয়া গ্রহণ করেন। ভগবানের পুরুষ মূর্ত্তির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিই যেমন প্রধান, স্ত্রীমূর্ত্তির মধ্যে শ্রীরাধিকা মূর্ত্তিও তদ্রূপ প্রধানা; শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রধানা শক্তি। সশক্তিক ভগবন্মূর্ত্তির

পৃথিবীতে অবতীর্ণ ছিলেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কলি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ইহা স্বাভাবিকই বটে; পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে কলিযুগেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা ভাগবৎকারেরও সম্মত বলিয়া অনুমিত হয়। এতৎ সম্বন্ধীয় ভাগবতের বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ।
তাবৎ কলির্বৈ পৃথিবীং পরাক্রান্তুং ন চাশকৎ ॥

অন্বয়ার্থ:—রমাপতি শ্রীকৃষ্ণ যাবৎকাল পর্য্যন্ত চরণকমল দ্বারা পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, কলি (তৎপূর্ব্ব হইতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলেও) তাবৎকাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই ॥ ২৪ ॥ (কোন সংস্করণে ইহার সংখ্যা ৩০শ)।

পরন্তু এই শ্লোকের অর্থ করিতে গিয়া কোন কোন মহাত্মা বলেন যে, এই শ্লোকের অর্থ এই যে, ভগবানের মানবলীলা সম্বরণের পূর্ব্বে, তিনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার পর, কোন সময়ে কলি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রবর্ত্তিত হইলেও পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারেন নাই। পরন্তু শ্লোকের ভাষা পরীক্ষা করিলে দৃষ্ট হয় যে, ইহার ১ম চরণে আছে "যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ।" কথায় কথায় অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ এই হয় যে "যে কাল পর্য্যন্ত সেই রমাপতি (শ্রীকৃষ্ণ) পাদ-পদ্মদ্বয়ের দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছিলেন।" দ্বিতীয় চরণে আছে "তাবৎ কলির্বৈ পৃথিবীং পরাক্রান্তুং ন চাশকৎ" অর্থাৎ তাবৎকাল পর্য্যন্ত কলি পৃথিবীতে পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কলি প্রবিষ্ট হইয়া না থাকিলে তাঁহার পরাক্রম প্রকাশ করিবার সম্ভাবনা কিরূপে হইতে

উপাসনার যে সকল মহৎ ফল হয় তন্মধ্যে এই একটি বিশেষ লাভ দৃষ্ট হয় যে, ইহা অতি শীঘ্র সৎসাধকের কামবৃত্তির

পারে? অতএব যে কালে কলি পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারেন নাই বলিয়া শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, সেই কালে কলি পৃথিবীতে অবশ্য প্রবিষ্ট ছিলেন বলিয়া স্বীকার্য্য। সেই কাল কোন্ কাল ইহাই বিচার্য্য বিষয়। শ্লোকে তৎসম্বন্ধে আছে **"যে কাল পর্য্যন্ত তাঁহার পাদ পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছিল।"** অবশ্য জন্মাবধি লীলাসম্বরণ পর্য্যন্ত ব্যাপক সময়ই তিনি পৃথিবীতে ছিলেন, সুতরাং তৎসমস্ত কালই পৃথিবীও তাঁহার পাদদ্বয় দ্বারা স্পৃষ্ট ছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব তাঁহার সমক্ লীলা কালেই যে কলি পৃথিবীতে প্রবিষ্ট ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহের স্থল কিছু দৃষ্ট হইতেছে না; শ্লোকের ভাষা তৎসম্বন্ধে কোন সংশয়ের ছিদ্র প্রদান করিতেছে না।

এই শ্লোকের শ্রীধর স্বামিকৃত টীকা এইরূপ আছে, যথা :—

"ননু শ্রীকৃষ্ণে পৃথিব্যাং বর্ত্তমানে সন্ধ্যারূপেণ কলিঃ প্রবিষ্ট এব আসীৎ সত্যং, তথাপি তাবৎ তস্য পরাক্রমো নাভবদিত্যাহ যাবদিত্যাদি। পরক্রান্তুং অভিভবিতুম্॥ ২৪॥"

অস্যার্থ:—পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান যে সময়ে ছিলেন তত্তাবৎ-কালেই সন্ধ্যারূপী কলি প্রবিষ্ট ছিলেন সত্য; তথাপি যৎকাল পর্য্যন্ত তিনি বর্ত্তমান ছিলেন তাবৎকাল পর্য্যন্ত কলি পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারেন নাই। ইহা এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। শ্লোকোক্ত "পরাক্রান্তুং" শব্দের অর্থ "অভিভব করিতে"।

উক্ত ব্যাখ্যার "শ্রীকৃষ্ণে পৃথিব্যাং বর্ত্তমানে" কথাগুলির অর্থ এইরূপও করা যাইতে পারে সত্য, যে শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে বর্ত্তমান হইবার (জন্মগ্রহণ করিবার) পর কোন সময়ে।

নিবৃত্তি করে; ভগবানের সহিত সংযুক্তভাবে ভক্তিপূর্ব্বক
অর্চ্চনা করাতে স্ত্রীমূর্ত্তির প্রতি কামভাব তিরোহিত

পরন্তু যে শ্লোকটির ব্যাখ্যা স্বামী করিতেছেন তাহার শব্দবিন্যাসের সহিত এইরূপ অর্থ কখনও সঙ্গত হয় না। ইহার অর্থ "শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে যাবৎকাল বর্ত্তমান ছিলেন তত্তাবৎকাল মধ্যে।" গ্রন্থকার শ্লোকে ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন যে, কলি পূর্ব্বেই প্রবিষ্ট হইয়া, সুতরাং পরাক্রমপ্রকাশ করিবার অবসর পাইয়া থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণপ্রভাবে হীনবল হইয়াছিল। ইহাই স্বামীও ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন। এই অর্থ কেবল স্বাভাবিক ও সুস্পষ্ট অর্থ নহে; ইহার ব্যতিক্রম করিলে ভাগবতের এই শ্লোক ভাগবতেরই (পরে উদ্ধৃত) অপরাপর বাক্যের এবং অপরাপর শাস্ত্র-বাক্যের বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে।

কলিকে রাত্রি স্বরূপ তমোময়কাল বলিয়া পৌরাণিকেরা বর্ণনা করিয়াছেন। পরন্তু সূর্য্যদেব অস্তগত হইলেই প্রকৃতপক্ষে রাত্রি আরম্ভ হয় সত্য; কিন্তু অস্তের পরও কিয়ৎকাল দিবসের প্রকাশ থাকে; ঐ কালকে সন্ধ্যা নামে আখ্যাত করা যায়। কলির এই সন্ধ্যানামক কালেই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাই শ্রীধর স্বামী উক্ত টীকায় বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন সূর্য্যাস্তের পরও সন্ধ্যাকালকে সাধারণ ভাষায় দিবা বলিয়া ব্যবহার করা হয়, তদ্রূপ কলির ঐ সন্ধ্যাকালকেও কেহ দ্বাপর বলিয়া গণ্য করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা কলিই।

জ্যোতিষ শাস্ত্র বিচারেও জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কলিকাল প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। জ্যোতিষের গণনার উপর নির্ভর করিয়া রাজতরঙ্গিণীতে উল্লেখ আছে যে, কুরুপাণ্ডবের আবির্ভাবের ৬৫৩ বৎসর পূর্ব্বে কলি প্রবিষ্ট হইয়াছিল। রাজতরঙ্গিণী 'বঙ্গবাসী' কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় ছাপা হইয়াছে, তাহার তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "কুরু-

হইয়া যায়, এবং স্ত্রীপুরুষের মিথুনীকৃত ভাবকে ভগবল্লীলা-রূপে দর্শন করিতে সাধক সহজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া

পাণ্ডবের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষভাগে সংঘটিত হইয়াছিল, এই কথায় বিশ্বাস করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, প্রথম তরঙ্গোক্ত গোলন্দাদি নৃপতিগণ কলিযুগে ২২৬৮ বৎসর কাশ্মীরে রাজ্যপালন করেন, এই গণনা ভ্রমাত্মক। দ্বিতীয়াদি তরঙ্গে উল্লিখিত যে সকল নৃপতির শাসনকাল পাওয়া গিয়াছে সে সংখ্যার সহিত ২২৬৮ যোগ করিলে সমষ্টি কলিযুগের অতীত অব্দ-পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয় না। কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে কুরুপাণ্ডবের আবির্ভাব হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে লৌকিক অব্দ ৪২২৪ চলিতেছে ("কল্যব্দ ২৫ বৎসর অতীত হইলে কাশ্মীর প্রদেশে প্রচলিত লৌকিকাব্দ আরব্ধ হয়")। শকাব্দ ১০৭০ অতীত হইয়াছে। তৃতীয় গোবিন্দের সিংহাসনারোহণ হইতে একাল পর্য্যন্ত ২৩৩০ বৎসর গত হইয়াছে। ৫২ নৃপতির কাল সংখ্যা ১২৬৬

সপ্তর্ষিমণ্ডল একশত বৎসরে এক নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্তরে গমন করে; এই নিয়মানুসারে বৃহৎ সংহিতার বচন আমাদের কাল নির্ণয়ের সহায়তা করিবে। নৃপতি যুধিষ্ঠিরের শাসন সময়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। তাঁহার রাজ্যকাল ২৫২৬ পূর্ব্ব শকাব্দে।"

ইহার পরেই উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, যাদবদিগের সহিত সংগ্রামে জরাসন্ধের সহায়তার জন্য কাশ্মীরের তৎকালীন রাজা গোলন্দ জরাসন্ধের সহিত মথুরায় গিয়াছিলেন; এবং লাঙ্গলধ্বজ শ্রীমান্ বলদেবের সহিত তাঁহার ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধে তিনি অবশেষে পরাভূত হইয়া ধরাশায়ী হয়েন।

সপ্তর্ষিমণ্ডল যুধিষ্ঠিরের শাসনসময়ে মঘানক্ষত্রে থাকা শাস্ত্রসিদ্ধ হওয়াতে, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল অবধারণ করা বিষয়ে কোন সন্দেহের স্থল

সমদর্শিত্ব লাভ করেন, অতএব উপাস্যের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীনিম্বার্কস্বামী "বেদান্তকামধেনু" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন :—

নাই। পরন্তু এইক্ষণকার বাঙ্গালার পঞ্জিকাসকলে লেখা থাকে যে, যুধিষ্ঠির ও জরাসন্ধ প্রভৃতি দ্বাপরে রাজা ছিলেন এবং দ্বাপরের অবতার সকলের বর্ণনা করিতে গিয়া উক্ত পঞ্জিকাসকলে লেখা হয় "তত্রাবতারৌ বলরামবুদ্ধৌ"। তদ্দৃষ্টে কেহ কেহ ভ্রমে পতিত হইতে পারেন। পরন্তু বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল এই কলিযুগের মধ্যে হওয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং ঐ সকল পঞ্জিকার উক্তি যে একান্ত অলীক তৎ-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কি নিমিত্ত ঐ বাঙ্গালা পঞ্জিকায় শ্রীকৃষ্ণের নাম পর্য্যন্ত অবতার বর্ণনায় উল্লেখ করা হয় নাই এবং বুদ্ধদেবকেও দ্বাপরের অবতাররূপে বর্ণনা করিয়া কলির অবতার-বর্ণনাস্থানে কেবল কল্কির নাম উল্লেখ এই সকল পঞ্জিকায় করা হয়, তাহার তথ্য অবধারণ করা এই গ্রন্থে অপ্রাসঙ্গিক। বস্তুতঃ রাজতরঙ্গিণীর বিচারপ্রণালী নির্দ্দোষ, তদ্দ্বারা ইহা নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত হয় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগের প্রারম্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যে কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। পূর্ব্বোদ্ধৃত মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও বরাহ প্রভৃতি পুরাণের বর্ণনানুযায়ী প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতেও স্পষ্টভাবেই আছে, যথা :—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

১০ম স্কন্ধ, ৮ম অঃ, ১৩শ শ্লোক।

অন্বয়ার্থ :—(গর্গাচার্য্য বলিতেছেন, হে নন্দ !) তোমার অপর পুত্রটি

স্বভাবতোঽপাস্তসমস্তদোষম্
অশেষ কল্যাণগুণৈকরাশিম্।
ব্যূহাঙ্গিনং ব্রহ্ম পরং বরেণ্যম্
ধ্যায়েম কৃষ্ণং কমলেক্ষণং হরিম্ ॥ ৪

ক্রমে শ্বেত, রক্ত ও পীত এই বর্ণত্রয় অবলম্বন করিয়া দেহধারণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব ইহার এক্ষণে কৃষ্ণ নাম হইল। (অর্থাৎ সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে পীতবর্ণ তিনি ধারণ করিয়াছিলেন (এই সকল অতীত কালের কথা) এক্ষণে অর্থাৎ কলিতে তিনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন। অতএব তাঁহার নাম কৃষ্ণ হইল।)

অন্যান্য পুরাণের সহিত একবাক্যতা স্থাপন করিলে এই শ্লোকের অন্য কোন প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে না। এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণটি পূর্ব্বোদ্ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের উল্লিখিত গর্গাচার্য্যের উক্তির সহিত ঠিক এক ; অতএব উভয়স্থলেই (বক্তা গর্গাচার্য্য এবং গ্রন্থকার বেদব্যাস এবং প্রসঙ্গও এক হওয়ায়), ঐ চরণের অর্থ একই ধরিয়া লওয়া উচিত।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে পুনরায় বিশেষরূপে ভাগবতকার বলিতেছেন যে, বিদেহপতি নিমি রাজা সমবেত ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্ ॥১৯॥

এই শ্লোকের কথায় কথায় অনুবাদ এইরূপ :—কোন্ কালে ভগবান্ কি প্রকার রূপ ও বর্ণ ধারণ করেন এবং মনুষ্যসকল কি নামে, কি প্রকারে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন তাহা বর্ণনা করুন।

প্রশ্নের ভাষা দ্বারা বিচার করিতে হইলে এই প্রশ্ন যে কোন বিশেষ

অঙ্গেতু বামে বৃষভানুজাং মুদা
বিরাজমানা মনুরূপসৌভগাম্।
সখীসহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা
স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্॥ ৫

মহাযুগকে লক্ষ্য করিয়া করা হইয়াছে, তাহা বোধগম্য হয় না ; ইহা সাধারণ ভাবের প্রশ্ন—ভগবান্ কোন্ যুগে কি প্রকার বর্ণ ও রূপ ধারণ করেন ও কিরূপে পূজিত হয়েন? পরন্তু কেহ কেহ বলেন যে, নিমিরাজা যে সাধারণ যুগাবতার বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন ইহা মনে করা যাইতে পারে না, অতএব বর্ত্তমান বিশেষ মহাযুগের সম্বন্ধেই বিশেষ প্রশ্ন করিয়াছেন ইহা বুঝা উচিত। কিন্তু নিমিরাজা নিজের বিশেষ মহাযুগের কথা জানিতেন না, কিন্তু অপর সকল মহাযুগের ও মন্বন্তরের কথা জানিতেন, এরূপ মনে করিবার সঙ্গত হেতু কি হইতে পারে, তাহা বোধগম্য করা কঠিন। সাধারণতঃ লোকে বর্ত্তমান কালের কথাই অধিক জানে, যুগান্তরের সম্বন্ধে বরং অজ্ঞ হয়। আর সাধারণ নিয়ম জানা থাকিয়া, বর্ত্তমান যুগে যে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে ইহাও অবশ্য জানা থাকিলেই বর্ত্তমান যুগকে বিশেষিত করিয়া ইহাতে কি বিশেষ অবস্থা হইবে তদ্বিষয়ক প্রশ্ন করিবার কারণ হইত। পরন্তু বর্ত্তমান যুগে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে ইহা তিনি পূর্ব্বে জানিয়া থাকিলে সে ব্যতিক্রম কিরূপ হইবে তাহা যে তিনি জানিতে পারেন নাই, ইহা মনে করিবারও বিশেষ কোন কারণ লক্ষিত হয় না। যাহা হউক, এইরূপই স্বীকার করিয়া লইলেও বরং ইহাই স্বাভাবিক অনুমান হয় যে, তাঁহার প্রশ্নের ভাষা তিনি এমন ভাবে গঠিত করিতেন, যাহাতে সাধারণ কালবিষয়ক প্রশ্ন না বুঝাইয়া বিশেষরূপে এই মহাযুগকে তিনি লক্ষ্য করিতেছেন এইরূপ বোধগম্য হয়। পরন্তু তিনি তদ্রূপ না করাতে সাধারণ কাল সম্বন্ধেই প্রশ্ন থাকা নির্ণীত হয়। বস্তুতঃ নিজের

অন্বয়ার্থ ঃ—যিনি স্বভাবতঃ সর্ব্বপ্রকার দোষবর্জ্জিত, যাঁহাতে অশেষ প্রকার কল্যাণজনক গুণ সমুদয় বিদ্যমান আছে, (মহা

কল্পনা যোগ না করিয়া শ্লোকের ভাষার অনুরূপই অর্থ করা সঙ্গত। নতুবা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কল্পনার প্রভেদমূলে গ্রন্থকার ঋষির অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়া কেবল কল্পনার সিদ্ধান্তসকল স্থাপিত হইতে পারে।

নিমিরাজের এই প্রশ্নের উত্তরে করভাজন বলিতেছেন :—

কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ ইত্যাদি ॥ ২০ ॥

* * *

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ। ইত্যাদি ॥ ২২ ॥

* * *

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ। ইত্যাদি ॥ ২৫ ॥

* * *

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন **কলাবপি যথা শৃণু** ॥ ৩২ ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ার্থ :—সত্যযুগে ভগবান্ শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ হয়েন। তাঁহার পরিধেয় বল্কল এবং মস্তকে জটাভার থাকে। ইত্যাদি ॥ ২০ ॥

ত্রেতাযুগে তিনি ত্রিগুণিত মেখলাযুক্ত হইয়া রক্তবর্ণ মূর্ত্তিধারণ করেন। ইত্যাদি ॥ ২২ ॥

দ্বাপর যুগে ভগবান্ শ্যামবর্ণ হয়েন এবং পীতাম্বর পরিধান করিয়া চক্রাদি নিজ আয়ুধসকল ধারণ করিয়া প্রকাশিত হয়েন ॥ ২৫ ॥

... ...

হে পৃথিবীপতে! দ্বাপরের লোকেরা এইরূপে জগদীশ্বরের স্তুতি

বিরাটাদি) চতুর্ব্বিধ ব্যূহ যাঁহার অঙ্গ, যিনি সকলের বরেণ্য পরব্রহ্ম, যাঁহার নেত্র কমলের ন্যায়, সেই কৃষ্ণরূপ হরিকে ধ্যান করি ॥ ৪ ॥

করেন। কলিতেও নানাতন্ত্রবিধানানুসারে যেরূপে তিনি (পূজিত) হয়েন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩১ ॥

সুবুদ্ধি পুরুষগণ তখন কৃষ্ণবর্ণ অথচ কান্তিতে অকৃষ্ণ (অতি উজ্জ্বল তেজবিশিষ্ট) তাঁহাকে, অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদের সহিত রূপগুণ কীর্ত্তন (বর্ণনা) বহুল স্তুতিদ্বারা (সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ) আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্বোক্ত ২০ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইল যে, ভগবান্ সত্যে শুক্লবর্ণ হয়েন ; ২১ শ্লোকে বলা হইল যে, তিনি ত্রেতায় রক্তবর্ণ হয়েন ; ৩১, ৩২ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইল যে, কলিতে উজ্জ্বল তেজবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণরূপে তিনি দৃষ্ট হয়েন। ২৫ শ্লোকে তাঁহার দ্বাপরের বর্ণ বর্ণনায় গ্রন্থকার 'শ্যাম' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, এই শ্যাম শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ ; পরন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত সমস্ত পুরাণ ও ইতিহাস এমন কি শ্রীমদ্ভাগবতেরও শ্লোকে (১০ম স্কন্ধ, ৮ম অঃ ৯ম শ্লোকে) দ্বাপর যুগে ভগবানের পীতবর্ণ থাকা বর্ণিত হইয়াছে, অতএব এইস্থানে ভগবানের দ্বাপরযুগের বর্ণ বর্ণনায় যে 'শ্যাম' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ কৃষ্ণবর্ণ হইতে পারে না। ইহা পীত বর্ণকেই বুঝায় স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীধর স্বামীও এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন "শ্যামঃ অতসীকুসুমসংকাশ" অর্থাৎ শ্লোকোক্ত "শ্যাম" শব্দের অর্থ অতসী পুষ্পের বর্ণ। অতসীপুষ্প যে পীতবর্ণ তাহা বঙ্গদেশের বহুস্থানে এই পুষ্প বর্ত্তমান থাকাতে অধিকাংশ বঙ্গবাসী অবগত আছেন। শ্রীদুর্গাদেবী পীতবর্ণা ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তাঁহার ধ্যানে তাঁহাকে "অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্" বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা

ইঁহার বামাঙ্গে প্রসন্নবদনা বৃষভানুসুতা বিরাজমানা আছেন; ইনি শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ সৌন্দর্য্যাদিগুণবিশিষ্টা, এবং সহস্র সখী

করা হইয়াছে। অতএব অন্ততঃ একপ্রকার অতসীপুষ্পের পীতবর্ণ থাকা বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। এই পুষ্প একপ্রকার সন্‌জাতীয় বৃক্ষের পুষ্প, ইহা ব্রজমণ্ডলেও অনেকস্থানে আছে। ব্রজবাসিগণ ইহাকে "সন্‌বীজা" বলিয়া থাকেন। আর একপ্রকার সন্ বৃক্ষ আছে, তাহাও দেখিতে ইহারই সদৃশ, তাহাকে ব্রজবাসিগণ "ফুল্‌সন্" বলেন ; ইহারও পুষ্প একই প্রকারের পীতবর্ণ থাকা অনেকস্থলে দৃষ্ট হয় ; ব্রজে নানাস্থানে ইহা আছে। নীল ও কৃষ্ণবর্ণের অতসীপুষ্পও আছে বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বাপর বাক্য সকলের বিচার দ্বারা এই স্থলে পীতবর্ণ অতসীপুষ্পই লক্ষীকৃত হওয়া সিদ্ধ হয়।

অভিধানে শ্যাম শব্দের এক অর্থ কৃষ্ণবর্ণ অপর হরিৎবর্ণ লেখা আছে। 'হরিৎ' শব্দের অর্থ বিচার করিতে গিয়া দেখা যায়, যে অভিধানে হরিৎ শব্দের একটি অর্থ হরিদ্রা লেখা আছে এবং শ্যামা শব্দেরও এক অর্থ হরিদ্রা থাকা অভিধানে স্পষ্টরূপে উক্ত আছে। পরন্তু হরিৎ শব্দের মুখ্য অর্থ নীল ও পীত মিশ্রিত বর্ণ বলিয়া অভিধানে উল্লিখিত আছে। অতএব শ্যাম শব্দেও এই মিশ্রিত বর্ণ অবশ্য বুঝায়। পরন্তু এই মিশ্রিত বর্ণ বলিতে সাধারণতঃ সবুজবর্ণকেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু দৃষ্টতঃ পীত ও নীল এই উভয় অর্থেই শ্যাম শব্দের প্রয়োগ শাস্ত্রীয় গ্রন্থে থাকা দৃষ্ট হয়। যথা, "নবদূর্ব্বাদলশ্যামঃ" (নূতন অঙ্কুরিত দূর্ব্বাদলের ন্যায় শ্যাম)। দূর্ব্বাদল নূতন অঙ্কুরিত হইবার সময় মৃদু-পীতবর্ণ থাকে ; অতএব এইস্থলে শ্যাম শব্দের অর্থ পীত। পক্ষান্তরে "নীলোৎপলশ্যামঃ" (নীলপদ্মের মত শ্যাম) ; এইস্থলে শ্যাম শব্দের অর্থ নীল। এবঞ্চ নীল, পীত, সবুজ এবং কৃষ্ণ এতৎ সমস্ত হইতে ভিন্ন অথচ অভিধানে কোনপ্রকার ধৃত হয় নাই

ইহার সেবায় সদা নিযুক্ত আছে, এবম্প্রকার সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদায়িনী দেবীকে ধ্যান করি ॥ ৫ ॥

এমন অর্থেও শ্যাম শব্দের প্রয়োগ হওয়া দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। শ্রীসূর্য্যদেব কখন কৃষ্ণবর্ণ বা সবুজবর্ণ হয়েন না। তাঁহাকে সাধারণতঃ জবাকুসুমসঙ্কাশং বলিয়া প্রণাম করা হয়। ব্রহ্মপুরাণে তাঁহার (মাঘমাসে) পূজাবর্ণনায় তাঁহাকে রক্তবর্ণ ("রক্তম্") ও ঘনসিন্দুরবর্ণ ("সান্দ্রসিন্দুর-সন্নিভম্") বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। (ব্রহ্মপুরাণ, ২৮শ অধ্যায়, ৩০।৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। পরন্তু মনুষ্যের শরীরের বর্ণ যেমন শীতকালে কিছু মলিন হয়, গ্রীষ্মকালে কিছু উজ্জ্বল হয়, তদ্রূপ সূর্য্যদেবও বসন্ত ঋতুতে কপিলবর্ণ, গ্রীষ্মে কাঞ্চনবর্ণ, বর্ষায় শ্বেতবর্ণ, শরতে পাণ্ডুবর্ণ, হেমন্তে তাম্রবর্ণ এবং শীতকালে লোহিতবর্ণ হয়েন ; (কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ বা সবুজবর্ণ কখনই হয়েন না, :—

বসন্তে কপিলঃ সূর্য্যো গ্রীষ্মে কাঞ্চনসন্নিভঃ।
শ্বেতো বর্ষাসু বর্ণেন পাণ্ডুঃ শরদি ভাস্করঃ ॥ ১২ ॥
হেমন্তে তাম্রবর্ণাভঃ শিশিরে লোহিতো রবিঃ।
ইতি বর্ণাঃ সমাখ্যাতাঃ সূর্য্যস্য ঋতুসম্ভবাঃ ॥ ১৩ ॥

(ব্রহ্মপুরাণ, ৩১ অধ্যায়)

কিন্তু সূর্য্যদেবের বর্ণকেও শ্যাম শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যথা, ব্রহ্মপুরাণের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৯ম শ্লোকে উক্ত আছে :—

শ্যামবর্ণন্তু তদ্রূপং সংজ্ঞা দৃষ্ট্বা বিবস্বতঃ।
অসহন্তী তু স্বাং ছায়াং সবর্ণাং নিৰ্ম্মমে ততঃ ॥

অস্যার্থ :—সংজ্ঞা (আদিত্যের পত্নী) সূর্য্যদেবের সেই শ্যামবর্ণরূপ দেখিয়া তাহা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া নিজের সমানবর্ণা (অথবা সবর্ণা নাম্নী) এক ছায়ামূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করিলেন।

বস্তুতঃ শ্যাম শব্দের আভিধানিক একটি অর্থ "হরিৎ" শব্দে যখন

শ্রীনিম্বার্ক স্বামীর উপদেশ অনুসারে নিম্বার্ক বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই যুগল উপাসনাই করিয়া থাকেন। উপরে যাহা লিখিত হইল

হরিদ্রাও বুঝায়, তখন শ্যাম শব্দের পীত অর্থে প্রয়োগ বিষয়ে কোন বিশেষ আপত্তির স্থল দৃষ্ট হয় না। এবঞ্চ শ্যাম শব্দের আভিধানিক মুখ্যার্থ নীল ও পীত মিশ্রিত বর্ণ হওয়াতে এই বিমিশ্রণে নীলের অংশ অতি অল্প হইলে ঐ মিশ্রিত বর্ণটি দৃষ্টতঃ পীতই হইবে। এবং পীতের অংশ অতি অল্প হইলে মিশ্রিত বর্ণটি নীলই হইবে। এইরূপ বিচার দ্বারাও শ্যাম শব্দের ঈষৎ মৃদুপীত অর্থে প্রয়োগ কোনপ্রকারে দোষাবহ হয় না।

অতএব নিরপেক্ষবিচারে সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের সহিত একবাক্যতা রক্ষা করিয়া পূর্ব্বোক্ত ২৫ শ্লোকের উল্লিখিত শ্যাম শব্দের পীতবর্ণ অর্থ করাই সঙ্গত বলিয়া অবশ্য স্বীকার্য্য। ইহাই শ্রীধর স্বামীও করিয়াছেন।

যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত শ্যাম শব্দের কৃষ্ণবর্ণ অর্থ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ৩২ শ্লোকে যে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" পদগুলি আছে, তাহারও অর্থ অন্যপ্রকার করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন যে, ঐ সকল শব্দের অর্থ এই যে, বস্তুতঃ দৃষ্টতঃ পীতবর্ণ কিন্তু অন্তরে লুক্কায়িতভাবে অদৃশ্যরূপে কৃষ্ণবর্ণ। পরন্তু এইরূপ কাল্পনিক অর্থ এই শ্লোকোক্ত পদের করা কদাপি সঙ্গত হয় না। শ্লোকটিতে পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে যে, কলির ভক্তগণ ভগবানকে কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু কেবল কান্তিতে 'অকৃষ্ণ' বলিয়া বর্ণনা করেন। অতএব তাঁহার শরীরের বর্ণ কৃষ্ণই, কেবল কান্তিতে ইহা "অকৃষ্ণ" (ত্বিষাকৃষ্ণ)। শ্রীধর স্বামী এই সকল শব্দের এবং ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন :—

"কৃষ্ণতাং ব্যবর্ত্তয়তি ত্বিষা কান্ত্যাঽকৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলং। যদ্বা কৃষ্ণাবতারং; অনেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি। ('অঙ্গানি' = হৃদয়াদীনি; "উপাঙ্গানি" = কৌস্তুভাদীনি, 'অস্ত্রাণি' = সুদর্শনাদীনি;

তদ্দ্বারা নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের পরিচয় যথেষ্ট হইবে। আর অধিক লিখা নিষ্প্রয়োজন। ইতি :—

'পার্ষদা'=সুনন্দাদয়ঃ, তৎসহিতং যজ্ঞৈরর্চনৈঃ, সংকীর্তনং=নামোচ্চারণংস্তুতিশ্চ, তৎপ্রধানৈঃ। সুমেধসঃ=বিবেকিনঃ)॥ ২৯॥

অস্যার্থ :—"কৃষ্ণবর্ণ" শব্দ রুক্ষতাজ্ঞাপক, কৃষ্ণবর্ণ হইলেও ভগবানের রূপ যে রুক্ষ (কঠোর) নহে, তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ত্বিষা (=কান্তিতে) অকৃষ্ণ অর্থাৎ উজ্জ্বল (ইন্দ্রনীলমণিবৎ) এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। অথবা (ত্বিসা+অকৃষ্ণং=ত্বিষাকৃষ্ণম্ এইরূপ অর্থ গ্রহণ না করিয়া) ত্বিসা+কৃষ্ণম্=ত্বিষাকৃষ্ণম্= কৃষ্ণাবতারং এইরূপ অর্থগ্রহণ করিলে, তদ্দ্বারা গ্রন্থকার কলিতে শ্রীকৃষ্ণাবতারের প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। (অর্থাৎ মৎস্যকূর্ম্মাদি অন্যান্য অবতারের রূপ ভগবদ্রূপের সদৃশ ছিল না; কিন্তু কলিকাল প্রাপ্ত হইলে তাঁহার যে রূপ হয়, দেখিতে ঠিক তাঁহার সদৃশ শ্রীকৃষ্ণের রূপ ছিল। অতএব অবতাররূপের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবতার। শ্রীকৃষ্ণের রূপের সহিত শ্রীহরির নিজরূপের যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল, তাহা মহাভারতের স্বর্গারোহণপর্ব্বের ৪র্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভেও উল্লিখিত আছে; যথা :—

"তেনৈব দৃষ্টপূর্ব্বেণ সাদৃশ্যেনৈব সূচিতম্।" ইত্যাদি অর্থাৎ মর্ত্তালোকে পূর্ব্বদৃষ্ট অবতাররূপের সহিত বৈকুণ্ঠস্বরূপের সাদৃশ্য দৃষ্টে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় করিলেন।

বস্তুতঃ শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ রূপই যে ক্রমান্বয়ে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে ভগবান্ ধারণ করেন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কলিকালেই ভগবান্ কৃষ্ণবর্ণ হয়েন এইরূপ বলিবার অভিপ্রায় না হইলে বর্ত্তমান কলিতে পীতবর্ণ ছিলেন এইরূপ বলিবার অভিপ্রায় হইলে, কৃষ্ণবর্ণ শব্দ উল্লেখ করিয়া "ত্বিষাকৃষ্ণ" (অর্থাৎ কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ নহেন)

এতন্মাত্র বলিবার কোন তাৎপর্য্য থাকা ভাগবতগ্রন্থ পাঠে বোধগম্য হয় না। পীতবর্ণ শব্দ অন্যত্র স্পষ্টভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, এই স্থলেও পীতবর্ণ শব্দই ব্যবহার করিতেন। আর "অকৃষ্ণ" শব্দে "কৃষ্ণ নহে" এইমাত্র বুঝায়; তাহা যে পীতই হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। অতএব "অকৃষ্ণ" শব্দে সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণের ন্যায় রূক্ষ নহে, পরন্তু ইন্দ্রনীলমণিবৎ, কৃষ্ণকায় হইয়াও উজ্জ্বল প্রভাযুক্ত, এইরূপ অর্থ যে শ্রীধরস্বামী করিয়াছেন, ইহাই সমীচীন বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বের ১৪৭ অধ্যায়ে উক্ত আছে যে ঋষিদিগের প্রশ্নের উত্তরে বাসুদেবের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া মহাদেব প্রথমেই বলিয়াছিলেন :—

পিতামহাদপি বরঃ শাশ্বতঃ পুরুষো হরিঃ।
কৃষ্ণো জাম্বুনদাভাসো ব্যভ্রে সূর্য্য ইবোদিতঃ ॥ ২ ॥

এই শ্লোকের বঙ্গবাসীর অনুবাদ এইরূপ আছে, যথা :—"শাশ্বত পুরুষ হরি পিতামহ ব্রহ্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ; অভ্রশূন্য অম্বরে উদিত দিবাকরের ন্যায়, তিনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও সুবর্ণসদৃশ প্রতিভাশালী। এই বর্ণনা "ত্বিষা-কৃষ্ণম্" পদের শ্রীধরস্বামীকৃত ব্যাখ্যার ঠিক অনুরূপ। এই স্থলে পূর্ব্বোদ্ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের ১৩ অধ্যায়ের ৫৬ সংখ্যক শ্লোকও দ্রষ্টব্য। তাহাতে আছে "কৃষ্ণবর্ণঃ কলৌ শ্রীমান্ তেজসাং রাশিরেব চ"। পূর্ব্বোক্ত "ত্বিষাকৃষ্ণঃ" আর এই "তেজসাং রাশিরেব চ" যে একই অর্থ-জ্ঞাপক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ এই অর্থে অপরাপর পুরাণ ও মহাভারতের এবং শ্রীমদ্ভাগবতেরও অপরাপর স্থানের বর্ণনার সহিত এই শ্লোকের একবাক্যতা স্থাপিত হয়। অতএব প্রচলিত সকল শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ যে কলিযুগের অবতার ও উপাস্য ইহা নিশ্চিত হয়।

সমাপ্ত

৬। **ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) সিদ্ধান্ত এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ।** পৃষ্ঠা ১৩০ ; মূল্য এক টাকা।

৭। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** (উপক্রমণিকা—গীতার ঐতিহাসিক তত্ত্ব, শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মস্বরূপের বর্ণনা, গীতায় উপদিষ্ট ব্রহ্মতত্ত্ব, গীতার প্রতি অধ্যায়ে বর্ণিত উপদেশের মর্ম্ম—সরল ও প্রাঞ্জল অন্বয়, ব্যাখ্যা, মন্তব্য, শব্দসূচী ইত্যাদি সমন্বিত) ; পৃষ্ঠা ৪৭৭ ; মূল্য দুই টাকা।

৮। **গুরু-শিষ্য-সংবাদ (ব্রহ্মবিদ্যা)**—শ্রীমৎ স্বামী সন্তদাসজী ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ প্রদত্ত উপদেশের কিয়দংশ তদীয় শিষ্য শ্রীসুধীরগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্. এ. দ্বারা সংগৃহীত। পৃষ্ঠা ২৪৯ ; মূল্য পাঁচ সিকা।

ঐ হিন্দি সংস্করণ—মূল্য পাঁচ সিকা।

৯। **শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়, সাধন-প্রণালী ও ভগবদবতার-দেহতত্ত্ব নিরূপণ**—শ্রীসুধীরগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা।

১০। **সতীর্থ-মণ্ডলী**—(শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের শিষ্যগণের নাম ও ঠিকানার তালিকা)। ২য় সংস্করণ ; মূল্য ।৵০ আনা।

১১। **বৈষ্ণব চারি সম্প্রদায়ের আরতি স্তুতি**—মূল্য ৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বঙ্গীয় নিম্বার্ক আশ্রম

৮৮।১নং কলেজ রোড, শিবপুর, হাওড়া।